



www.banglabookpdf.blogspot.com

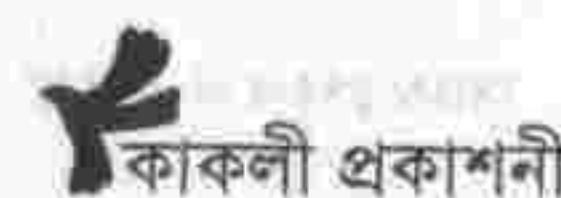


www.banglabookpdf.blogspot.com

আমার প্রিয় ভেতিক গল্প

সম্পাদনা
হুমায়ুন আহমেদ

www.banglabookpdf.blogspot.com



www.facebook.com/banglabookpdf

৩
লেখক

প্রকাশক
এ কে নাচির আহমেদ সেলিম
কাকচী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৯৭
বিত্তীয় মুদ্রণ
জুলাই ১৯৯৭
তৃতীয় মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
চতুর্থ মুদ্রণ
ডিসেম্বর ১৯৯৮
পঞ্চম মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০০২
ষষ্ঠ মুদ্রণ
অক্টোবর ২০০৬

প্রচ্ছদ
শ্রবণ এষ

অক্ষয় বিনয়াস
কম্পিউটার গ্যালারি
৩৩ নর্থক্রান্ক হল রোড, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এঙ্গেল প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

দাম ১৭৫ টাকা

ISBN 984-437-149-X

www.banglobookpdf.blogspot.com

উৎসর্গ

আমার তিন কল্যাণিক বিপাশা, শীলা, নেতৃত্ব।
এরা ভূত বিশ্বাস করে না, কিন্তু ভূতের ভয়ে অস্তির হয়ে
থাকে। প্রায়ই দেখা যায় তিন কল্যাণ ঠাসাঠাসি করে এক
বিহুনায় ঘূর্ঘন্তে, কারণ কেউ একজন ভয় 'পেয়েছে'।

www.banglobookpdf.blogspot.com





চিরকাল এইসব বহসা আছে নীরব
রূদ্ধ উষ্ণাধর
জ্ঞানের নব প্রাতে, সে হঘতো আপনাতে
পেয়েছে উত্তুন।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

ভৌতিক গঞ্জের একটি সংকলন বের করার শখ আমার অনেক দিনের। কোনো একটা ভাল গন্ধ পড়লে আমার তৎক্ষণাত্ত্ব হচ্ছে করে অন্যদের সেই গন্ধটা পড়াতে। আমি চাই আমার ব্যক্তিগত ভাস্তুগাটা ছড়িয়ে পড়ুক—অন্যরাও আমার মতো সামাজিক হোক।

ভরা বর্ষার রাতে প্রায়ই যে ঘটনাটা আমার বাড়িতে ঘটে তা হচ্ছে আমি একটা ভূতের গন্ধ পড়ে শোনাঞ্জি—আমার তিন কল্যা এবং তাদের মা চোখ বড় বড় করে উন্নেছে। গন্ধ শেষ হবার পর তিন কল্যা বলল, আমরা আজ আলাদা শোব না। এক সঙ্গে শোব। লম্বা বিছানায় আড়াআড়ি করে সবাই ভয়েছি—এক প্রান্তে আমি, অন্য প্রান্তে কন্যাদের মা। মাঝখানে তিন কল্যা। বাইরে বৃপ্তবুপ করে বর্ষার বৃষ্টি। এমন তথ্য পাওয়াতেও তো আনন্দ আছে।

ভৌতিক গঞ্জের সংকলন করতে পিয়ে দেখি—অবাক কাণ্ড! ভাল লাগার মতো গন্ধ তো তেমন নেই! যে বড় গলায় যত কথাই বলুক—বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গঞ্জের খারা খুবই ক্ষীণ। লেখকরা ভূতের গন্ধ যখনই লিখেছেন তখনই তাদের মাধ্যমে চলে এসেছে—গন্ধটার পাঠক শিঙ-কিশোর। ভৌতিক গন্ধ তাঁরা লিখেছেন বাক্তাদের জন্যে। লেখা হয়েছে খানিকটা অযত্তে, খানিকটা হেলাফেলায়। সেই গঞ্জের বেশীর ভাগই যেখানে শেষ হয় সেখানে দেখা যায় যে ভূত নেই—ভয়ের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে ঘটেছে। ব্যাখ্যাতীত কোনো কারণে ঘটে নি।

এ জাতীয় গন্ধ পড়লেই আমার মনে হয়—লেখক পাঠকদের সঙ্গে এক ধরনের প্রত্যারণা করলেন। এই প্রত্যারণার অধিকার তাদের নেই। তবে এ ধরনের প্রত্যারণার মাধ্যমে তাঁরা যদি শেখাতে চান যে ভূত বলে কিছু নেই তা হলে ভিন্ন কথা। আমি বিজে ভূতের গন্ধ পড়ে এই শিক্ষা নিতে চাই না। ভূতের গন্ধ আমি তয় পারার জন্যেই পড়তে চাই।

বাংলা সাহিত্যে ভৌতিক গঞ্জের একটা বিশেষ ফরম্যাটটা হচ্ছে গঞ্জের কেন্দ্রীয় চরিত্রের সঙ্গে একজনের দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবে সে তার পূর্বপরিচিত। তার সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হবে গন্ধগুজব হবে। তারপর জানা যাবে যার সঙ্গে কথা হয়েছে সে আগেই মারা গেছে। এইসব গঞ্জে কোনো টেনশন থাকে না। কারণ আমরা জানি না অশৰীরীর সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। যখন জানা হয় তখন গন্ধ শেষ। ভৌতিক গঞ্জের মানগত শ্রেণীবিন্যাসে আমি এ- জাতীয় গন্ধগুলিকে সর্বনিম্নে স্থান দেব। দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বাংলা সাহিত্যে বেশীর ভাগ গন্ধই এই শ্রেণীর।

একশ ভাগ খাটি ভূতের গন্ধে লেখা হয়েছে—আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে সে—সব গন্ধ পড়ে কেন জানি তয় লাগে না, বরং মায়া লাগে। অন্য ভূবনের প্রতি মায়া, অশৰীরীর প্রতি মায়া। বিভূতিভূষণ বল্দোপাধ্যায়ের গন্ধ তারানাথ তাঙ্গিকের কথাই ধরা যাক। ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টায় তাঁর কোনো জ্ঞান ছিল না। তাঁর পরও গন্ধ শেষ হবার পরপর অস্তুত মায়ায় দ্রদয় আচ্ছন্ন হয়। মনোজ বসুর বিদ্যাত ভূতের গঠনগুলির ব্যাপারেও একই কথা। তাঁর গন্ধ পড়ে ভয়ে না, আমরা মায়ায় আচ্ছন্ন

হই। মনোজ বসুর দুটি গল্প আমি এই সংকলনে নিয়েছি—লালচুল এবং পাতাল-কন্যা। দুটি গল্পই চমৎকার। তাঁর গল্পে অশৰীরীরা এসেছে খুবই স্বাভাবিক ভাবে। যেন এরা বাইরের কেউ না, এরা আমাদের সঙ্গেই আছে—আমাদেরই একজন। আমরা দেহধারী, ওরা নয়—এইটুকুই প্রতেদে।

এক সময় আমাদের অবস্থা কিন্তু এই ছিল। আমরাখায় ভূতকে ধরের মানুষ ভাবা হত। ছোটবেলার কথা, নানার বাড়িতে ষেড়াতে গিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা অন্যাপাড়া থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। নানাজানের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে যাবার মেলায় বললেন, “একটা পেতুলি বড় ত্যক্ত করতাছে।” অর্থ হচ্ছে কিছুদিন ধরে এক প্রেত তাদের বড়ই বিরক্ত করতাছে। বিরক্তের ধরন হচ্ছে, যাই ভাজা হলে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভাজা মাছ খেতে চায়। নাকিমদের অনুময়-বিনয় করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রলোকের গল্পে কেউ বিশ্বিত হল না। ধরেই নিল এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, প্রেতবা ভাজা মাছ পছন্দ করে। এরা ত্যক্ত করবেই।

নানার বাড়িতেই আলাউদ্দিন নামের এক কামলা ছিল যে ভূতের সঙ্গে কৃতি করেছে। কৃতির ফলে তার সারাগায়ে আঠাজাতীয় কিছুতে (ময়মনসিংহের ভাষায়—বিজল) মাঝামাঝি হয়ে পিয়েছিল। সেই আঠা দূর করতে তাকে সারারাত নারিকেল ছোবড়া দিয়ে ডলাডলি করতে হয়েছে। এই স্ফুরণ ঘটনাও খুব স্বাভাবিকভাবেই নেয়া হয়েছে। তাব্বতা এমন যে ভূতের সঙ্গে কৃতি করলে গায়ে তো ‘বিজল’ লাগেই।

গভীর রাতে মশালের আলো ভেলে মাছধরা হামের মানুষদের জন্যে আনন্দময় অভিজ্ঞতা। মাছধরার এই প্রক্রিয়াটির নাম ‘আউল্যা’। হামের ভূতের গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে ‘আউল্যা’র অভিজ্ঞতা। পরিচিতজনের গলা নকল করে ভূত এসে ডাকবে মাছ ধরতে যাবার জন্যে। একবার ঘর থেকে বের করতে পারলে আর কথা নেই—ভূতের প্রধান চেষ্টা থাকবে বিসের পানিতে ডুবিয়ে মারা। এই জাতীয় ভূতরা ডাঙায় আসতে পারে না। এদের কর্মকাণ্ড পানিতে।

ডাঙায় আছে ‘ভুলো’।

আউল্যাতে গিয়ে ‘ভুলো’র হাতে পড়ে জীবনসংশয়ের ঘটনাও আছে। ভুলো হচ্ছে সেই অশৰীরী যে পথ ভুলিয়ে দেয়, দিক ভুলিয়ে দেয়, শব্দ ঘুরিয়ে মারে। ‘ভুলো’ নিয়ে তারাশক্তির বন্দোপাধ্যায়ের একটা অসাধারণ গল্প আছে—ভুলোর ছলনা। গল্পটা যদিও শিশু-কিশোরদের প্রতি লক্ষণ রেখে লেখা হয়েছে, তার পরেও সব বয়সের পাঠকদের জন্যেই এই গল্প। আদি হাম- বাংলায় লোকজ বিশ্বাসের গল্প।

এই সংকলনে তারাশক্তির আরেকটি গল্পও আমি নিয়েছি—ডাইনী। অন্য ডাইনী নামে হামের এক ডাইনীর গল্প। উইচকাফটের গল্প পশ্চিমে প্রচুর লেখা হয়েছে—বাংলা সাহিত্যে এজাতীয় গল্প সম্বন্ধে তারাশক্তির লিখেছেন। এটিও অসাধারণ এক গল্প। গল্পটি অনুদিত হলে উইচকাফটের উপর লেখা সব পশ্চিমা গল্পকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা।

পশ্চিমাদের ভূতের গল্প লেখাৰ হাত এবং বিশ্বাসবেচিত্ব আমাদের চেয়ে অনেক

ভাল বলে আমার মনে হয়। আমাদের ভূতের গল্পে যেমন একটা হেলাফেলা ভাব থাছে খন্দের তা নেই। সম্ভবত তার একটি কারণ হচ্ছে পশ্চিমা পাঠকরা এ জাতীয় গল্প খুব অগ্রহ নিয়ে পড়েন। এ-দেশীয় পাঠকরা ভৌতিক গল্প শিশুতোষ বিষয় মনে ভরেন, সৎ-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলেন না।

হয়ত এ কারণেই বাংলা ভাষার লেখকরা ভৌতিক গল্প লেখাৰ ব্যাপারে অনাগ্রহ বোধ কৰেন। বাংলা ভাষার অনেক লেখক বিদেশী গল্পের ছায়ায় ভূতের গল্প লিখেছেন এবং খুবই দুঃখের ব্যাপার কথ স্বীকার কৰাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰেন নি। তারা কি ধৰেই নিয়েছিলেন বাংলা ভাষার পাঠকরা মূল গল্পগুলি কখনো পড়বেন না! অনেক ভাল ভাল গল্প আমি এই সংকলনে নিতে পাৰি নি কাৰণ গল্পগুলিৰ মূল পশ্চিমে প্ৰোগতি।

পশ্চিমা ভূতের গল্পের সঙ্গে আমাদের ভূতের গল্পের একটা পার্থক্য হচ্ছে—বাংলা সাহিত্যে জীবজন্মের ভূত নেই বললেই হয়। পশ্চিমে—মানুষ- ভূতের সঙ্গে আছে ঘোড়াৰ ভূত, কুকুৰেৰ ভূত। ঘোড়া আমাদেৱ দেশে নেই, গৱাঁ তো আছে। গৱাঁৰ ভূতেৰ কোনো গল্পও কিন্তু নেই। শীলা মজুমদারেৰ একটা গল্পে ন্যাপাৰ কুকুৰেৰ ভূতেৰ ব্যাপাৰটা আছে। গল্প হিসেবে খুব ভাল না হলেও বিষয়বেচিত্বেৰ জন্যে গল্পটি এ সংকলনে রাখা হল। সত্যাজিত রামেৰ গল্প ‘ভূতো’ও বিষয়বেচিত্বেৰ দাবিদার। অবশ্য এই গল্প যে-বিষয় নিয়ে লেখা সে-বিষয়ে পশ্চিমে অনেক গল্প দেখা হয়েছে। ভূতু ম্যাজিক পশ্চিমা আদিবাসীদেৱ এবং যামাবৰদেৱ নিজস্ব ব্যাপার।

এই সংকলনে রবীন্নাথ ঠাকুৰেৰ দুটি গল্প নেয়া হয়েছে—নিশীথে, মাটোৱমশায়। ভূত ছাড়া ভূতেৰ গল্প কীভাৱে লেখা যায় এবং সেই গল্প কোন পৰ্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায়—নিশীথে তাৰ প্ৰকৃতি উদাহৰণ। মাটোৱমশায়ে একটি ভৌতিক পৰিবেশ তৈৰি কৰে অন্য গল্প বলা হয়েছে যেখানে পৰকালেৰ স্থান নেই।

প্রতাতকুমাৰ মুখ্যোপাধ্যায়েৰ লেখা একটি ভৌতিক কাহিনীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কালণ—গল্পটা চমৎকাৰ। উপস্থাপনা খুবই বিশ্বাসযোগ্য। ভৌতিক গল্পেৰ প্ৰাম হল বিশ্বাসযোগ্য উপস্থাপন। এই গল্পটি আমি পড়েছি আমাৰ কৈশোৱে। পৰিষ্কাৰ মনে আছে—গল্প শেষ কৰে প্ৰচণ্ড ভৱ পেয়েছিলাম। সংকলন ভূতু কৰাৰ আগে আগে গল্পটা আৰাৰ পড়লাম। আৰাৰো তয় পেলাম।

সতীনাথ ভাদুড়ীৰ একটা গল্প ‘রহস্য’ সংকলনে নিয়েছি। গল্পটি যতদুৰ মনে পড়ে এই মহান লেখকেৰ মৃত্যুৰ পৱ দেশ পত্ৰিকায় প্ৰকাশিত হয়। গল্পটা ঠিক ভৌতিক না—অতিপ্ৰাকৃত গল্প এবং অসাধারণ গল্প। বাৰ বাৰ পড়তে ইচ্ছে কৰে।

মানিক বন্দোপাধ্যায়েৰ গল্প হলুদপোড়া নেয়া হয়েছে। যদিও হলুদপোড়াকে ভূতেৰ গল্প বলা ঠিক হবে না। হলুদপোড়া লোকজ এক বিশ্বাসেৰ গল্প যে-বিশ্বাসেৰ সঙ্গে সম্পৰ্ক হল প্ৰাচীন বাংলাৰ বিশ্বাস। মানিকবাবু আধুনিক মানুষ ছিলেন। ভূতপ্ৰেতে বিশ্বাসী ছিলেন না। লেখালেখিৰ ব্যাপারে তাৰ কিছু শুচিবাইও ছিল—যা বিশ্বাস কৰি তা-ই লিখব, যা বিশ্বাস কৰি না তা লিখব না। আমাৰ খুব আফমোস হয় এই মহান লেখক সাহিত্যেৰ এই শাখাটিতে হাত দেন নি। হলুদপোড়া পড়লেই বোৱা যায়—সাহিত্যেৰ এই শাখায় হাত দিলে তিনি সোনাৰ ফসল তুলে আনতে পাৰতেন।

ভূতেৰ গল্পেৰ মোডকে শান্তিক কিছু গল্প বাংলা সাহিত্যে আছে। ইচ্ছা কৰেই

সেইসব গল্প বাদ দিয়োছি, তবে শৈলজানন্দের 'কে তুমি' বাদ দিতে পারি নি। চমৎকার গল্প। সমস্যা একটাই, অশরীরী দিয়ে উভ হলোও কে তুমি পুরোপুরি শরীরী গল্প।

সংকলনে পরঙ্গামের (রাজশেখর বসু) মহেশের মহাযাত্রা নেয়া হয়েছে। পরঙ্গাম তার ব্রহ্মসিদ্ধ হাসি-তামাশা বসিকতা দিয়ে উভ করেছেন—তারপর গল্পকে অসাধারণ এক পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন। গল্প যতই এগুলে থাকে পাঠকের মুখের হাসি ততই উকোতে থাকে। গল্প শেষ করার পর বাতি নিভিয়ে ঘুরতে যেতে পারে না। বাতি জালিয়ে রেখে বিছানায় যেতে হয়।

আমার কিছু গ্রিয় গল্পকারের গল্প এই সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেল। কারণ তারা ভূতের গল্প লিখেছেন ঠিকই—কিছু সেসব গল্প মজাদার ভূতের গল্প। তব নয় বাস্তরস সৃষ্টিই সেইসব গল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

সংকলন শিশুতোষ ভূতের গল্প পুরোপুরি বাদ দিতে পারিনি, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পানিমুড়ার কবলে' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'দুপুরে ভূত'—শিশু-কিশোরদের সামনে রেখে হলোও—সত্ত্বাকার অর্থেই ভৌতিক গল্প, এবং আমার পছন্দের গল্প।

লেখক বনফুল পরগোক, ভূতপ্রেতে খুব বিশ্বাসী ছিলেন। তার ভাগপপুরোর বাড়িতে যে-ই বেড়াতে যেত তাকেই তিনি জোর করে ভূতের গল্প শুনিয়ে দিতেন। কিছু অতিশ্রাকৃত বিষয় নিয়ে সেখালেবি তেমন করেন নি। অনেককাল আগে তার একটি অপূর্ব ভৌতিক গল্প পড়েছিলাম। অনেক হোজাখুজি করেও সেই গল্পটি পাই নি। এই সংকলনে অত্যুক্ত গল্প "অবর্তমান", অবশ্যই জাল গল্প। কিছু আমার মনে পড়ে আছে যে— গল্পটি পাওয়া যায় নি সেখানে।

সংকলনে আমি আমার নিজের দুটি গল্প দিলাম— তব, আয়না। আমি খুব বিনয় করে লিখতে পারতাম—বাংলা সাহিত্যের মহান লেখকদের গল্প-তালিকায় নিজের গল্প শুক্ত করতে আমার খুবই লজ্জা লাগছে, এটা এক ধরনের ধূষ্টতা... ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তা করলাম না। সংকলনের সম্পাদক হিসেবেই আমি মনে উচিত। বাংলাদেশীর আরও কিছু লেখকের গল্প সংকলনে শুক্ত করতে পারলে আমার খুব ভাল লাগত। আমি চেষ্টা করেছি। আমার অনুসন্ধানের ঝটি ছিল না। আমি পাই নি। বাংলাদেশীর লেখকরা ভূত নামক তৃষ্ণ ছেলেবুলানো বিষয় নিয়ে লিখতে পছন্দ করেন না। অনেক বড় বিষয় এবং অনেক জটিল সমস্যা নিয়ে তারা লিখতে পছন্দ করেন। 'ভূত' আবার লেখার বিষয় হতে পারে?

আমার কাছে 'ভূত' অতি গ্রিয় বিষয়। অতিপ্রাকৃত এক জগৎ। যে- জগতের দেখা পাই না, যা দেখা যায় না তাকেই দেখতে ইচ্ছে করে, যা ছোয়া যায় না, তাকেই তো ছুতে ইচ্ছে করে।

সংকলনের গল্পগুলি দিনের আলোয় নয়, রাতে পড়ার জন্যে পাঠকদের অনুরোধ করছি—সবচে ভাল হয় বর্ষণমুখৰ রাত।

হুমায়ুন আহমেদ
১মে ১৯৭৫
ধানমন্তি। ঢাকা

শৃঙ্খলা

- নিশ্চাত্রে / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১১
- মাস্টারমশায় / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ২২
- একটি ভৌতিক কাহিনী / প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / ৪৮
- মহেশের মহাযাত্রা / পরাঞ্জাম / ৫৪
- ডাইনী / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / ৬৪
- ভুলোর ছলনা / তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় / ৭২
- তারানাথ তাপ্তিকের গল্প / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ৮২
- মায়া / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ১০০
- গিন্নি-মা / কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ১০৯
- জাইম্যাজ / বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় / ১১৪
- রহস্য / সতীনাথ ভাদুড়ী / ১২০
- পাতালকন্যা / মনোজ বসু / ১২৬
- লাল চুল / মনোজ বসু / ১৩৪
- হলুদপোড়া / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৪৬
- অবর্তমান / বনফুল / ১৫৪
- দেহান্তর / শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় / ১৬১
- কে তুমি / শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / ১৭৩
- দিন দুপুরে ভূত / বুদ্ধদেব বসু / ১৮৫
- মান্দির মা / নরেন্দ্র দেব / ১৮৯
- আয়না / নরেন্দ্রনাথ মিত্র / ১৯৪
- ন্যাপা / লীলা মজুমদার / ২০২
- ভূতো / সত্যজিৎ রায় / ২০৬
- ঘাটবাবু / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / ২১৬
- পানিমুড়ার কবলে / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / ২২১
- তব / হুমায়ুন আহমেদ / ২২৭
- আয়না / হুমায়ুন আহমেদ / ২৪২

Join Us On Facebook

www.facebook.com/banglabookpdf

www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

নিশ্চীথে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“জাজার! জাজার!”

জুলাতন করিল। এই অর্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণবাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গ চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিঘ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি, তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণবাবু বির্গমুখে বিস্ফোরিতনেত্রে কহিলেন, “আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে— “তোমার প্রথম কোনো কাজে লাগিল না।”

আমি কিঞ্চিং সসংকোচে বলিলাম, “আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।”

দক্ষিণাচরণবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “ওটা তোমার ভাবি ভ্রম। মদ নহে; আদেয়াপাত্ত বিবরণ না শনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।”

কুলুঙ্গির মধ্যে কুন্দ চিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন ঝুলিতেছিল, আমি তাহা উকাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোয়া বাহির হইতে লাগিল। কোচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরেন-কাগজ-পাতা প্যাক্বারের উপর বসিলাম। দক্ষিণাচরণবাবু বলিতে লাগিলেন—

আমার প্রথম পক্ষের স্তৰীর মতো এমন গৃহিণী অতি দুর্গত ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশি ছিল না, সহজেই রসাধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভালো করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্রোকটা প্রায় মনে উদয় হইত—

গৃহিণী সচিবঃ সর্বী মিথঃ

গ্রিয়শিব্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমার গৃহিণীর কাছে ললিত-কলাবিধির কোনো উপদেশ খাটিত না এবং সর্বীভাবে প্রণয়সম্ভাবণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্নাতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরা এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাবণ মৃত্যুর মধ্যে অপদষ্ট হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংখ্যাতিক রোগে ধরিল। শুষ্ঠুর হইয়া, জুরবিকার হইয়া, মরিবার দাখিল হইলাম। বাচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তার জবার দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আঢ়ীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল; সে গব্ব ঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁচিয়া আমাকে ধাওয়াইয়া দিল। উষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টজ্ঞমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্তৰী আহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা ঝৌলোক, মানুষের সামাজ্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদৃতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণিকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হন্তে বাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিষ্ঠা ছিল না, জগতের আর-কোনো-কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।

যদি তখন পরাহত ব্যাধের ন্যায় আমাকে তাহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্তৰীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্তৰী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অন্তিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাহার নানাপ্রকার জটিল ব্যাঘোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, “আঃ করো কী। লোকে বলিবে কী। অমন করিয়া দিনবরাত্রি তৃণি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ে না।”

মেন নিজে পাখা যাইতেছি, এইরূপ ভাগ করিয়া রাত্রে যদি তাহাকে তাহার জুরের সময় পাখা করিতে যাইতাম তো তারি একটা কাঢ়াকাঢ়ি বাপার পড়িয়া যাইত। কোনোদিন যদি তাহার শুশ্যা-উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত, তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুমোগের কারণ হইয়া দাঢ়াইত। থম্ভাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, “পুরুষমানুষের অতটা বাঢ়াবাঢ়ি ভালো নয়।”

আমাদের সেই ব্যানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেঠেদির বেড়া দিয়া ধিরিয়া আমার স্তৰী নিজের মনের মতো একটুকরা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্টিই অভ্যন্তর সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশি। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গঠের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিতকর উত্তিরের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্মিত লাটিন নামের জয়ধারা উড়িত না। বেল তুই গোলাপ গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারাই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশি। প্রকাও একটা বকুলগাছের তলা সাদা মার্বল পাথর দিয়া

বাধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঢ়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। শীঘ্রকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাহার বসিলার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত, কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পাসিয়া বাবুরা তাহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, “ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।”

আমি তাহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তরবেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জন্মুর উপরে তাহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম, কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অন্তুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন, তাই একটি বালিশ আনিয়া তাহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি-একটি করিয়া প্রস্কৃট বকুল ফুল বারিতে লাগিল এবং শাখাত্তরাল হইতে ছায়াকিত জ্যোৎস্না তাহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারি দিক শাস্ত নিষ্কৃত; সেই ঘনগঙ্গপূর্ণ ছায়াককারে এক পার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হন্তে তাহার একটা উত্তু শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। কিন্তু কৃপ এইরূপ চূপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেগিত হইয়া উঠিল; আমি বলিয়া উঠিলাম, “তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিৰ না।”

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। আমার স্তৰী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিং অবিশ্বাস ছিল এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদক্ষণে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাহার সেই হাসির ঘাসা জানাইলেন, “কোনো কালে ভুলিবে না, ইহা কথনো সত্ত্ব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।”

ঐ সুমিট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কথনো আমার স্তৰীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে-সকল কথা মনে উদয় হইত, তাহার সম্মুখে গেলেই সেগুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অঞ্চলে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর-দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্বেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদপ্রতিবাদ কথায় চলে কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চূপ করিয়া যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ত্রিমাগতই কুভ কুভ ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন জ্যোৎস্নারাত্রেও কি পিকবদ্ধ বধির হইয়া আছে।

বহু চিকিৎসায় আমার স্তৰীর রোগ-উপশমের কোনো অক্ষণ দেখা গেল না।

ডাক্তার বলিল, “একবার বায়ুপরিবর্তন করিয়া দেখিলে তাণো হয়।” আমি স্তীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাত থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিভভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন ছিট মিট করিয়া জুঙিতে লাগিল এবং নিষ্ঠক ঘরে মশাব ভূম তনু শব্দ সুন্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাত মৌল ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আবগ্ন করিলেন—

সেখানে হারান ডাক্তার আমার স্তীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেককাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্তীও বুঝিলেন যে, তাহার ব্যামো সারিবার নহে। তাহাকে চিররূপগুণ হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন একদিন আমার স্তী আমাকে বলিলেন, “যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্ৰ আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর-কতদিন এই জীবন্ততকে লইয়া কাটাইবে। তুমি আর-একটা বিবাহ করো।”

এটা যেন কেবল একটা সুযুকি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে তারি একটা মহসু বীরত্ব বা অসমান্য কিছু আছে, এমন তার তাহার দেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু, আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে। আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গাঁথীর সমৃক্তভাবে বলিতে লাগিলাম, ‘যতদিন এই দেহে জীবন আছে—’

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, “মাও নাও ! আর বলিতে হইবে না। তোমার কথা গুণিয়া আমি আর বাঁচি না !”

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম, “এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না।”

গুণিয়া আমার স্তী ভাগ্য হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনো স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই আরোগ্য-আশা-হীন সেবাকার্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ, চিরজীবন এই চিররূপগুকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়, প্রথম-বৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুবের আশাসে, সৌন্দর্যের কেবলই আশাহীন সুনীর্ধ সত্যও মরুভূমি।

আমার দেৱার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্তাঙ্করহীন প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন ; সেইজন্য যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গঞ্জীরভাবে তাঁহার নিকট কবিতৃ ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর মেহ অথচ অনিবার্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অস্তরের কথাও অন্তর্মামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারান ডাক্তার আমাদের ব্রজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিন্তু দিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেরেটির সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেরেটি অবিবাহিত ; তাহার বয়স পনেরো হইবে। ডাক্তার বলেন, তিনি মনের মতো পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু, বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম—মেরেটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু, আর কোনো দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেইজন্য মাঝে মাঝে এক-একদিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্তীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উল্লীল হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন আমি হারান ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর-একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্যন্ত তখন ঢোকের সামনে কূলপরিপূর্ণ সুজ জল ছলছল চলচল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাপ্তপদে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দিগ্ন নিরানন্দ হইয়া উঠিল। তখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারান ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভালো ; কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্তীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু, মানুষের জীবনমৃত্যু সমকে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাত একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্তী হারানবাবুকে বলিতেছেন, “ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেন। বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাপ্তাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ঔষধ দাও যাবাতে শীঘ্ৰ এই প্রাপ্তি যায়।”

ডাক্তার বলিলেন, “ছি, এমন কথা বলিবেন না।”

কথাটা শুনিয়া হঠাত আমার বক্ষে বড়ে আঘাত লাগিল। ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্তীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে

হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, “এ ঘর বড়ো গরম, তৃণি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাজে তোমার ক্ষুধা হইবে না।”

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাঙারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাহাকে বুবাইয়া-ছিলাম, ক্ষুধাসংকারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিচয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিলেন। আমি নির্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণাচরণবাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশ্যে কহিলেন, “আমাকে একগুস জল আনিয়া দাও।” জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন—

একদিন ডাঙারবাবুর কল্যাণ মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কী কারণে তাহার সে প্রস্তাব আমার ভালো লাগিল না। কিন্তু, প্রতিবাদ করিবার কোনো হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেদিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাঢ়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাহার ব্যথা বাড়ে সেদিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিষ্ঠক হইয়া থাকেন: কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে, তাহাতেই তাহার যত্নগু বুবা যায়। ঘরে কোনো সাড়া ছিল না, আমি শব্দ্যাপান্তে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম; সেদিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন এমন সামর্থ্য তাহার ছিল না, কিংবা হয়তো বড়ো কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিষ্ঠক। কেবল এক-একবার যত্ননাম কিঞ্চিৎ উপরামে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিষ্ঠাস তন্ম যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঢ়াইলেন। বিপরীত দিক হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আৰারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরের কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঢ়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কে।”— তাহার সেই দুর্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া তয় পাইয়া আমাকে দুই-তিনবার অক্ষুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, “ও কে। ও কে গো।”

আমার কেমন দুর্বুক্ষ হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, ‘আমি চিনি না।’ বলিবামাত্রেই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্তেই বলিলাম, “ওঁ, আমাদের ডাঙারবাবুর কল্যাণ।”

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন; আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতে

গালিলাম না। পরফর্মেই তিনি ক্ষীণভাবে অভ্যাগতকে বলিলেন, “আপনি আসুন।” আমাকে বলিলেন, “আলোটা ধরো।”

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাহার সহিত রোগীর অস্তুরঞ্জ আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাঙারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাহার ডাঙারবাবা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন, “এই নীল শিশিটা মালিস করিবার, আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না, এ ওষুধটা তারি বিষ।”

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শব্দ্যাপার্শ্ববর্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাঙার তাহার কল্যাণকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন, “বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইহাকে সেবা করিবে কেন।”

আমার স্ত্রী বাস্ত হইয়া উঠিলেন: বলিলেন, “না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরানো কি আছে, সে আমাকে মাঝের মতো যত্ন করে।”

ডাঙার হাসিয়া বলিলেন, “উনি মা-লাল্লা, চিরকাল পরের সেবা করিয়া আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।”

কল্যাণকে লইয়া ডাঙার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, “ডাঙারবাবু, ইনি এই বড় ঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?”

ডাঙারবাবু আমাকে কহিলেন, “আসুন-না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।”

আমি দ্বিতীয় আপত্তি দেখাইয়া অন্তিমিলস্থি সম্মত হইলাম। ডাঙারবাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সহকে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সেদিন ডাঙারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি আমার স্ত্রী ছটকট করিতেছেন। অনুভাপে বিজ্ঞ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার কি ব্যথা বাঢ়িয়াছে।”

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাহার কষ্টরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাত্মে সেই রাত্রেই ডাঙারকে ডাঙাইয়া আনিলাম।

ডাঙার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই ব্যথাটা কি বাঢ়িয়া উঠিয়াছে। ঔষধটা একবার মালিস করিলে হয় না?”

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন, সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন।”

আমার স্তু ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন, “হ্যাঁ।”

ডাঙুর তৎক্ষণাত্মে গাঢ়ি করিয়া তাহার বাড়ি হইতে পাশ্চ আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্ধমূর্হিতের ন্যায় আমার স্তুর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে বেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “শোক করিয়ো না, ভালোই হইয়াছে, তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।”

ডাঙুর যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্তুর সকল ঘন্টাগার অবসান হইয়াছে।

দক্ষিণাচৰণ আৱ-একবার জল খাইয়া বলিলেন, “উঃ, বড়ো গৱাম!” বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া আসিয়া বসিলেন। বেশ বোৰা গেল, তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন জানু করিয়া তাহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আৱস্থ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল ; কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্ৰেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম, সে হাসিত না, গঁষ্ঠীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কী খটকা লাগিয়া গিয়াছিল, আমি কেমন করিয়া বুঝিব।

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্ৰথম শৰতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বৰানগৱের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্বছমে অঙ্ককার হইয়া আসিয়াছে। পাখিদের বাসার ডানা বাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘনজছায়াবৃত বাউগাছ বাতাসে সশব্দে কঁপিতেছিল।

শান্তি বোধ করিতেই মনোরমা সেই বৰুলতলার শুভ পাথৱের বেদীৰ উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অঙ্ককার আৱো ঘনীভূত ; যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তাৱায় আজ্ঞন ; তৰঞ্চলের বিস্তুৰণি যেন অনন্তগগনবন্ধনচূড়ান্ত নিঃশব্দতাৰ নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দেৰ সন্ধু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তৱলাবন্ধুয় ছিল। অঙ্ককার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনজছায়াতলে পান্ত্ৰূপ বৰ্ণে অক্ষিত সেই শিথিল-অঘঘন শ্রান্তকায় রমণীৰ আবছায়া মূর্তিটি আমার মনে এক অনিবায়

আবেগের সংঘাত করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধৰিতে পারিব না।

এমন সময় অঙ্ককার বাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধৰিয়া উঠিল ; তাহার পৰে কৃষ্ণপক্ষের জীৰ্ণপ্রান্ত হলুদবৰ্ণ চাঁদ ধীৱে ধীৱে গাছের মাথার উপরকাৰ আৱোহণ কৰিল ; সাদা পাথৱের উপৰ সাদা শাড়ি-পৰা সেই শ্রান্তশ্যান রমণীৰ মুখেৰ উপৰ জ্যোৎস্না আসিয়া গড়িল। আমি আৱ থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধৰিয়া কহিলাম, “মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কৰ না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি কোনো কালে ভুলিতে পারিব না।”

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম ; মনে পড়িল, ঠিক এই কথাটা আৱ-একদিন আৱ-কাহাকেও বলিয়াছি। এবং সেই মুহূৰ্তেই বৰুলতলাহের শাখাৰ উপৰ দিয়া, বাউগাছেৰ মাথার উপৰ দিয়া, কৃষ্ণপক্ষেৰ পীতবৰ্ণ ভাঙা চাঁদেৰ নীচে দিয়া, গদাৰ পূৰ্বপাৱ হইতে গদাৰ সুদূৰ পশ্চিমপাৱ পৰ্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা কৰিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মৰ্মভেদী হাসি কি অভভেদী হাহাকাৰ, বলিতে পারি না। আমি তদন্তেই পাথৱেৰ বেদীৰ উপৰ হইতে মৃচ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মৃচ্ছাত্মনে দেখিলাম, আমার ঘৰে বিছানায় শুইয়া আছি। শ্রী জিজ্ঞাসা কৰিলেন, “তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন।”

আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, “শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভৱিয়া হাহা কৰিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল ?”

শ্রী হাসিয়া কহিলেন, “সে বুঝি হাসি ? সাব বাঁধিয়া দীৰ্ঘ একবৰ্ষৰ পাখি উড়িয়া গেল, তাহাদেৱই পাথৱে শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও ?

দিনেৰ বেলায় শ্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখিৰ ঝোক উড়িবাৰ শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তৰদেশ হইতে ইংসুনেলী নদীৰ চৰে চৱিবাৰ জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত, চারি দিকে সমস্ত অঙ্ককার ভৱিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভৱিয়া অঙ্ককার বিদীৰ্ঘ কৰিয়া ধৰিত হইয়া উঠিবে। অবশ্যে এমন হইল, সন্ধ্যাৰ পৰ মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমাৰ সাহস হইত না।

তখন আমাদেৱ বৰানগৱেৰ বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে কৰিয়া বাহির হইলাম। অগ্ৰহায়ণ মাসে নদীৰ বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড়ো সুখে ছিলাম। চারি দিকেৰ সৌন্দৰ্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়েৰ রংক দ্বাৰা অনেকদিন পৰে ধীৱে ধীৱে আমাৰ নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশ্যে পঞ্চায় আসিয়া পৌছিলাম। ভয়ঞ্চকৰী পঞ্চা তখন হৈমন্তেৰ বিবৰলীন ভূজিনীৰ মতো কৃশিনজীৰভাবে সুদীৰ্ঘ শীতলনিদ্ৰায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তৰপাৱে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্ৰসাৱিত বালিৰ চৰ ধূ ধূ কৰিতেছে, এবং দক্ষিণেৰ উচ্চ পাড়েৰ উপৰ গ্ৰামেৰ আমবাগানজলি এই রাঙ্গসী

নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঢ়াইয়া কাঁপিতেছে ; পদ্মা ঘূমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিনীর্ণ তটভূমি ঝুঁপ্বাপ্ত করিয়া ভাড়িয়া ভাড়িয়া পড়িতেছে। এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুইজনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্যাস্তের স্বর্ণচূর্ণ মিলাইয়া যাইতেই শুক্রপঙ্কের নির্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ঝুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন ওর বালির চরের উপর রখন আজস অবারিত উষ্ণসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল, তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রালোকের অসীম স্থপ্তরাঙ্গের মধ্যে কেবল আমরা দুইজনে অমগ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেঠিল করিয়া তাহার শরীরটি আজ্ঞা করিয়া রহিয়াছে। নিষ্ঠকৃত রখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন তত্ত্ব এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; অত্যন্ত কাছে আসিয়া দে যেন তাহার সমস্ত শরীরমন জীবনযৌবন আমার উপর বিন্যন্ত করিয়া নিতান্ত নির্তর করিয়া দাঢ়াইল। পুলকিত উদ্বেগিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালোবাসা যায়। এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নহিলে কি দৃষ্টি ঘাসুষকে কেওখাও ধরে। তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও কিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম, সেই বালুকারাশির মাঝখালে অন্দরে একটি ভালাশয়ের মতো হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাঁধিয়া আছে।

সেই মরুভূমিকাবেষ্টিত নিষ্ঠরঙ নিম্নুণ নিষ্ঠল জলটুকুর উপরে একটি সুনীঘ জ্যোৎস্নার বেথা মূর্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঢ়াইলাম—মনোরমা কী ভাবিয়া আমর মুখের দিকে চাহিল, তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জোখ্মা-বিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধূমৰাত্রি চূল্পন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূল্য নিষ্ঠসঙ্গ মরুভূমির মধ্যে গঞ্জির স্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল, “ও কে। ও কে। ও কে।”

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্তুও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চরবিহারী জলচর পাখির ডাক। হঠাৎ এত রাজে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিরাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক থাইয়া আমরা দুইজনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া উঠিলাম ; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল। তখন অক্ষরারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঢ়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে

একটিমাত্র দীর্ঘ শীর্ষ অস্তিসার অঙ্গলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপচাপি অকৃটকচ্ছে কেবলই জিজাসা করিতে লাগিল, “ও কে। ও কে। ও কে গো।”

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্তেই ছায়ামৃতি মিলাইয়া দিয়া, আমার মশারি কাপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্মাত্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটি হাসি অদ্বিতীয় রাত্রির ডিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মা চর পার হইল, তাহার পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টি দেশ প্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তরে লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশ ক্ষীণ ক্ষীণতর ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুন্দরে চলিয়া যাইতেছে ; তখনে যেন তাহা জন্মত্বার দেশ ছাড়াইয়া গেল ; তখনে তাহা যেন স্তুর অঞ্চলগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল ; এত ক্ষীণ শব্দ কখনো শব্দ নাই, কঞ্চনা করি নাই ; আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে কিছুতেই আমার মন্ত্রকের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না ; অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া উঠিলাম অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কানের কাছে, অদ্বিতীয় আবার সেই অবরুদ্ধ দুর বলিয়া উঠিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো।” আমার বুকের রক্তের ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ক্ষনিত হইতে লাগিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।” সেই গভীর রাত্রে নিষ্ঠক বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সঙ্গীর হইয়া উঠিয়া তাহার ঘটার কাটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, “ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।”

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কষ্ট ক্ষম্ব হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে শ্পর্শ করিয়া কহিলাম, “একটু জল ধান।”

এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্ত দপ্ত করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্তী পথে একটা মহিমের গাড়ির ক্যাচ ক্যাচ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুঠকে, কাঞ্চনিক শক্তার মন্ত্রায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সেজন্য যেন অত্যন্ত জঙ্গিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসজ্ঞান্মাত্র না করিয়া অক্ষয় উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেইদিনই অর্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া দ্বা পড়িল, “ডাক্তার! ডাক্তার!”

মাস্টারমশায় র বীকুন্দনাথ ঠাকুর

ভাষ্মিকা

রাত্রি তখন প্রায় দুটা। কলিকাতার নিষ্ঠক শব্দসমূহে একটুখানি চেউ তুলিয়া কাছে থামিল। সেখানে একটা ঠিকাগাড়ি দেখিয়া আরোহী বাবু তাহাকে ডকিয়া আনাইলেন। তাহার পাশে একটি কোট-হাট পরা বাঞ্জালি বিলাত-ফৈর্তা ঘুৰা সম্মুখের আসনে দুই পা তুলিয়া দিয়া একটু মদমত্ত অবস্থায় ঘাড় নামাইয়া দুমাইতেছিল। এই ঘুরকতি নৃতন বিলাত হইতে আসিয়াছে। ইহারই অভ্যর্থনা-একজন বন্ধু তাহাকে কিছুদূর অগ্রসর করিবার জন্য নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহাকে দু-তিনবার ঢেলা দিয়া জাগাইয়া কহিলেন, “মজুমদার, গাড়ি পাওয়া গেছে, বাড়ি যাও।”

মজুমদার সচকিত হইয়া একটি বিলাতি দিব্য গালিয়া ভাঙাটে গাড়িতে উঠিয়া পড়িল। তাহার গাড়োয়ানকে ভালো করিয়া ঠিকানা বাঞ্লাইয়া দিয়া ব্রহ্ম গাড়ির আরোহী নিজের গম্ভীর পথে চলিয়া গেলেন।

ঠিকাগাড়ি কিছুদূর সিদ্ধা গিরা পার্ক-স্ট্রীটের সম্মুখে ময়দানের রাস্তায় মোড় লইল। মজুমদার আর-একবার ইংরেজি শপথ উকারণ করিয়া আপন মনে কহিল, ‘এ কী! এ তো আমার পথ নয়!’ তার পরে নিদ্রাজড় অবস্থায় ভাবিল, ‘হবেও বা, এইটিই হয়তো সোজা রাস্তা।’

ময়দানে প্রবেশ করিতেই মজুমদারের গা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল—কোনো লোক নাই তবু তাহার পাশের জায়গাটা যেন ভর্তি হইয়া উঠিতেছে; যেন তাহার আসনের শূল্য অংশের আকাশটা নিরেট হইয়া তাহাকে ঠাসিয়া ধরিতেছে। মজুমদার ভাবিল, ‘এ কী ব্যাপার! গাড়িটা আমার সঙ্গে এ কিরকম ব্যবহার করুন করিল।’

“এই গাড়োয়ান, গাড়োয়ান!”

গাড়োয়ান কোনো জবাব দিল না। পিছনের খড়গড়ি খুলিয়া ফেলিয়া সহিস্টার হাত চাপিয়া ধরিল; কহিল, “তুম ভিতর আকে নেই।”

সহিস ভীতকষ্টে কহিল, “নেহি, সা’ব, ভিতর নেহি যায়ে গা!”

শুনিয়া মজুমদারের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল; সে জোর করিয়া সহিসের হাত চাপিয়া কহিল, “জলনি ভিতৰ আও।”

সহিস সবলে হাত ছিনাইয়া লইয়া নামিয়া দৌড় দিল। তখন মজুমদার পাশের দিকে তয়ে ভয়ে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল; কিছুই দেখিতে পাইল না, তবু মনে গলায় আওয়াজ আনিয়া মজুমদার কহিল, “গাড়োয়ান, গাড়ি বোঝো।” বোধ চেষ্টা করিল—ঘোড়া কোনোমতেই থামিল না। না থামিয়া ঘোড়াদুটা রেড কহিল, “আরে, কাহা যাতা।” কোনো উত্তর পাইল না। পাশের শূল্যতার দিকে রহিয়া কটাক্ষ করিতে করিতে মজুমদারের সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাম ছুটিতে তাহা সে করিল, কিন্তু সে যতটুকু জায়গা ছাড়িয়া দিল ততটুকু জায়গা ভরিয়া উঠিল। মজুমদার মনে-মনে তর্ক করিতে লাগিল যে, ‘কোন থাচীন যুরোপীয় জনী বলিয়াছেন, Nature abhors vacuum—তাই তো দেখিতেছি। কিন্তু এটা কী রে! এটা কি Nature? যদি আমাকে কিছু না বলে তবে আমি এখনই ইহাকে সমস্ত জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া লাগাইয়া পড়ি।’ লাক্ষ দিতে সাহস হইল না—পাছে পিছনের দিক হইতে অভবিতপূর্ব একটা-কিছু ঘটে। ‘পাহারাওয়ালা’ বলিয়া ডাক দিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু বহুকষ্টে এমনি একটুবাণি অঙ্গুত ঝীঁপ আওয়াজ বাহির হইল যে, অত্যন্ত ভয়ের মধ্যেও তাহার হাসি পাইল। অঙ্ককারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিষ্ঠক পার্লামেন্টের মতো পরম্পর মুখামুরি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং গ্যাসের খুটিগুলো সমস্তই যেন জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না, এমনিভাবে খাড়া হইয়া মিটমিটে আলোকশিখায় চোখ টিপিতে লাগিল। মজুমদার মনে করিল, চটু করিয়া এক লক্ষে সামনের আসনে গিয়া বসিবে। যেমনি মনে করা অমনি অনুভব করিল সামনের আসন হইতে কেবলমাত্র একটা চাহনি তাহার শুধুর দিকে তাকাইয়া আছে। চক্ষু নাই, কিছুই নাই, অথচ একটা চাহনি। সে চাহনি যে কাহার তাহা যেন মনে পড়িতেছে অথচ কোনোমতেই যেন মনে আনিতে পারিতেছে না। মজুমদার দুই চক্ষু জোর করিয়া বুজিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু তয়ে বুজিতে পারিল না—সেই অনিদেশ্য চাহনির দিকে দুই চোখ এমন শক্ত করিয়া মেলিয়া রহিল যে, নিম্নের ফেলিতে সময় পাইল না।

এ দিকে গাড়িটা কেবলই ময়দানের রাস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে চক্রপথে ঘূরিতে লাগিল। ঘোড়া দুটো ক্রমেই যেন উন্নত হইয়া উঠিল—তাহাদের বেগ কেবলই বাড়িয়া চলিল—গাড়ির খড়খড়গুলো থরথর করিয়া কাপিয়া করিবার শব্দ করিতে লাগিল।

এমন সময় গাড়িটা যেন কিসের উপর খুব একটা ধৰ্মা থাইয়া হঠাৎ থামিয়া

গেল। মজুমদার চকিত হইয়া দেখিল, তাহাদেরই বাস্তায় গাড়ি দাঢ়াইয়াছে ও গাড়োয়ান তাহাকে নাড়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, “সাহেব, কোথায় যাইতে হইবে বলো।”

মজুমদার রাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এতক্ষণ ধরিয়া আমাকে ময়দানের মধ্যে ঘুরাইলি কেন।”

গাড়োয়ান আশ্চর্য হইয়া কহিল, “কই, ময়দানের মধ্যে তো ঘুরাই নাই।”

মজুমদার বিশ্বাস না করিয়া কহিল, “তবে এ কি শুধু বপ্প।”

গাড়োয়ান একটু ভাবিয়া ভীত হইয়া কহিল, “বাবুসাহেব, বুঝি শুধু বপ্প নহে। আমার এই গাড়িতেই আজ তিনি বছর হইল একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল।”

মজুমদারের তখন নেশা ও ঘুমের ঘোর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যাওয়াতে গাড়োয়ানের গল্পে কর্ণপাত না করিয়া ভাড়া চুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু, রাতে তাহার ভালো করিয়া ঘুম হইল না—কেবলই ভাবিতে জাগিল, সেই চাহনিটা কার।

১

অধর মজুমদারের বাপ সামান্য শিপ-সরকারি হইতে আরম্ভ করিয়া একটা বড়ো হৌসের মুকুদিগিরি পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। অধরবাবু বাপের উপর্যুক্ত নগদ টাকা সুনে খাটাইতেছেন, তাহাকে আর নিজে বাটিতে হয় না। বাপ মাথায় সাল ফেটা বাঁধিয়া পালকিতে করিয়া আপিসে যাইতেন, এ দিকে তাহার ত্রিল্লাকম দানব্যান ঘৃণ্ণেষ্ট ছিল। বিপদে-আপদে অভাবে-অনটনে সকল শ্রেণীর লোকেই যে তাহাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িত, ইহাই তিনি গবের বিষয় মনে করিতেন।

অধরবাবু বড়ো বাড়ি ও গাড়ি-জুড়ি করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে আর তাহার সম্পর্ক নাই; কেবল টাকা ধারের দালাল আসিয়া তাহার বাঁধানো ছাঁকায় তামাক টানিয়া যায় এবং অ্যাটচি-আপিসের বাবুদের সঙ্গে স্ট্যাপ্স-দেওয়া দলিলের শর্ত সহকে আলোচনা হইয়া থাকে। তাহার সৎসারের খরচগত সঙ্গে হিসাবের এমনি কষাকষি যে, পাড়ার কুটবল ক্লাবের নাহোড়বান্দা ছেলেরাও বহু চেষ্টায় তাহার তহবিলে দণ্ড ক্ষুট করিতে পারে নাই।

এমন সময় তাহার ধরকমার মধ্যে একটি অতিথির আগমন হইল। ছেলে হল না, হল না, করিতে করিতে অনেকদিন পরে তাহার একটি ছেলে জন্মিল। ছেলেটির চেহারা তাহার মার ধরনের। বড়ো বড়ো চোখ, টিকলো নাক, রঙ রঞ্জনীগঙ্কার পাপড়ির মতো—যে দেখিল সেই বলিল, “আহা ছেলে তো নয়, যেন কার্তিক।” অধরবাবুর অনুগত অনুচর বতিকাণ্ড বলিল, “বড়ো ঘরের ছেলের যেমনটি হওয়া উচিত তেমনই হইয়াছে।”

ছেলেটির নাম হইল বেণুগোপাল। ইতিপূর্বে অধরবাবুর জ্বী ননীবালা সংসারখরচ লইয়া স্বামীর বিরক্তে নিজের মত তেমন জোর করিয়া কোনোদিন খাটান নাই। দুটো-একটা শব্দের বাপার অথবা লৌকিকতার অত্যাবশ্যক

বায়োজন লইয়া মাঝে মাঝে বচসা হইয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে স্বামীর নৃপত্তির প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নিঃশব্দে হার মানিয়াছেন।

এবারে ননীবালাকে অধরলাল আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না, বেণুগোপাল সহকে তাহার হিসাব এক-এক পা করিয়া হঠিতে লাগিল। তাহার পায়ের মল, ঝাতের বালা, গলার হার, মাথার টুপি, তাহার দিশি বিলাতি নানা রকমের নানা পতের সাজসজ্জা সহকে ননীবালা যাহা-কিছু দাবি উঠাপিত করিলেন, সব-কটাই তিনি কখনো নীরব অশ্রদ্ধাতে কখনো সরব বাক্যবর্যণে জিতিয়া লইলেন। বেণুগোপালের জন্য যাহা দরকার নয় তাহা চাইই চাই—সেখানে শূন্য তহবিলের জের বা ভবিষ্যতের ফাঁকা আশ্বাস একদিনও থাটিল না।

২

বেণুগোপাল বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বেণুর জন্য খরচ করাটা অধরলালের অভ্যাস হইয়া আসিল। তাহার জন্য বেশি মাছিনা দিয়া অনেক-গাস-করা এক বুড়ো মাটোর রাখিলেন। এই মাটোর বেণুকে মিষ্টাবায় ও শিষ্টাচারে বশ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন—কিন্তু তিনি নাকি বরাবর ছাত্রদিপকে কড়া শাসনে চালাইয়া আজ পর্যন্ত মাটোরি মর্যাদা অঙ্গুশ রাখিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য তাহার ভাষার মিষ্টতা ও আচারের শিষ্টতায় কেবলই বেসুর লাগিল—সেই শুক সাধনায় ছেলে ভুলিল না।

ননীবালা অধরলালকে কহিলেন, “ও তোমার কেমন মাটোর। ওকে দেখিলেই যে ছেলে অস্ত্র হইয়া উঠে। ওকে ছাড়াইয়া দাও।”

বুড়ো মাটোর বিদায় হইল। সেকালে মেয়ে বেমন দ্বন্দ্বের হইত তেমনি ননীবালার ছেলে দ্বয়স্থানীর হইতে বসিল—সে যাহাকে না বরিয়া লইবে তাহার সকল পাস ও সকল সার্টিফিকেট বৃথা।

এমনি সময়টিতে গায়ে একখনি ময়লা চাদর ও পায়ে ছেঁড়া ক্যান্সিসের জুতা পরিয়া মাটোরি উমেদাবিতে হরলাল আসিয়া আসিল। তাহার বিধবা মা পরের বাড়িতে দোধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফস্বলের এন্টেপ্স কুলে কোনোমতে এন্টেপ্স পাস করাইয়াছে। এখন হরলাল কলিকাতায় কলেজে পড়িবে বলিয়া প্রাপণখ প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইয়াছে। অনাহারে তাহার মুখের নিম্ন অংশ শুকাইয়া তারতত্বর্ধের ‘কন্যাকুমারী’র মতো সরু হইয়া আসিয়াছে, কেবল মন্ত কপালটা হিমালয়ের মতো প্রশংসন হইয়া আত্মস্তু চোখে পড়িতেছে। মরজ্বমির বালু হইতে সূর্যের আলো যেমন ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি তাহার দুই চৰু হইতে দৈনন্দীর একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছে।

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “ভুমি কী চাও। কাহাকে চাও।” হরলাল তারে ভয়ে বলিল, “বাড়ির বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে চাই।” দরোয়ান কহিল, “দেখা হইবে না।” তাহার উচ্চরে হরলাল কী বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ইতস্তত করিতেছিল, এমন সময় সাত বছরের ছেলে বেণুগোপাল বাগানে খেলা সারিয়া দেউড়িতে

আসিয়া উপস্থিত হইল। দরোয়ান হরলালকে দ্বিঃ করিতে দেখিয়া আবার কহিল
“বাবু, চলা যাও।”

বেণুর হঠাতে জিন্দ চড়িল—সে কহিল, “নেহি যায় গা।” বলিয়া সে হরলালের
হাত ধরিয়া তাহাকে দোতলার বারান্দায় তাহার বাপের কাছে লইয়া হাজিয়ে
করিল।

বাবু তখন দিবানিন্দা সারিয়া জড়ালসভারে বারান্দায় বেতের কেদারায় চৃপচাপ
বসিয়া পা দোলাইতেছিলেন ও বৃক্ষ রতিকান্ত একটা কাটের চৌকিতে আসন হইয়া
বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতেছিল। সেদিন এই সময়ে এই অবস্থায় দৈরজন্মে
হরলালের মাস্টারি বাহাল হইয়া গেল।

রতিকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “আপনার পড়া কী পর্যন্ত ?”

হরলাল একটুখানি মুখ নিচু করিয়া কহিল, “এন্টেপ্স পাস করিয়াছি।”

রতিকান্ত জি তুলিয়া কহিল, “ওধু এন্টেপ্স পাস ? আমি বলি কলেজে
পড়িয়াছেন। আপনার বয়সও তো নেহাত কম দেখি না।”

হরলাল চৃপ করিয়া রহিল। আশ্রিত ও আশ্রয়প্রত্যাশীদিগকে সকল রকমে
পীড়ন করাই রতিকান্তের প্রধান আনন্দ ছিল।

রতিকান্ত আদর করিয়া বেণুকে কোলের কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া
কহিল, “কত এম. এ. বি. এ. আসিল ও গেল, কাহাকেও পছন্দ হইল না—আর
শেষকালে কি সোনাবাবু এন্টেপ্স-পাস-করা মাস্টারের কাছে পড়িবেন !”

বেণু রতিকান্তের আদরের আকর্ষণ জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কহিল,
“যাও!” রতিকান্তকে বেণু কোনোমতেই সহ্য করিতে পারিত না, কিন্তু রতিকান্ত
বেণুর এই অসহিষ্ণুতাকে তাহার বাল্যমাধুর্যের একটা লক্ষণ বলিয়া ইহাতে ঝুল
আমোদ পাইবার চেষ্টা করিত এবং তাহাকে সোনাবাবু চাঁদবাবু রলিয়া খেপাইয়া
আঙ্গন করিয়া তুলিত।

হরলালের উমেদাবি সফল হওয়া শক্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; সে মনে-মনে
ভাবিতেছিল, এইবার কোনো সুযোগে চৌকি হইতে উঠিয়া বাহির হইতে পারিলে
বাঁচা যায়। এমন সময়ে অধরলালের সহসা মনে হইল, এই ছেকরাটিকে নিতান্ত
সামান্য মাহিনা দিলেও পাওয়া যাইবে। শেষকালে স্থির হইল, হরলাল বাড়িতে
থাকিবে, থাইবে, ও পাঁচ টাকা করিয়া বেতন পাইবে। বাড়িতে রাখিয়া যেটুক
অতিরিক্ত দার্কিঙ্গ প্রকাশ করা হইবে তাহার বদলে অতিরিক্ত কাজ আদায় করিয়া
লইলেই এটুকু দয়া সার্থক হইতে পারিবে।

৩

এবারে মাস্টার টিকিয়া গেল। প্রথম হইতেই হরলালের সঙ্গে বেণুর এমনি
জমিয়া গেল যেন তাহারা দুই ভাই। কলিকাতায় হরলালের আজীয়বন্ধু কেহই ছিল
না—এই সুন্দর ছোটো ছেলেটি তাহার সমস্ত দুনিয়া জুড়িয়া বসিল। অভাগ
হরলালের এমন করিয়া কোনো মানুষকে ভালোবাসিবার সুযোগ ইতিপূর্বে কখনো

মাছে নাই। কী করিলে তাহার অবস্থা তালো হইবে, এই আশায় সে নহ কঠে বই
গোপাড় করিয়া কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় দিনরাত শুধু পড়া করিয়াছে। মাকে
পরাধীন ধাকিতে হইয়াছিল বলিয়া ছেলের শিশুবয়স কেবল সংকোচেই
কাটিয়াছে—নিয়েধের গগ্নি পার হইয়া দুষ্টামির দ্বারা নিজের বাল্যপ্রতাপকে
ঘৃণশালী করিবার সুখ সে কোনোদিন পায় নাই। সে কাহারও দলে ছিল না, সে
আপনার ছেড়া বই ও ভাঙ্গা স্লেটের মাঝখালে একলাই ছিল। জগতে জনিয়া যে
ছেলেকে শিশুকালেই নিষ্কজ্ঞ ভালোমানুষ হইতে হয়, তখন হইতেই মাত্তার দুঃখ ও
নিজের অবস্থা যাহাকে সাবধানে বুঝিয়া চলিতে হয়, সম্পূর্ণ অবিবেচক হইবার
জাধীনতা যাহার ভাগো কোনোদিন জোটে না, আমোদ করিয়া চক্ষুলতা করা বা
মুখ পাইয়া কাঁদা, এ দুটোই যাহাকে অন্য লোকের অসুবিধা ও বিরক্তির ভয়ে
সন্তুষ্ট শিশুশক্তি প্রয়োগ করিয়া চাপিয়া যাইতে হয়, তাহার মতো করুণার পাত্র
অথচ করুণা হইতে বঞ্চিত জগতে কে আছে!

সেই পৃথিবীর সকল মানুষের নীচে ঢাপা-পড়া হরলাল নিজেও জানিত না,
তাহার মনের মধ্যে এত মেহের বস অবসরের অপেক্ষায় এমন করিয়া জমা হইয়া
ছিল। বেণুর সঙ্গে খেলা করিয়া, তাহাকে পড়াইয়া, অসুবিধের সময় তাহার সেবা
করিয়া হরলাল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল নিজের অবস্থার উন্নতি করার চেয়েও মানুষের
আর-একটা জিনিস আছে—সে যথন পাইয়া বসে তখন তাহার কাছে আর-কিছুই
সাগে না।

বেণুও হরলালকে পাইয়া বাঁচিল। কারণ, ঘরে সে একটি ছেলে ; একটি অতি
ছোটো ও আর-একটি তিন বছরের বেন আছে—বেণু তাহাদিগকে সঙ্গদানের
যোগাই মনে করে না। পাড়ার সমবয়সী ছেলের অভাব নাই, কিন্তু অধরলাল
নিজের ঘরকে অত্যন্ত বড়ো ঘর বলিয়া নিজের মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখাতে
যোলামেশা করিবার উপযুক্ত ছেলে বেণুর ভাগ্যে জুটিল না। কাজেই হরলাল
তাহার একমাত্র সঙ্গী হইয়া উঠিল। অনুকূল অবস্থায় বেণুর যে-সকল দৌরান্য দশ
জনের মধ্যে ভাগ হইয়া একরকম সহনযোগ্য হইতে পারিত তাহা সমস্তই একা
হরলালকে বহিতে হইত। এই-সমস্ত উপন্দুব প্রতিদিন সহ্য করিতে করিতে
হরলালের স্বেচ্ছ আরো দৃঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। রতিকান্ত বলিতে লাগিল,
“আমাদের সোনাবাবুকে মাস্টারমাশায় মাটি করিতে বসিয়াছেন।” অধরলালেরও
মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রের সহকারি ঠিক যেন
যথোচিত হইতেছে না। কিন্তু হরলালকে বেণুর কাছ হইতে তফাত করে এমন
সাধ্য এখন কাহার আছে।

৪

বেণুর বয়স এখন এগারো। হরলাল এফ. এ. পাস করিয়া জলপানি পাইয়া
তৃতীয় বার্ষিকে পড়িতেছে। ইতিমধ্যে কলেজে তাহার দুটি-একটি বক্স যে জোটে
নাই তাহা নহে, কিন্তু ওই এগারো বছরের ছেলেটিই তাহার সকল বন্ধুর সেবা।

কলেজ হইতে ফিরিয়া বেণুকে লাইয়া সে গোলদিঘি এবং কোনো-কোনোদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইত। তাহাকে গৌক ইতিহাসের বীরপুরুষদের কাহিনী বলিত, তাহাকে কট ও ভিটের হাগোর গন্ধ একটু একটু করিয়া বাংলায় শনাইত। উচ্চেচনে তাহার কাছে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহা তর্জমা করিয়া ব্যাখ্যা করিত, তাহার কাছে শেখুরপীয়ারের 'জুলিয়েস সীজার' মধ্যে করিয়া পড়িয়া তাহা হইতে অ্যান্টনির বক্তৃতা মুখস্থ করাইবার চেষ্টা করিত। ওই একটুখানি বালক হরলালের হৃদয় উদ্বোধনের পথে যেন সোনার কাঠির মতো হইয়া উঠিল। একলা বসিয়া যখন পড়া মুখস্থ করিত তখন ইংরেজি সাহিত্য সে এমন করিয়া মনের মধ্যে প্রেরণ করে নাই, এখন সে ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার মধ্যে কিছু রস পাইলেই সেটা আগে বেণুকে দিবার জন্য আগ্রহ বোধ বুঝিবার শক্তি ও আনন্দের অধিকার যেন দুইগুণ বাড়িয়া যায়।

বেণু ইঙ্গুল হইতে আসিয়াই কোনোমতে তাড়াতাড়ি অল্পাম সারিয়াই হরলালের কাছে যাইবার জন্য একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিত, তাহার মা তাহাকে কোনো ছুতায় কোনো প্রলোভনে অন্তঃপুরে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। ননীবালার ইহা ভালো লাগে নাই। তাহার মনে হইত, হরলাল নিজের চাকরি বজায় রাখিবার জন্যই ছেলেকে এত করিয়া বশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে একদিন হরলালকে ডাকিয়া পর্দার আড়াল হইতে বলিল, "তুমি মাস্টার, ছেলেকে কেবল সকালে এক ঘন্টা, বিকালে এক ঘন্টা পড়াইবে—দিনরাত্রি উহার সঙ্গে লাগিয়া থাক কেন। যে ছেলে মা বলিতে একেবারে নাচিয়া উঠিত আজ যে তাহাকে ডাকিয়া পাওয়া যায় না! বেণু আমার বড়ো ঘরের ছেলে, উহার সঙ্গে তোমার অত মাথামাথি কিসের জন্য।"

সেদিন রত্নিকান্ত অধরবাবুর কাছে গন্ধ করিতেছিল যে, তাহার জানা তিনি-চারজন লোক, বড়োমানুষের ছেলের মাস্টারি করিতে আসিয়া ছেলের মন এমন করিয়া বশ করিয়া লইয়াছে যে, ছেলে বিষয়ের অধিকারী হইলে তাহারাই সর্বেসর্ব হইয়া ছেলেকে দেছেন মতো চলাইয়াছে। হরলালের প্রতিই ইশারা করিয়া যে এসকল কথা বলা হইতেছিল তাহা হরলালের বুঝিতে বাকি ছিল না। তবু সে চুপ মুক ভাড়িয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, বড়োমানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। পোয়ালঘরে ছেলেকে দুধ জোগাইবার মেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে—ছাত্রের সঙ্গে মেহপূর্ণ আস্তীয়াতার সহজ-হাপন এতবড়ো একটা স্পর্ধা যে বাড়ির চাকর হইতে গৃহিণী পর্যন্ত কেহই

কাহা সহ্য করিতে পারে না এবং সকলেই সেটাকে স্বার্থসাধনের একটা চাতুরী বলিয়াই জানে।

হরলাল কম্পিতকষ্টে বলিল, "মা, বেণুকে আমি কেবল পড়াইব, তাহার সঙ্গে আমার আর-কোনো সম্পর্ক থাকিবে না।"

সেদিন বিকালে বেণুর সঙ্গে তাহার খেলিবার সময়ে হরলাল কলেজ হইতে ফিরিলাই না। কেমন করিয়া রাত্তায় ঘুরিয়া সে সময় কাটাইল তাহা সেই জানে। সন্ধ্যা হইলে যখন সে পড়াইতে আসিল তখন বেণু মুখ ভার করিয়া গাইল। হরলাল তাহার অনুপস্থিতির কোনো জবাবদিহি না করিয়া পড়াইয়া গেল—সেদিন পড়া সুবিধামতো হইলাই না।

হরলাল প্রতিদিন রাত্রি থাকিতে উঠিয়া তাহার ঘরে বসিয়া পড়া করিত। বেণু সকালে উঠিয়াই মুখ ধুইয়া তাহার কাছে ছুটিয়া যাইত। বাগানে বাঁধানো চোরাচার মাছ ছিল। তাহাদিগকে মুড়ি বাওয়ানো ইহাদের এক কাজ ছিল। বাগানের এক কোণে কতকগুলা পাথর সাজাইয়া, ছোটো ছোটো রাস্তা ও ছোটো গেট ও বেড়া তৈরি করিয়া বেণু বালখিল্য খবির অশ্রমের উপর্যুক্ত একটি অতি ছোটো বাগান বসাইয়াছিল। সে বাগানে মালির কোনো অধিকার ছিল না। সকালে এই বাগানের চর্চা করা তাহাদের ছিতীয় কাজ। তাহার পরে বৌদ্ধ বেশি হইলে বাড়ি ফিরিয়া বেণু হরলালের কাছে পড়িতে বসিত। কাল সায়াহে যে গল্লের অংশ শোনা হয় নাই সেইটে শুনিবার জন্য আজ বেণু যথাদাদ্য ভোরে উঠিয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সকালে ওঠায় সে আজ মাস্টারমশায়কে গুপ্তি জিতিয়াছে। ঘরে আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায় নাই। দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাস্টারমশায় বাহির হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনও সকালে পড়ার সময় বেণু স্কুল হৃদয়টুকুর বেদনা লইয়া মুখ গঞ্জির করিয়া গাইল। সকালবেলায় হরলাল কেন যে বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা ও করিল না। হরলাল বেণুর মূখের দিকে না চাহিয়া বইয়ের পাতার উপর চোখ রাখিয়া পড়াইয়া গেল। বেণু বাড়ির ভিতরে তাহার মার কাছে যখন থাকিতে বসিল তখন তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল বিকাল হইতে তোর কী হইয়াছে মুখ দেখি। মুখ হাড়ি করিয়া আছিস কেন—তালো করিয়া থাইতেছিস না—যাপারখানা কী।"

বেণু কোনো উত্তর করিল না। আহারের পর মা তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদর করিয়া যখন তাহাকে বার বার প্রশ্ন করিতে জাগিলেন, তখন সে আর থাকিতে পারিল না, ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, "মাস্টারমশায়—"

মা কহিলেন, "মাস্টারমশায় কী।"

বেণু বলিতে পারিল না মাস্টারমশায় কী করিয়াছেন। কী যে অভিযোগ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন।

ননীবালা কহিলেন, “মাস্টারমশায় বুবি তোর মাঝ নামে তোর কাছে লাগাইয়াছেন।”

সে কথার কোনো অর্থ বুবিতে না পারিয়া বেণু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

৫

ইতিমধ্যে বাড়িতে অধরবাবুর কতকগুলা কাপড়চোপড় ছুরি হইয়া গেল। পুলিসকে খবর দেওয়া হইল। পুলিস খানাতলাসিতে হরলালেরও বাজ্র সন্ধান করিতে হাড়িল না। রতিকান্ত নিতান্তই নিরীহভাবে বলিল, “যে লোক লইয়াছে সে কি আর মাঝ বাজ্রের মধ্যে রাখিয়াছে।”

মালের কোনো কিনারা হইল না। একপ লোকসান অধরলালের পক্ষে অসহ। তিনি পৃথিবীসুন্দর লোকের উপর চাটিয়া উঠিলেন। রতিকান্ত কহিল, “বাড়িতে করিবেন। যাহার যখন খুশি আসিতেছে যাইতেছে।”

অধরলাল মাস্টারকে ডাকাইয়া বলিলেন, “দেখো হরলাল, তোমাদের কাহাকেও বাড়িতে রাখা আমার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এখন হইতে তুমি আলাদা বাসায় থাকিয়া বেণুকে ঠিক সময়মতো পড়াইয়া যাইবে, এই হইলেই ভালো হয়—নাহয় আমি তোমার দুই টাকা মাহিনে বৃদ্ধি করিয়া দিতে রাজি আছি।”

রতিকান্ত তামাক টানিতে টানিতে বলিল, “এ তো অতি ভালো কথা—উভয় পক্ষেই ভালো।”

হরলাল মুখ নিচু করিয়া শুনিল। তখন কিছু বলিতে পারিল না। ঘরে আসিয়া অধরবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল, নানা কারণে বেণুকে পড়ানো তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না, অতএব আজই সে বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে।

সেদিন বেণু ইঙ্গুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, মাস্টারমশায়ের ঘর শূন্য। তাহার সেই স্তুপ্রায় টিনের পেট্রাটি ও নাই। দড়ির উপর তাহার চাদর ও গামছা ঝুলিত, সে দড়িটা আছে কিন্তু চাদর ও গামছা নাই। টেবিলের উপর খাজপত্র ও বই এলোমেলো ছড়ানো থাকিত, তাহার বদলে সেখানে একটা বড়ো বোতলের মধ্যে সোনালি মাছ বাক্সক করিতে করিতে ওঠানামা করিতেছে। বোতলের গায়ের উপর মাস্টারমশায়ের হস্তাক্ষরে বেণুর নাম-লেখা একটা কাগজ আঁটা। আর-একটি নৃতন ভালো বাঁধাই করা ইংরেজি ছবির বই, তাহার ডিতরকার পাতায় এক প্রাতে বেণুর নাম ও তাহার নীচে আজকের তারিখ মাস ও সন দেওয়া আছে।

বেণু ছুটিয়া তাহার বাপের কাছে গিয়া কহিল, “বাবা, মাস্টারমশায় কোথায় গেছেন?”

৩০

বাপ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তিনি কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেছেন।”

বেণু বাপের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাশের ঘরে বিছানার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অধরবাবু ব্যাকুল হইয়া কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া গাহিলেন না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় হরলাল একটা মেসের ঘরে তঙ্গপোশের উপর উন্নালা হইয়া বসিয়া কলেজে যাইবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ মেঘিল, প্রথমে অধরবাবুদের দরোয়ান ঘরে প্রবেশ করিল এবং তাহার পিছনে বেণ ঘরে চুকিয়াই হরলালের গলা জড়াইয়া ধরিল। হরলালের গলার স্বর আটকাইয়া গেল; কথা কহিতে গেলেই তাহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িবে, এই ভয়ে সে কোনো কথাই কহিতে পারিল না।

বেণু কহিল, “মাস্টারমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।”

বেণু তাহাদের বৃন্দ দরোয়ান চন্দ্রভানকে ধরিয়া পড়িয়াছিল, যেমন করিয়া হটেক, মাস্টারমশায়ের বাড়িতে তাহাকে লইয়া যাইতে হইবে। পাড়ার যে মুটে হরলালের পেট্রা বহিয়া আনিয়াছিল তাহার কাছ হইতে সন্ধান লইয়া আজ ইঙ্গুলে যাইবার গাড়িতে চন্দ্রভান বেণুকে হরলালের মেসে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে।

কেন যে হরলালের পক্ষে বেণুদের বাড়ি যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাহা সে বলিতেও পারিল না অথচ তাহাদের বাড়িতেও যাইতে পারিল না। বেণু যে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে বলিয়াছিল ‘আমাদের বাড়ি চলো’, এই স্পর্শ ও এই কথাটার স্মৃতি কত দিনে কত রাত্রে তাহার কঠ চাপিয়া ধরিয়া যেন তাহার নিশ্চাস রোধ করিয়াছে। কিন্তু, ক্রমে এমনও দিন আসিল যখন দুই পক্ষেই সমস্ত চুকিয়া গেল, বক্ষের শিরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বেদনা নিশ্চাচর বাদুড়ের মতো আর ঝুলিয়া রহিল না।

৬

হরলাল অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়াতে আর তেমন করিয়া মানোযোগ করিতে পারিল না। সে কোনোমতেই স্থির হইয়া পড়িতে বসিতে পারিত না। বানিকটা পড়িবার চেষ্টা করিয়াই ধা করিয়া বই বক্ষ করিয়া ফেলিত এবং অকারণে স্নৃতপদে রাত্তায় ঘুরিয়া আসিত। কলেজে লেকচারের মোটের মাঝে মাঝে খুব বড়ো বড়ো ফাঁক পড়িত এবং মাঝে মাঝে যে-সমস্ত আঁকড়জোক পড়িত তাহার সঙ্গে প্রাচীন সজিঞ্চের চিরালিপি ছাড়া আর কোনো বর্ণমালার স্নাদশ্য ছিল না।

হরলাল বুবিল, এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। পরীক্ষায় সে যদি-বা পাস হয়, বৃক্ষ পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৃক্ষ না পাইলে কলিকাতায় তাহার একদিনও চলিবে না। ও দিকে দেশে মাঝেও দু-চার টাকা পাঠানো চাই। নানা চিষ্টা করিয়া চাকরির চেষ্টায় বাহির হইল। চাকরি পাওয়া কঠিন, কিন্তু না-পাওয়া তাহার পক্ষে আরো কঠিন; এই জন্য আশা ছাড়িয়াও আশা ছাড়িতে পারিল না।

৩১

হৰলালের সৌভাগ্যক্রমে একটি বড়ো ইংরেজ সদাগরের আপিসে উন্মেষারি করিতে গিয়া হঠাৎ সে বড়ো সাহেবের নজরে পড়িল। সাহেবের বিশ্বাস ছিল, তিনি মুখ দেবিয়া লোক চিনিতে পারেন। হৰলালকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে দু-চার কথা কহিয়াই তিনি মনে-মনে বলিলেন, ‘এ লোকটা চলিবে।’ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাজ জানা আছে?” হৰলাল কহিল, “না।” “জানিন দিতে পারিবে?” তাহার উত্তরেও “না।” “কোনো বড়োলোকের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে পার?” কোনো বড়োলোককেই সে জানে না।

শনিয়া সাহেব আরো যেন খুশি হইয়া কহিলেন, “আজ্ঞা বেশ, পঁচিশ টাকা বেতনে কাজ আরঞ্জ করো, কাজ শিখিলে উন্নতি হইবে।” তার পরে সাহেব তাহার বেশভূতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “পনেরো টাকা আগাম দিতেছি, আপিসের উপযুক্ত কাপড় তৈরি করাইয়া লইবে।”

কাপড় তৈরি হইল, হৰলাল আপিসেও বাহির হইতে আরঞ্জ করিল। বড়োসাহেব তাহাকে ভূতের মতো খাটাইতে লাগিলেন। অন্য কেরানিয়া বাড়ি গেলেও হৰলালের ছুটি ছিল না। এক-একদিন সাহেবের বাড়ি গিয়াও তাহাকে কাজ বুৰুৱাইয়া দিয়া আসিতে হইত।

এমনি করিয়া কাজ শিখিয়া লইতে হৰলালের বিলম্ব হইল না। তাহার সহযোগী কেরানিয়া তাহাকে ঠকাইবার অনেক চেষ্টা করিল, তাহার বিরুদ্ধে উপরওয়ালাদের কাছে লাগালাগি করিল, কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ নিরীহ সামান্য হৰলালের কোনো অপকার করিতে পারিল না।

যখন তাহার চালিশ টাকা মাহিনা হইল, তখন হৰলাল দেশ হইতে মাকে আনিয়া একটি ছোটোখাটো গলির মধ্যে ছোটোখাটো বাড়িতে বাসা করিল। এত দিন পরে তাহার মার দুঃখ ঘুচিল। মা বলিলেন, “বাবা, এইবার বউ ঘরে আসিব।”

হৰলাল মাতার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, “মা, ওইটে মাপ করিতে হইবে।”

মাতার আর-একটি অনুরোধ ছিল। তিনি বলিলেন, “তুই যে দিনবাত তোর ছাত্র বেণুগোপালের গরু করিস, তাহাকে একবার নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়া। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।”

হৰলাল কহিল, “মা, এ বাসায় তাহাকে কোথায় বসাইবে। যোসো, একটা বড়ো বাসা করি, তাহার পরে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিব।”

৭

হৰলালের বেতনবৃদ্ধির সঙ্গে ছোটো গলি হইতে বড়ো গলি ও ছোটো বাড়ি হইতে বড়ো বাড়িতে তাহার বাস-পরিবর্তন হইল। তবু সে কী জানি কী মনে করিয়া, অধৰলালের বাড়ি যাইতে বা বেণুকে নিজের বাসায় ডাকিয়া আনিতে কোনোমতেই মন স্থির করিতে পারিল না।

হয়তো কোনোদিনই তাহার সংখ্যকাচ ঘুচিত না। এমন সময়ে হঠাৎ খবর

পাওয়া গেল, বেণুর মা মারা গিয়াছেন। শনিয়া মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া সে অধৰলালের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

এই দুই অসমবয়সী বন্ধুতে অনেকদিন পরে আবার একবার মিলন হইল। বেণুর অশৌচের সময় পার হইয়া গেল, তবু এ বাড়িতে হৰলালের যাতায়াত চলিতে লাগিল। কিন্তু, ঠিক তেমনটি আর কিছুই নাই। বেণু এখন বড়ো হইয়া উঠিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী যোগে তাহার নৃতন গোফের রেখার সাধ্যসাধনা করিতেছে। চালচলনে বাবুয়ানা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার উপযুক্ত নকুরান্দবেরও অভাব নাই। কোনোঝাকে থিয়েটারের নটীদের ইতর গান বাজাইয়া সে বন্ধুমহলকে আমোদে রাবে। পড়িবার ঘরে সেই সাথেক ভাঙা চৌকি ও দাণি টেবিল কোঘায় গেল। আবারাতে, ছবিতে, আসবাবে ঘর যেন ছাতি মুলাইয়া রাখিয়াছে। বেণু এখন কলেজে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বার্ষিকের সীমানা পার হইবার জন্য তাহার কোনো তাপিদ দেখা যায় না। বাপ ছির করিয়া আছেন দুই-একটা পাস করাইয়া লইয়া বিবাহের হাতে ছেলের বাজারদর বাড়াইয়া তুলিবেন। কিন্তু, ছেলের মা জানিতেন ও স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, “আমার বেণুকে সামান্য লোকের ছেলের মতো গোরুর প্রয়াণ করিবার জন্য পাসের হিসাব দিতে হইবে না— লোহার সিন্দুকে কোম্পানির কাগজ অক্ষয় হইয়া থাক।” ছেলেও মাতার এ কথটা নেশ করিয়া মনে-মনে বুবিয়া লইয়াছিল।

যাহা হউক, বেণুর পক্ষে সে যে আজ নিতান্তই অনাবশ্যক তাহা হৰলাল “পটই বুঝিতে পারিল এবং কেবলই ধাকিয়া ধাকিয়া সেই দিনের কথা মনে পড়িল যেদিন বেণু হঠাৎ সরালবেদায় তাহার সেই ঘেসের বাসায় গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল ‘মাটোরমশায়, আমাদের বাড়ি চলো।’ সে বেণু নাই, সে বাড়ি নাই, এখন মাটোরমশায়কে কেই বা ডাকিবে।

হৰলাল মনে করিয়াছিল, এইবার বেণুকে তাহাদের বাসায় মাবো মাবো নিমন্ত্রণ করিবে। কিন্তু তাহাকে আহবান করিবার জোর পাইল, না। একবার ভাবিল ‘তাহাকে আসিতে বলিব’, তাহার পরে ভাবিল ‘বলিয়া লাভ কি—বেণু হয়তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে, কিন্তু, থাক।’

হৰলালের মা ছাড়িলেন না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি নিজের হাতে বাধিয়া তাহাকে থান্ত্রাইবেন—“আহা, বাহার মা মারা গেছে!”

অবশ্যেই হৰলাল একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কহিল, “অধৰবাবুর বাছ হইতে অমুমতি লইয়া আসি।”

বেণু কহিল, “অনুমতি লইতে হইবে না, আপনি কি মনে করেন আমি এখনো সেই খোকাবাবু আছি।”

হৰলালের বাসায় বেণু থাইতে আসিল। মা এই কার্তিকের মতো ছেলেটিকে তাহার দুই স্বিক্ষ চকুর আশীর্বাদে অভিষিক্ত করিয়া যত্ক করিয়া থাওয়াইলেন। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, ‘আহা, এই বয়সের এমন ছেলেকে ফেলিয়া আ. পি. ভো. গ.-৩

ইহার মা যখন মানিল তখন তাহার প্রাণ না জানি কেমন করিতেছিল।'

আহার সালিয়াই বেণু কহিল, "মাটারমশায়, আমাকে আজ একটু সকাল সকাল যাইতে হইবে। আমার দুই-একজন বন্ধুর আসিবার কথা আছে।"

বলিয়া পকেট হইতে সোনার ঘড়ি খুলিয়া একবার সময় দেখিয়া লইল ; তাহার পরে সংক্ষেপে বিদায় লইয়া জুড়িগাড়িতে চড়িয়া বসিল। হরলাল তাহার বাসার দরজার কাছে দাঢ়াইয়া রহিল। গাড়ি সমস্ত গলিকে কাপাইয়া দিয়া মুহূর্তের মধ্যেই চোখের বাহির হইয়া গেল।

মা কহিলেন, "হরলাল, উহাকে মাঝে মাঝে ডাকিয়া আনিস। এই বয়সে উহার মা মারা গেছে মনে করিলে আমার প্রাণটা কেমন করিয়া উঠে।"

হরলাল চুপ করিয়া রহিল। এই মাত্রাতে হেলেটিকে সামুদ্রনা দিবার জন্য সে কোনো প্রয়োজন বোধ করিল না। দীর্ঘস্থায় ফেলিয়া মনে-মনে কহিল, 'বাস, এই পর্যন্ত। আর-কখনো ডাকিব না। একদিন পাঁচ টাকা মাইনের মাটারি করিয়াছিলাম বটে—কিন্তু, আমি সামান্য হরলাল মাত্র।'

৮

একদিন সন্ধ্যার পর হরলাল আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার একতলার ঘরে অঙ্ককারে কে একজন বসিয়া আছে। সেখানে যে কোনো লোক আছে তাহা লক্ষ্য না করিয়াই সে বোধ হয় উপরে উঠিয়া যাইত, কিন্তু দরজায় ঢুকিয়াই দেখিল অসেসের গন্ধে আকাশ পূর্ণ। ঘরে প্রবেশ করিয়া হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "কে, যশ্যায়।"

বেণু বলিয়া উঠল, "মাটারমশায়, আমি।"

হরলাল কহিল, "এ কী ব্যাপার। কখন আসিয়াছি।"

বেণু কহিল, "অনেকক্ষণ আসিয়াছি। আপনি যে এত দেরি করিয়া আপিস হইতে ফেরেন, তাহা তো আমি জানিতাম না।"

বচুকাল হইল সেই-যে নিম্নলিখ খাইয়া গেছে তাহার পরে আর একবারও বেণু এ বাসায় আসে নাই। বলা নাই, কহা নাই, আজ হঠাতে এমন করিয়া সে যে সন্ধ্যার সময় এই অঙ্ককার ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে ইহাতে হরলালের মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উপরের ঘরে গিয়া বাতি জ্বালিয়া দুইজনে বসিল। হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "সব ভালো তো ? কিছু বিশেষ ঘবর আছে ?"

বেণু কহিল, পড়াশুনা ক্রমে তাহার পক্ষে বড়োই একমেয়ে হইয়া আসিয়াছে। কাঁহাতক সে বৎসরের পর বৎসর তেই সেকেভ ইয়ারেই আটকা পড়িয়া থাকে! তাহার চেয়ে অনেক বয়সে হেটো হেলের সঙ্গে তাহাকে একসঙ্গে পড়িতে হয়, তাহার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু বাবা কিছুতেই বোবেন না।

হরলাল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কী ইচ্ছা।"

বেণু কহিল, তাহার ইচ্ছা সে বিলাত যায়, বারিস্টার হইয়া আসে। তাহারই

সঙ্গে একসঙ্গে পড়িত, এমন-কি, তাহার চেয়ে পড়াশুনায় অনেক কাঁচা, একটি হেলে বিলাতে যাইবে স্থির হইয়া গেছে।

হরলাল কহিল, "তোমার বাবাকে তোমার ইচ্ছা জানাইয়াছ ?"

বেণু কহিল, "জানাইয়াছি। বাবা বলেন, পাস না করিলে বিলাতে যাইবার পাতার তিনি কানে আলিবেন না। কিন্তু আমার মন থারাপ হইয়া গেছে— এখানে থাকিলে আমি কিছুতেই পাস করিতে পারিব না।"

হরলাল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। বেণু কহিল, "আজ এই কথা লইয়া বাবা আমাকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছেন। তাই আমি বাড়ি থাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি। মা থাকিলে এমন কথনোই হইতে পারিত না।" বলিতে বলিতে সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

হরলাল কহিল, "চলো, আমি-সুন্দর তোমার বাবার কাছে যাই, পরামর্শ করিয়া মাহা ভালো হয় স্থির করা যাইবে।"

বেণু কহিল, "না, আমি সেখানে যাইব না।"

বাপের সঙ্গে রাগারাপি করিয়া হরলালের বাড়িতে আসিয়া বেণু থাকিবে, এ কথাটা হরলালের মোটেই ভালো লাগিল না। অথচ 'আমার বাড়ি থাকিতে পারিবে না' এ কথা বলাও বড়ো শক্ত।

হরলাল ভাবিল, 'আর-একটু বাদে মনটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ইহাকে ভুলাইয়া বাড়ি লইয়া যাইবে।' জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যাইয়া আসিয়াছ ?"

বেণু কহিল, "না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি আজ যাইব না।"

হরলাল কহিল, "সে কি হয়।" তাড়াতাড়ি মাকে গিয়া কহিল, "মা, বেণু আসিয়াছে তাহার জন্য কিছু খাবার চাই।"

শুনিয়া মা ভারি খুশি হইয়া খাবার তৈরি করিতে গেলেন। হরলাল আপিসের কাপড় ছাড়িয়া মুখ হাত ধুইয়া বেণুর কাছে আসিয়া বসিল। একটুখালি কাশিয়া, একটুখালি ইতস্তত করিয়া, সে বেণুর কাঁধের উপর হাত রাখিয়া কহিল, "বেণু, কাজটা ভালো হইতেছে না। বাবার সঙ্গে বাগড়া করিয়া বাড়ি হইতে চলিয়া আসা, আটা তোমার উপযুক্ত নয়।"

শুনিয়া তখনই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বেণু কহিল, "আপনার এখানে যদি মুনিধা না হয়, আমি সতীশের বাড়ি যাইব।"

বলিয়া সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হরলাল তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "রোসো, কিছু যাইয়া যাও।"

বেণু রাগ করিয়া কহিল, "না, আমি যাইতে পারিব না।" বলিয়া হাত ধাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

এমন সময়, হরলালের জন্য যে ভলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহাই বেণুর জন্য গালায় গুছাইয়া মা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন, "কোথায় যাও, বাঢ়া!"

বেণু কহিল, “আমার কাজ আছে, আমি চলিয়াম।”

মা বলিলেন, “সে কি হয় বাবা, কিছু না খাইয়া যাইতে পারিবে না।” এই বলিয়া সেই বারান্দায় পাত পাড়িয়া তাহাকে হাতে ধরিয়া ধাইতে বসাইলেন।

বেণু রাগ করিয়া কিছু খাইতেছে না, খাবার লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিতেছে মাত্র, এমন সময় দরজার কাছে একটা গাড়ি আসিয়া থামিল। প্রথমে একটা দরোয়ান ও তাহার পশ্চাতে দুর্যৎ অধরনের মচমচ শব্দে সিড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া উপস্থিত। বেণুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

মা ঘরের মধ্যে সরিয়া গেলেন। অধর হেলের সম্মুখে আসিয়া ক্ষেত্রে কল্পিত কঠিনে হরলালের দিকে চাহিয়া কহিলেন, “এই বুবি! রতিকান্ত আমাকে তখনই বলিয়াছিল, কিন্তু তোমার পেটে যে এত মতলব ছিল তাহা আমি বিষ্ণুস করি নাই। তুমি মনে করিয়াছ, বেণুকে বশ করিয়া উহার ঘাড় ভাঙিয়া ধাইবে! কিন্তু, সে হইতে দিব না। ছেলে চুরি করিবে! তোমার নামে পুলিস-কেস করিব, তোমাকে জেলে ঠেলিব তবে ছাড়িব।”

এই বলিয়া বেণুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “চল্। ওই।” বেণু কোনো কথাটি না কহিয়া তাহার বাপের পিছনে পিছনে চলিয়া গেল।

সেদিন কেবল হরলালের মুখেই খাবার উঠিল না।

৯

এবারে হরলালের সন্দোগ-আপিস কী জানি কী কারণে মফস্বল হইতে প্রচুর পরিমাণে চাল ডাল খরিদ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই উপলক্ষে হরলালকে প্রতি সন্তানেই শনিবার ভোরের গাড়িতে সাত-আট টাকার টাকা লইয়া মফস্বলে যাইতে হইত। পাইকেরদিগকে হাতে হাতে দায় চুকাইয়া দিবার জন্য মফস্বলের একটা বিশেষ কেন্দ্রে তাহাদের যে আপিস আছে সেইখানে দশ ও পাঁচ টাকার মোট ও নগদ টাকা লইয়া সে যাইত, সেখানে রসিদ ও খাতা দেখিয়া গত সন্তানের মোট হিসাব মিলাইয়া, বর্তমান সন্তানের কাজ চালাইবার জন্য টাকা রাখিয়া আসিত। সঙ্গে আপিসের দুইজন দরোয়ান যাইত। হরলালের জামিন নাই বলিয়া আপিসে একটা কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু বড়োসাহেব নিজের উপর সমস্ত ঝুঁকি লইয়া বলিয়াছিলেন—হরলালের জামিনের প্রয়োজন নাই।

মাঘ মাস হইতে এইভাবে কাজ চলিতেছে, চৈত্র পর্যন্ত চলিবে এমন সম্ভাবনা আছে। এই ব্যাপার লইয়া হরলাল বিশেষ ব্যন্ত ছিল। প্রায়ই তাহাকে অনেক ব্রাত্রে আপিস হইতে ফিরিতে হইত।

একদিন এইরূপ রাত্রে ফিরিয়া শুনিল বেণু আসিয়াছিল, যা তাহাকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া রসাইয়াছিলেন। সেদিন তাহার সঙ্গে কথাবার্তা গঞ্জ করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মন আরো স্নেহে আকৃষ্ট হইয়াছে।

এমন আরো দুই-একদিন হইতে লাগিল। মা বলিলেন, “বাড়িতে মা নাই নাকি, সেইজন্য সেখানে তাহার মন টেকে না। আমি বেণুকে তোর ছোটো

৩৬

বাইয়ের মতো আপন ছেলের মতোই দেখি। সেই মেহ পাইয়া আমাকে কেবল মা বলিয়া ডাকিবার জন্য এখানে আসে।” এই বলিয়া আঁচলের প্রস্তুত দিয়া তিনি চোখ মুছিলেন।

হরলালের একদিন বেণুর সঙ্গে দেখা হইল। সেদিন সে অপেক্ষা করিয়া পাসয়াছিল। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তা হইল। বেণু বলিল, “বাবা আজকাল এমন হইয়া উঠিয়াছেন যে আমি কিছুতেই বাড়িতে টিকিতে পারিতেছি না। বিশেষত শুনিতে পাইতেছি তিনি বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। রতিবাবু সম্মক লইয়া আসিতেছেন—তাঁহার সঙ্গে কেবলই প্রামাণ্য চলিতেছে। পূর্বে আমি কোথাও গিয়া দেরি করিলে বাবা অস্ত্র হইয়া উঠিতেন, এখন যদি আমি দুই-চারিদিন বাড়িতে না ফিরি তাহা হইলে তিনি আরাম বোধ করেন। আমি বাড়ি থাকিলে বিবাহের আলোচনা সাবধানে করিতে হয় বলিয়া আমি না থাকিলে তিনি ধৰ্ম ছাড়িয়া বাচেন। এ বিবাহ যদি হয় তবে আমি বাড়িতে থাকিতে পারিব না। আমাকে আপনি উদ্ধারের একটা পথ দেখাইয়া দিন—আমি স্বতন্ত্র হইতে চাই।”

মেহে ও বেদনায় হরলালের হনুম পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সংকটের সময় আর সকলকে ফেলিয়া বেণু যে তাহার সেই মাস্টারমশায়ের কাছে আসিয়াছে, ইহাতে কঠিনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনন্দ হইল। কিন্তু মাস্টারমশায়ের কতটুকুই বা সাধা আছে!

বেণু কহিল, “যেমন করিয়া হোক, বিলাতে গিয়া বারিস্টার হইয়া আসিলে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই।”

হরলাল কহিল, “অধরবাবু কি যাইতে দিবেন।”

বেণু কহিল, “আমি চলিয়া গেলে তিনি বাচেন। কিন্তু টাকার উপরে যেরকম মায়া, বিলাতের খরচ তাহার কাছ হইতে সহজে আদায় হইবে না। একটু কৌশল করিতে হইবে।”

হরলাল বেণুর বিজ্ঞতা দেখিয়া হসিয়া কহিল, “কী কৌশল।”

বেণু কহিল, “আমি হ্যাঙ্গনটে টাকা ধার করিব। পাওনাদার আমার নামে নালিশ করিলে বাবা তখন দায়ে পড়িয়া শোধ করিবেন। সেই টাকায় পাওনাইয়া বিলাত যাইব। সেখানে গেলে তিনি খরচ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।”

হরলাল কহিল, “তোমাকে টাকা ধার দিবে কে।”

বেণু কহিল, “আপনি পারেন না।”

হরলাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, “আমি।” তাহার মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

বেণু কহিল, “কেন, আপনার দরোয়ান তো তোড়ায় করিয়া অনেক টাকা ঘরে আনিল।”

হরলাল হসিয়া কহিল, “সে দরোয়ানও যেমন আমার, টাকাও তেমনি।”

বলিয়া এই আপিসের টাকার বাবহারটা কী তাহা বেণুকে বুবাইয়া দিল। এই

৩৭

টাকা কেবল একটি-রাত্রের জন্মাই দরিদ্রের ঘরে আশ্রয় লয়, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন করে।

বেণু কহিল, “আপনাদের সাহেব আমাকে ধার দিতে পারেন না ? নাহয় আমি সুন্দর বেশি করিয়া দিব।”

হরলাল কহিল, “তোমার বাপ যদি সিকিউরিটি দেন তাহা হইলে আমার অনুরোধে হয়তো দিতেও পারেন।”

বেণু কহিল, “বাবা যদি সিকিউরিটি দিবেন তো টাকা দিবেন না কেন।”

তর্কটি এইখানেই মিটিয়া গেল। হরলাল মনে-মনে ভাবিতে লাগিল, ‘আমার যদি কিছু খাকিত, তবে বাড়িঘর জমিজমা সমস্ত বেচিয়া-কিনিয়া টাকা দিতাম।’ কিন্তু একটিমাত্র অসুবিধা এই যে, বাড়িঘর জমিজমা কিছুই নাই।

১০

একদিন শুক্রবার রাত্রে হরলালের বাসার সম্মুখে জুড়িগাড়ি দাঢ়াইল। বেণু গাড়ি হইতে নামিবামাত্র হরলালের আপিসের দরোয়ান তাহাকে মন্ত একটা সেলাম করিয়া উপরে বাবুকে শশবজ্ঞ হইয়া সংবাদ দিতে গেল। হরলাল তখন তাহার শোবার ঘরে মেজের উপর বসিয়া টাকা মিলাইয়া লইতেছিল। বেণু সেই ঘরেই প্রবেশ করিল। আজ তাহার বেশ কিছু নৃতন ধরনের। শৌখিন ধূতিচাদরের বদলে মধুর শরীরে পার্শি কোট ও প্যান্টলুন আঁচিয়া মাথায় কাপ পরিয়া আসিয়াছে। তাহার দুই হাতের আঙুলে মণিমুক্তার আংটি ঝক্মক্ক করিতেছে। গলা হইতে লম্বিত মোটা সোনার চেনে আবক্ষ ঘড়ি বুকের পক্ষে নিবিষ্ট। কোটের আঙ্গনের ডিতর হইতে জামার হাতায় হীরার বোতাম দেখা যাইতেছে।

হরলাল টাকা গোনা বন্ধ করিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, “এ কী ব্যাপার ! এত রাতে এ বেশে যে !”

বেণু কহিল, “পরও বাবার বিবাহ। তিনি আমার কাছে তাহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু আমি খবর পাইয়াছি। বাবাকে বলিলাম, আমি কিছুদিনের জন্য আমাদের বারাকপুরের বাগানে যাইব। শুনিয়া তিনি ভারি খুশি হইয়া রাজি হইয়াছেন। তাই বাগানে চলিয়াছি। ইচ্ছ হইতেছে, আর ফিরিব না। যদি সাহস খাকিত তবে গঙ্গার জলে ভুবিয়া মরিতাম।”

বলিতে বলিতে বেণু কাঁদিয়া ফেলিল। হরলালের বুকে যেন ছুরি বিধিতে লাগিল। একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেণুর মাঝ ঘর, মাঝ খাটি, মাঝ স্থান অধিকার করিয়া লইলে, বেণুর শ্বেষ্মৃতিজড়িত বাড়ি যে বেণুর পক্ষে কিরকম কষ্টকর্ম হইয়া উঠিবে তাহা হরলাল সমস্ত হৃদয় দিয়া বুঝিতে পারিল। মনে-মনে ভাবিল, পৃথিবীতে পরিব হইয়া না জলিলেও দুঃখের এবৎ অপমানের অন্ত নাই। বেণুকে কী বলিয়া যে সাজুনা দিবে তাহা কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া বেণুর হাতখানা নিজের হাতে লইল। লইবামাত্র একটা তর্ক তাহার মনে উদয় হইল। সে ভাবিল, এমন একটা বেদনার সময় বেণু কী করিয়া এত সাজ করিতে পারিল।

৩৮

হরলাল তাহার আংটির দিকে চোখ রাখিয়াছে দেখিয়া বেণু যেন তাহার মনের অশুটা আঁচিয়া লইল। সে বলিল, “এই আংটিগুলি আমার মাঝের।”

শুনিয়া হরলাল বহু কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, “বেণু, যাইয়া আসিয়াছ ?”

বেণু কহিল, “হ্যাঁ—আপনার খাওয়া হয় নাই ?”

হরলাল কহিল, “টাকাগুলি শুনিয়া আয়রন-চেষ্টে না তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইতে পারিব না।”

বেণু কহিল, “আগনি যাইয়া আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে। আমি ঘরে রহিলাম ; মা আপনার খাবার লাইয়া বসিয়া আছেন।”

হরলাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, “আমি চট্ট করিয়া যাইয়া আসিতেছি।”

হরলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া মাকে লাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। বেণু তাহাকে প্রণাম করিল, তিনি বেণুর চিবুকের স্পর্শ লাইয়া চুম্বন করিলেন। হরলালের কাছে সমস্ত খবর পাইয়া তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। নিজের সমস্ত মেহ দিয়াও বেণুর অভাব তিনি প্রৱণ করিতে পারিবেন না, এই তাঁহার দুঃখ।

চারিদিকে ছড়ানো টাকার মধ্যে তিনজনে বসিয়া বেণুর ছেলেবেলাকার গল্প হইতে লাগিল। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে জড়িত তাহার কত দিনের কত ঘটনা। তাহার মাঝে মাঝে সেই অসংযতস্মেহশালিনী মার কথাও আসিয়া পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া গাত অনেক হইয়া গেল। হঠাৎ একসময় ঘড়ি খুলিয়া বেণু কহিল, “আর নয়, দেরি করিলে গাড়ি ফেল করিব।”

হরলালের মা কহিলেন, “বাবা, আজ রাত্রে এইখানেই থাকো-না, কাল সকালে হরলালের সঙ্গে একসঙ্গেই বাহির হইবে।”

বেণু মিনতি করিয়া কহিল, “না, মা, এ অনুরোধ করিবেন না, আজ রাত্রে যে করিয়া হউক আমাকে যাইতেই হইবে।”

হরলালকে কহিল, “মাস্টারমশায়, এই আংটি-ঘড়িগুলি বাগানে লাইয়া যাওয়া নিরাপদ নয়। আপনার কাছেই রাখিয়া যাই, ফিরিয়া আসিয়া লাইয়া যাইব। আপনার দরোয়ানকে বলিয়া দিন, আমার গাড়ি হইতে চামড়ার হ্যান্ডব্যাগটা আনিয়া দিক। সেইটের মধ্যে এগুলা রাখিয়া দিই।”

আপিসের দারোয়ান গাড়ি হইতে ব্যাগ লাইয়া আসিল। বেণু তাহার চেন ঘড়ি আংটি বোতাম সমস্ত খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে পুরিয়া দিল। সতর্ক হরলাল সেই ব্যাগটি লাইয়া তখনই আয়রন-সেকের মধ্যে রাখিল।

বেণু হরলালের মাঝ পায়ের ধুলা লইল। তিনি রঞ্জকর্ণে আশীর্বাদ করিলেন, “মা জগদ্ধা তোমার মা হইয়া তোমাকে রক্ষা করব।”

তাহার পরে বেণু হরলালের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। আর-কোনো দিন

৩৯

সে হরলালকে এমন করিয়া প্রণাম করে নাই। হরলাল কোনো কথা না বলিয়া তাহার পিঠে হাত দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ির লঞ্চে আলো ঝুলিল, ঘোড়া দুটা অধীর হইয়া উঠিল। কলিকাতার গ্যাসলোরখচিত শিশীরের মধ্যে বেগুকে লইয়া গাড়ি অনুশ্যা হইয়া গেল।

হরলাল তাহার ঘরে আসিয়া অনেকস্থগ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলিয়া টাকা গনিতে গনিতে তাগ করিয়া এক-একটা থলিতে ভরতি করিতে লাগিল। নোটগুলা পূর্বেই গনা হইয়া থলিবন্দি হইয়া গোহার সিন্দুকে উঠিয়াছিল।

১১

গোহার সিন্দুকের চাবি মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া সেই টাকার ঘরেই হরলাল অনেক রাত্রে শয়ন করিল। ভালো ঘুম হইল না। বিপ্লব দেখিল—বেগুর মা পর্দার আড়াল হইতে তাহাকে উচ্চস্থে তিরক্ষার করিতেছেন; কথা কিছুই স্পষ্ট শুনা যাইতেছে না, কেবল সেই অনিদিষ্ট কঠস্থরের সঙ্গে সঙ্গে বেগুর মার ছুনি-পান্না-ইঠার অলংকার হইতে লাল সবুজ ও রশ্মির সৃচিঞ্চলি কালো পদ্মটাকে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহার গলা দিয়া কিছুতেই সর বাহির হইতেছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা ভাঙ্গিয়া পর্দা ছিড়িয়া পড়িয়া গেল—চমকিয়া চোখ মেলিয়া হরলাল দেখিল একটা স্তুপাকার অঙ্ককার। হঠাৎ একটা দমকা হাত্ত্যা উঠিয়া সশস্দে জানলায় টেলা দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়াছে। হরলালের সমস্ত শরীর ঘামে ভিজিয়া গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই দিয়া আলো ঝুলিল। যত্তেও দেখিল চারটে বাজিয়াছে। আর ঘুমাইবার সময় নাই—টাকা লইয়া মফস্বলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

হরলাল মুখ ধুইয়া ফিরিবার সময় মা তাহার ঘর হইতে কহিলেন, “কী বাবা, উঠিয়াছিস?”

হরলাল প্রভাতে প্রথমে মাতার মঙ্গলমুখ দেখিবার জন্য ঘরে প্রবেশ করিল। মা তাহার প্রণাম লইয়া মনে-মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, “বাবা, আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, তুই যেন বউ আনিতে চলিয়াছিস। ভোরের স্বপ্ন কি মিথ্যা হইবে!”

হরলাল হাসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। টাকা ও নোটের ঘলেগুলা গোহার সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া প্যাকবাজ্য বন্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর ধড়স করিয়া উঠিল—দুই-তিনটা নোটের থলি শূন্য! মনে হইল স্বপ্ন দেখিতেছে। থলেগুলা লইয়া সিন্দুকের গায়ে জোরে আঁচাড় দিল—তাহাতে শূন্য থলের শূন্যতা অপ্রমাণ হইল না। তবু বুঝা আশায় থলের বক্সগুলা ঝুলিয়া খুব করিয়া আড়া দিল, একটি থলের ভিতর হইতে দুইখানি চিঠি বাহির হইয়া পড়িল। বেগুর হাতের লেখা—একটি চিঠি তাহার বাপের নামে,

আর-একটি হরলালের।

তাড়াতাড়ি ঝুলিয়া পড়িতে গেল। চোখে যেন দেখিতে পাইল না। মনে হইল, যেন আলো যাষ্টে নাই। কেবলই বাতি উসকাইয়া দিতে লাগিল। যাহা পড়ে তাহা ভালো বোবে না, বাংলা ভাষা যেন ভুলিয়া গেছে।

কথাটা এই যে, বেণু তিন হাজার টাকার পরিমাণ দশটাকালোলা নোট লইয়া বিলাতে যাত্রা করিয়াছে, আজ ভোরেই জাহাজ ছাড়িবাব কথা। হরলাল যে-সময় থাইতে গিয়াছিল সেই সময় বেণু এই কাণ করিয়াছে। লিখিয়াছে যে, “বাবাকে চিঠি দিলাম, তিনি আমার এই খাল শোধ করিয়া দিবেন। তা ছাড়া ব্যাগ ঝুলিয়া দেখিবেন তাহার মধ্যে মায়ের যে গহনা আছে তাহার দাম কত ঠিক জানি না, বোধ হয় তিন হাজার টাকার বেশি হইবে। মা যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তবে বাবা আমাকে বিলাতে যাইবার টাকা না দিলেও এই গহনা দিয়াই নিশ্চয় মা আমাকে খরচ জোগাড় করিয়া দিতেন। আমার মায়ের গহনা বাবা যে আর-কাহাকেও দিবেন তাহা আমি সহজ করিতে পারি না। সেইজন্য যেমন করিয়া পারি আমিহ তাহা লইয়াছি। বাবা যদি টাকা দিতে দেরি করেন তবে আপনি অন্যায়ে এই গহনা বেচিয়া বা বক্স দিয়া টাকা লইতে পারিবেন। এ আমার মায়ের জিনিস—এ আমারই জিনিস।” এ ছাড়া আরো অনেক কথা—সে কোনো কাজের কথা নহে।

হরলাল ঘরে তালা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানা গাড়ি লইয়া গঙ্গার ঘাটে ছুটিল। কোন জাহাজে বেণু যাত্রা করিয়াছে তাহার নামও সে জানে না। মেটিয়াবুরজ পর্যন্ত ছুটিয়া হরলাল খবর পাইল দুইখানা জাহাজ ভোরে রওনা হইয়া গেছে। দুখানাই ইংলণ্ডে যাইবে। কোন জাহাজে বেণু আছে তাহাও তাহার অনুমানের অতীত এবং সে জাহাজ ধরিবার যে কী উপায় তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না।

মেটিয়াবুরজ হইতে তাহার বাসার দিকে যখন গাড়ি ফিরিল তখন সকালের রৌদ্রে কলিকাতা শহর জাগিয়া উঠিয়াছে। হরলালের চোখে কিছুই পড়িল না। তাহার সমস্ত হতবুদ্ধি অন্তর্করণ একটা কলেবৰাহীন নিদারণ প্রতিকূলতাকে যেন কেবলই প্রাণপাণে টেলা মারিতেছিল—কিন্তু কোথাও এক তিলও তাহাকে টলাইতে পারিতেছিল না। যে বাসায় তাহার মা থাকেন, এতদিন যে বাসায় পা দিবামাত্র কর্মক্ষেত্রের সমস্ত ক্লান্তি ও সংঘাতের বেদনা মৃহর্তের মধ্যেই তাহার দূর হইয়া গিয়াছে, সেই বাসার সম্মুখে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল—গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সেই বাসার মধ্যে সে অপরিমেয় নৈরাশ্য ও ভয় লইয়া প্রবেশ করিল।

মা উদ্বিগ্ন হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জিঞ্জাসা করিলেন, “বাবা, কোথায় গিয়াছিলে?”

হরলাল বলিয়া উঠিল, “মা, তোমার জন্য বউ আনিতে গিয়াছিলাম।” বলিয়া ওককষ্টে হাসিতে হাসিতে সেইখানেই সৃষ্টি হইয়া পড়িয়া গেল।

“ও মা, কী হইল গো” বলিয়া মা তাড়াতাড়ি জল আনিয়া তাহার মুখে জলের বাপটা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হরলাল চোখ খুলিয়া, শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া, উঠিয়া বসিল। হরলাল কহিল, “মা, তোমরা ব্যস্ত হইয়ে না। আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও।” বলিয়া সে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মা দরজার বাহিরে মাটির উপর বসিয়া পড়িলেন—ফালুনের রৌদ্র তাহার সর্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল। তিনি কৃত্ত দরজার উপর মাথা রাখিয়া, থাকিয়া থাকিয়া কেবল ডাকিতে লাগিলেন, “হরলাল, বাবা হরলাল।”

হরলাল কহিল, “মা, একটু পরেই আমি বাহির হইব, এখন তুমি যাও।”
মা রৌদ্র সেইখানেই বসিয়া জপ করিতে লাগিলেন।

আপিসের দরোয়ান আসিয়া দরজায় ঘা দিয়া কহিল, “বাবু, এখনই না বাহির হইলে আর গাড়ি পাওয়া যাইবে না।”

হরলাল ভিতর হইতে কহিল, “আজ সাতটাৰ গাড়িতে যাওয়া হইবে না।”
দরোয়ান কহিল, “তবে কখন যাইবেন।”

হরলাল কহিল, “সে আমি তোমাকে পরে বলিৰ।”

দরোয়ান মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া নীচে চলিয়া গেল।

হরলাল ভাবিতে লাগিল, ‘এ কথা বলি কাহাকে। এ যে চুরি! বেণুকে কি জেলে দিব।’

হঠাতে সেই গহনার কথা মনে পড়িল। সে কথাটা একেবারেই খুলিয়া গিয়াছিল। মনে হইল, যেন কিমারা পাওয়া গেল। ব্যাগ খুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে শুধু আঁখটি, শড়ি, বোতাম, হার নহে—ব্রেসলেট, চিক, সিথি, মুকুর মালা প্রভৃতি আরো অনেক দামি গহনা আছে। তাহার দাম তিন হাজার টাকার অনেক বেশি। কিন্তু এও তো চুরি। এও তো বেণুর নয়। এ ব্যাগ যতক্ষণ তাহার ঘরে থাকে ততক্ষণ তাহার বিপদ।

তখন আর দেরি না করিয়া অধরলালের সেই চিঠি ও ব্যাগ লইয়া হরলাল ঘর হইতে বাহির হইল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথায় যাও, বাবা।”

হরলাল কহিল, “অধরবাবুর বাড়িতে।”

মার বুক হইতে হঠাতে অনিদিষ্ট ভাবের একটা মস্ত বোৰা নামিয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, ঐ-যে হরলাল কাল শুনিয়াছে বেণুর বাপের বিয়ে, তাই শুনিয়া অবধি বাহার মনে শাস্তি নাই। আহা, বেণুকে কত ভালোই বাসে!

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজ তবে তোমার আর মফস্বলে যাওয়া হইবে না?”

হরলাল কহিল, “না।” বলিয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

অধরবাবুর বাড়ি পৌছিবার পূর্বেই দূর হইতে শোনা গেল রসনচৌকি আলেয়া

রাগিণীতে করুণ স্বরে আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু হরলাল দরজায় চুকিয়াই দেখিল, বিবাহবাড়ির উৎসবের সঙ্গে একটা যেন অশাস্ত্রি লক্ষণ মিশিয়াছে। দরোয়ানের পাহারা কড়াকড়, বাড়ি হইতে চাকরবাকর কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না—সকলেরই মুখে ভয় ও চিন্তার ভাব। হরলাল ঘরের পাইল, কাল রাত্রে বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হইয়া গেছে। দুই-তিনজন চাকরকে বিশেষভাবে সন্দেহ করিয়া পুলিসের হাতে সমর্পণ করিবার উদ্যোগ হইতেছে।

হরলাল দোতালায় বারান্দার গিয়া দেখিল, অধরবাবু আগুন হইয়া বসিয়া আছেন ও রতিকান্ত তামাক খাইতেছে। হরলাল কহিল, “আপনার সঙ্গে গোপনে আমার একটু কথা আছে।”

অধরবাবু চাটিয়া উঠিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবার এখন আমার সময় নয়—যাহা কথা থাকে এইখানেই বলিয়া ফেল।”

তিনি ভাবিলেন, হরলাল বুবি এই সময়ে তাহার কাছে সাহায্য বা ধার চাহিতে আসিয়াছে। রতিকান্ত কহিল, “আমার সামনে বাবুকে কিছু জানাইতে যদি লজ্জা করেন, আমি নাহয় উঠি।”

অধর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, “আঃ, বোসো-না।”

হরলাল কহিল, “কাল রাতে বেণু আমার বাড়িতে এই ব্যাগ রাখিয়া গেছে।”

অধর বাগে কী আছে।

হরলাল ব্যাগ খুলিয়া অধরবাবুর হাতে দিল।

অধর। মাটারে ছাত্রে মিলিয়া বেশ কারবার খুলিয়াছ তো। জানিতে, এ চোরাই মাল বিক্রি করিলে ধরা পড়িবে, তাই আনিয়া দিয়াছ—মনে করিতেছ, সাধুতাৰ জন্য বকশিশ পাইবে?

তখন হরলাল অধরের পত্রখনা তাহার হাতে দিল। পড়িয়া তিনি আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, “আমি পুলিসে ঘৰে দিব। আমার ছেলে এখনো সাবালক হয় নাই—তুমি তাহাকে চুরি করিয়া বিলাতে প্রাপ্তীয়েছ। হয়তো পাঁচশো টাকা ধার দিয়া তিন হাজার টাকা লিখাইয়া লইয়াছ। এ ধার আমি শুধিব না।”

হরলাল কহিল, “আমি ধার দিই নাই।”

অধর কহিল, “তবে সে টাকা পাইল কোথা হইতে। তোমার বাবু ভাঙ্গিয়া চুরিয়াছে?”

হরলাল সে প্রশ্নের কোনো উত্তর দিল না। রতিকান্ত টিপিয়া টিপিয়া কহিল, “ওকে জিজ্ঞাসা করুন-না, তিন হাজার টাকা কেন, পাঁচশো টাকাও উনি কি কখনো চক্ষে দেখিয়াছেন।”

যাহা হউক, গহনা চুরির মীমাংসা হওয়ার পরেই বেণুর বিলাত-পালানো লইয়া বাড়িতে একটা হলস্তুল পড়িয়া গেল। হরলাল সমস্ত অপরাধের ভাব মাঝায় করিয়া লইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাস্তায় যখন বাহির হইল তখন তাহার মন যেন অসাড় হইয়া গেছে। ভয়

করিবার এবং ভাবনা করিবারও শক্তি তখন ছিল না। এই ব্যাপারের পরিণাম যে কী হইতে পারে মন তাহা চিন্তা করিতেও চাহিল না।

গলিতে প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহার বাড়ির সম্মুখে একটা গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ আশা হইল, বেশ ফিরিয়া আসিয়াছে। নিশ্চয়ই বেশ! তাহার বিপদ যে সম্পূর্ণ নিরপায়রূপে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবে, এ কথা সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না।

তাড়াভাড়ি গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, গাড়ির ভিতরে তাহাদের আপিসের একজন সাহেবের বসিয়া আছে। সাহেবের হরলালকে দেখিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, “আজ ঘৰুলে পেলে না কেন?”

আপিসের দারোয়ান সন্দেহ করিয়া বড়োসাহেবকে গিয়া জানাইয়াছে— তিনি ইহাকে পাঠাইয়াছেন।

হরলাল বলিল, “তিন হাজার টাকার নোট পাওয়া যাইতেছে না।”

সাহেবের জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় গেল?”

হরলাল ‘জানি না’ এমন উত্তরও দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

সাহেব কহিল, “টাকা কোথায় আছে দেখিব চলো।”

হরলাল তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেল। সাহেব সমস্ত গনিয়া চারিদিক খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিল। বাড়ির সমস্ত ঘর তলু-তলু করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই-সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না—তিনি সাহেবের সামনেই বাহির হইয়া ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওরে হরলাল, কী হইল রে।”

হরলাল কহিল, “মা, টাকা চুরি গেছে।”

মা কহিলেন, “চুরি কেমন করিয়া যাইবে। হরলাল, এমন সর্বনাশ কে করিল!”

হরলাল কহিল, “মা, চুপ করো।”

সন্ধান শেষ করিয়া সাহেবের জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে রাত্রে কে ছিল?”

হরলাল কহিল, “ছার বক করিয়া আমি একলা ওইয়াছিলাম—আর-কেহ ছিল না।”

সাহেব টাকাগুলা গাড়িতে তুলিয়া হরলালকে কহিল, “আচ্ছা, বড়োসাহেবের কাছে চলো।”

হরলালকে সাহেবের সঙ্গে চলিয়া যাইতে দেখিয়া মা তাহাদের পথ রোধ করিয়া কহিল, “সাহেব, আমার ছেলেকে কোথায় লইয়া যাইবে। আমি না থাইয়া এ ছেলে মানুষ করিয়াছি—আমার ছেলে কখনোই পরের টাকায় হাত দিবে না।”

সাহেব বাংলা কথা কিছু না বুঝিয়া কহিল, “আচ্ছা, আচ্ছা!”

হরলাল কহিল, “মা, তুমি কেম ব্যাস হইতেছ। বড়োসাহেবের সঙ্গে দেখা

করিয়া আমি এখনই আসিতেছি।”

মা উদবিশ্ব হইয়া কহিলেন, “তুই যে সকাল থেকে কিছুই খাস নাই।”

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া হরলাল গাড়িতে উঠিয়া চলিয়া গেল। মা মেজের উপরে লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

বড়োসাহেব হরলালকে কহিলেন, “সত্য করিয়া বলো ব্যাপারখানা কী।”

হরলাল কহিল, “আমি টাকা লই নাই।”

বড়োসাহেব। সে কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো কে নাইয়াছে।

হরলাল কোনো উত্তর না দিয়া মুখ নিচু করিয়া বসিয়া রহিল।

সাহেব। তোমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইয়াছে?

হরলাল কহিল, “আমার প্রাপ থাকিতে আমার জ্ঞাতসারে এ টাকা কেহ লইতে পারিত না।”

বড়োসাহেব কহিলেন, “দেখো হরলাল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করিয়া কোনো জামিন না লইয়া এই দায়িত্বের কাজ দিয়াছিলাম। আপিসের সকলেই বিরোধী ছিল। তিন হাজার টাকা কিছুই বেশি নয়। কিন্তু তুমি আমাকে বড়ো লজ্জাতেই ফেলিবে। আজ সমস্ত দিন তোমাকে সময় দিলাম—যেমন করিয়া পারো টাকা সংগ্রহ করিয়া আনো—তাহা হইলে এ লইয়া কোনো কথা ভুলিব না, তুমি যেমন কাজ করিতেছ তেমনি করিবে।”

এই বলিয়া সাহেব উঠিয়া গেলেন। তখন বেলা এগারোটা হইয়া গেছে। হরলাল যখন মাথা নিচু করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন আপিসের বাবুরা অত্যন্ত খুশি হইয়া হরলালের পতন লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

হরলাল এক দিন সময় পাইল। আরো একটা দীর্ঘ দিন বৈরাশ্যের পক্ষ আলোড়ন করিয়া তুলিবার মেয়াদ বাঢ়িল।

উপায় কী, উপায় কী, উপায় কী—এই ভাবিতে ভাবিতে সেই বৌদ্ধে হরলাল ব্রান্তায় বেড়াইতে লাগিল। শেষে উপায় আছে কি না সে ভাবনা বক হইয়া গেল, কিন্তু বিনা কারণে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো থামিল না। যে কলিকাতা হাজার হাজার লোকের আশ্রয়স্থান তাহাই এক বৃহত্তে হরলালের পথকে একটা প্রবান্ধ ফাঁসকলের মতো হইয়া উঠিল। ইহার কোনো দিকে বাহির হইবার কোনো পথ নাই। সমস্ত জনসমাজ এই অতিক্ষুদ্র হরলালকে চারিদিকে আটক করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেহ তাহাকে জানেও না এবং তাহার প্রতি কাহারও মনে কোনো বিদ্রেও নাই, কিন্তু প্রত্যেক লোকেই তাহার শক্তি। অথচ, রাজ্যের লোক তাহার গা ধেঁধিয়া তাহার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আপিসের বাবুরা বাহিরে আসিয়া ঠোঞ্চয় করিয়া জল খাইতেছেন, তাহার দিকে কেহ তাকাইতেছেন না; ময়দানের ধারে অলস পথিক মাথার নীচে হাত রাখিয়া একটা পায়ের উপর আর-একটা পা তুলিয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে; স্যাকরাগাড়ি ভৱতি করিয়া হিন্দুস্থানী মেয়েরা কালীঘাটে

চলিয়াছে; একজন চাপরাসি একখন চিঠি লাইয়া হৱলালের সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “বাবু, ঠিকানা পড়িয়া দাও”—যেন তাহার সঙে অন্য পথিকের কোনো প্রভেদ নাই; সেও ঠিকানা পড়িয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল। ক্ষেত্রে আপিস বড় হইবার সময় আসিল। বাড়িমুখে গাড়িগুলো আপিস-মহলের নানা রাস্তা দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আপিসের বাবুরা ট্র্যাম ভরতি করিয়া থিয়েটারের বিজ্ঞাপন পড়িতে পড়িতে বাসায় ফিরিয়া চলিল। আজ হইতে হৱলালের আপিস নাই, আপিসের ছুটি নাই, বাসায় ফিরিয়া যাইবার জন্য ট্র্যাম ধরিবার কোনো তাড়া নাই। শহরের সমস্ত কাজকর্ম, বাড়িধর, গাড়িজুড়ি, আনাগোনা হৱলালের কাছে কথনো-বা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সতোর মতো দাঁত মেলিয়া উঠিতেছে, কথনো-বা একেবারে বন্ধুহীন স্বপ্নের মতো ছায়া হইয়া আসিতেছে। আহার নাই, বিশ্বাস নাই, অশ্রয় নাই, কেমন করিয়া যে হৱলালের দিন কাটিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না। রাস্তায় রাস্তায় গ্যাসের আলো জলিল—যেন একটা সতর্ক অঙ্ককার দিকে দিকে তাহার সহস্র তৃণ চক্ষু মেলিয়া শিকারলুক দানবের মতো চূপ করিয়া রহিল। রাত্রি কত হইল সে কথা হৱলাল চিন্তাও করিল না। তাহার কপালের শিরা দুর্দুর করিতেছে; মাথা যেন ফাটিয়া যাইতেছে; সমস্ত শরীরে আঙুন জুলিতেছে; পা আর চলে না। সমস্ত দিন পর্যায়ক্রমে বেদনার উন্নেজনা ও অবসাদের অসাধুতার মধ্যে মার কথা কেবল মনের মধ্যে যাতায়াত করিয়াছে—কলিকাতার অসংখ্য জনশ্রেণীর মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র নামই শুককষ্ট তেদ করিয়া মুখে উঠিয়াছে—মা, মা, মা। আর-কাহাকেও ডাকিবার নাই। মনে করিল, রাত্রি যখন নিবিড় হইয়া আসিবে, কোনো লোকই যখন এই অতি সামান্য হৱলালকে বিনা অপরাধে অপমান করিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে না, তখন সে চূপ করিয়া তাহার মাঝের কোলের কাছে গিয়া শুইয়া পড়িবে—তাহার পরে ঘুম যেন আর না ভাঙে! পাছে তার মার সম্মুখে পুলিসের লোক বা আর-কেহ তাহাকে অপমান করিতে আসে এই ভয়ে সে বাসায় যাইতে পারিতেছিল না। শরীরের ভার যখন আর বহিতে পারে না এমন সময় হৱলাল একটা ভাড়াটে গাড়ি দেখিয়া তাহাকে ডাকিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় যাইবে?”

হৱলাল কহিল, “কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খালিকক্ষণ হাওয়া থাইয়া বেড়াইব।” www.banglابookpdf.blogspot.com

গাড়োয়ান সন্দেহ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হৱলাল তাহার হাতে আগাম ভাড়া একটা টাকা দিল। সে গাড়ি তখন হৱলালকে লাইয়া ময়দানের রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন শাস্তি হৱলাল তাহার তপ্ত মাথা খোলা জানালার উপর রাখিয়া চোখ বুজিল। একটু একটু করিয়া তাহার সমস্ত বেদনা যেন দূর হইয়া আসিল। শরীর শীতল হইল। মনের মধ্যে একটি সুগভীর সুনিবিড় আনন্দপূর্ণ শান্তি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। একটা যেন পরম পরিত্রাণ তাহাকে চারি দিক হইতে আলিঙ্গন

করিয়া ধরিল। সে যে সমস্ত দিন মনে করিয়াছিল, কোথাও তাহার কোনো পথ নাই, সদায় নাই, নিষ্কৃতি নাই, তাহার অপমানের শেষ নাই, দুঃখের অবধি নাই, তো কথাটা যেন এক মুহূর্তেই মিথ্যা হইয়া গেল। এখন মনে হইল, সে তো একটা জ্ঞান নাই, তো সত্য নয়। যাহা তাহার জীবনকে লোহার মুঠিতে আঁটিয়া গিয়ে ধরিয়াছিল, হৱলাল তাহাকে আর কিছুব্যাক স্বীকার করিল না—মুক্তি অনন্ত জ্ঞান পূর্ণ করিয়া আছে, শান্তির কোথাও সীমা নাই। এই অতিসামান্য হৱলালকে বেদনার মধ্যে, অপমানের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো রাজা-মহারাজারও নাই। যে আতঙ্কে সে আপনাকে আপনি বাঁধিয়াছিল তাহা সমস্তই খুলিয়া গেল। তখন হৱলাল আপনার বক্ষন্যুক্ত হৃদয়ের চারি দিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অঙ্ককার ঝুড়িয়া বসিতেছেন। তাহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাধাট বাড়িধর দোকানবাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আজ্ঞন হইয়া চুপ হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল, আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নিষ্কৃত তাহার মধ্যে মিলাইয়া গেল—হৱলালের শরীর-মনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভাবনা, সমস্ত চেতনা, তাহার মধ্যে অঞ্চল করিয়া নিষ্পোষ হইয়া গেল—এই গেল, তপ্ত বাল্পের বুদ্বুদ একেবারে ফাটিয়া গেল—এখন আর অঙ্ককারও নাই, আলোকও নাই, রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা।

www.banglابookpdf.blogspot.com

গির্জার ঘড়িতে একটা বাজিল। গাড়োয়ান অঙ্ককার ময়দানের মধ্যে গাড়ি লাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশ্যে বিরক্ত হইয়া কহিল, “বাবু, ঘোড়া তো আর চলিতে পারে না—কোথায় যাইতে হইবে বলো।”

কোনো উত্তর পাইল না। কোচবাজ্জ হইতে নামিয়া হৱলালকে নাড়া দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল। উত্তর নাই। তখন ভয় পাইয়া গাড়োয়ান পরীক্ষা করিয়া দেখিল, হৱলালের শরীর আড়ষ্ট, তাহার নিষ্কাস বহিতেছে না।

‘কোথায় যাইতে হইবে’ হৱলালের কাছ হইতে এই প্রশ্নের আর উত্তর পাওয়া গেল না।

একটি ভৌতিক কাহিনী অভাবকুমার মুখ্যোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগুরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি.এ. পাশ করিয়া চাকরির সঙ্গানে প্রবৃত্ত হই। কর্মকর্মসূচিয়া বহু স্থানে বহু স্থানে আবেদন করিলাম কিন্তু কোনোক্ষণ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া ক্ষয়ৎ সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধানে। বরাবর একটি কাচা রাস্তা আছে। আমি থামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র সইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নৃতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অংশ বেতন, সেইক্ষণ একটি ছোটখাটো সন্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড় মাটার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্দান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগু তথাপি বাসোপযোগী করেকথানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ মিশ্র মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু ওজর এই যে বাড়িটিতে ভৃত্য আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—ইঝংবেঙ্গল—ভৃত্যের ভয়ে যদি পক্ষাংপদ হই তবে আমার বিদ্যা-মর্যাদা একেবাবে ধূলিসাক্ষ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত-দূরে একাকী ধাকা নিরাপদ নহে চোর-ডাকাতের ভয়ও ত আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখ্যোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি.এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইঝংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। তাহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাঁচক ব্রাক্ষণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অসীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্ভত হইতে হইল। প্রবর্তী রবিবার প্রান্তে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগু, গো-

মাহিয়ানি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি কড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি রিতল, নিম্নতলে সমুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দুটি মাত্র আমরা দখল করিলাম, কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুকুরিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অন্তর্দুরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিরাই স্নান করিতাম এবং পান-রসালের জন্য সেই জল আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপরবর্ষান্তে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ল করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে থানীপ জালা থাকিত। এইজন্মে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা বনিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদ্মবন্ধনে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের ঘামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পুবে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই ঘামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে, সেই মন্দিরে রামপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাক্ষণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিঙ্কপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুর্পার্শবর্তী ঘামের গোকেরা তাহাকে যথেষ্ট শুদ্ধাভঙ্গি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঢ়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া, আমি তাহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—“বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?”

আমি উত্তর করিলাম—“সিউড়ী কুলে আমার মাস্তার চাকরি হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।”

মজুমদার মহাশয় একটি চিঞ্চা করিয়া বলিলেন—“বাবা, আজ কি তোমার না গোলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইলে।”

আমি বলিলাম—“কল্য কুল খুলিবে। আমার নৃতন চাকরি, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও-রূপ আজ্ঞা করিবেন না।”

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—“তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?”

—“শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটা ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের কুলের অন্য একটি মাস্তার রাসবিহারী মুখ্যোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।”—বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ ঢালিতে লাগিলাম।

বেলা আল্পাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক থাইতেছি, এমন সময় আ. প্রি. ভো. গ.-৪

দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কি রে! তুই হঠাতে কোথা থেকে এলি?”

সে বলিল—“আজ্জে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।” বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন—“তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রামপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি কবচ দিয়া বলিলেন—‘মা তোমার ছেলে আজ আপত্তি সিউড়ী রওলা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচ আনিয়াছি, তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া শেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনোক্ষণ ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের ওপরে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে।’ সুতরাং আমি দীনু কৈরবৰ্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। আগ্রিমাত্রে রামনাম প্রারণ করিয়া তুমি কবচটি ভঙ্গিপূর্বক দাখিল হইতে ধারণ করিবে, যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাত্-আজ্জা জানিবে।”

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, “তুই আজ এখনেই থাকিবি তো? তোর খাবার জোগাড় করি?”

সে বলিল, “আজ্জে না, মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ‘তুই নিজে দোড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।’”

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আলা পয়সা দিয়া বলিলাম—“এই নে, বাজার হইতে কিছু মৃত্তি মূড়কি কিনিয়া পথে থাইতে থাইতে যাইবি।” তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হইতে ধারণ করিলাম। সে আমায় প্রশংসন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চেকিল শিয়ারে দুটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঝে, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঝেকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দুকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিষ্ঠন্ত হইলাম। পথশ্রেণে কাতর ছিলাম, শীঘ্ৰই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঝপুঁজের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালাপথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চন্দু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙালসার বৃক্ষ আমার শব্দ্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে এবং একদৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখখনা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ, গালের চামড়া খুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন

বাটীন উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয় চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথার সান্দা ছোট চুলগুলো যেন দোড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চন্দু দুটা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রোহের স্থান বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমন্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চন্দু মুদ্রিত করিলাম। ফিল্ট সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চন্দু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মৃত্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চন্দু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাতে মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা শ্বরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রক্ষাকৰ্বচ বহিয়াছে এবং মদুস্বরে তাৰকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চন্দু খুলিলাম, তখন সে মৃত্তি আৱ নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকষ্টে আমার নজুকে তাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—“কি মহাশয়?”

আমি তখন প্রদীপ জুলিয়া সমস্ত ঘটনা তাহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় ক্ষুলে গেলাম। টিফিনের সময় ভাকওয়ালা পিণ্ডে একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রামপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির ভারিখ ও ছাপ গতকল্পকার। চিঠিখানিতে লেখা আছে:

শ্রী শ্রীদুর্গাশূরঃ

প্রমত্তভাশীর্বাদঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্প তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনোক্ষণ ভয় পাইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তাৰকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা উক্তাচারে থাকিবে। অত্র কৃশ্ল। মা ভাবানী তোমার মঙ্গল করিল।

ইতি নিয়ত আশীর্বাদক

শ্রীরামপ্রসন্ন দেবশৰ্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিশ্বয়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারী বাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—“আজ্জা আমি যে সেইরাতে ভয়

পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন ? ”

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন— “তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাভ্যা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ঝুঁক হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপর্যুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিণ না। ”

আমি বলিলাম— “মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন ? আমরা উভয়েই একজো সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন ? ”

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন— “সে সোবাটির নাম কি ? ”

— “তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ”

— “তিনি ত্রাসণ, এই কারণে ভূত সহসা তাহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কারন্তু তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত। ”

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম— “সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে ? ”

— “করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হইবে না। ”

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে তৃতৈর কথা আমি প্রায় বিস্মিত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর স্থানে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি জন্মে হিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও কয়েক বৎসর সুস্থানির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মুক্তব্লে নানা স্থানে ভয়ণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি প্রাম্য কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সর্ব্বার পর আহারাদি করিয়া, শরৎকালের পরিকার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিট্রিচ বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ি মছর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। দুই এ-পাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্র মুছিয়া কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিকার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্ধিবন্ধ। কুরু বুরু করিয়া বাতাস

হাতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিম্না যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি আর শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্ত্র আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া চুলিতে লাগিলাম। ইঠাই গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা বাকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্ত্র ছুটিয়া গেল।

চক্র শুলিয়া দেখি, সেই ভীমণ মৃতি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোগালের উপর দুইটা জীৰ্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জুলত চক্র দুইটা হইতে আমার প্রতি ত্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লাগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারক্তন্ত্র নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিল সে মৃতি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

কাঁকাশিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিল বলিল— “বাবু, এ কি ! গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন ? ”

আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম— “হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে। ”

গাড়োয়ান তখন গমড়ি থামাইবার এবং ঘুম ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া কেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি হামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য পরামর্শ গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম— “থাক, আজ আর কাজ নাই, গরুকে শুলিয়া দাও, উহাদের মুখে রাস জল দাও, কলা প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাঁচে এইখানেই বিশ্রাম করি। ”

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব, আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন উনিয়াছি, উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য।

—শ্রীইন্দ্ৰমণি দেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দৰানু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য।

মহেশের মহাযাত্রা

পরম্পরাম

কেদার চাটুজ্জে মহাশয় বলিলেন,—আজকাল তোমরা সামান্য একটি বিদ্যে শিখে নাস্তিক হয়েছ, কিছুই মানতে চাও না। যখন আরও একটু শিখবে তখন বুবাবে যে আস্থা আছেন। ভূত, গেতনী—এরাও আছেন। বেষ্টিতি, কঙ্কাটা—এঝারাও আছেন।'

বৎশলোচনবাবুর বৈষ্টকখানায় গল্প চলিতেছিল। তাহার শালা নগেন বলিল,—'আজ্ঞা বিনোদ-দা, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'যখন প্রত্যক্ষ দেখব তখন বিশ্বাস ক'রব। তার আগে হাঁ-না কিছুই বলতে পারিনা।'

চাটুজ্জে বলিলেন—'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি উকালতি কর। বলি, তোমার প্রগিতামহকে প্রত্যক্ষ করেছ? ম্যাকডোনাল্ড, চার্টিল আর বালডাইনকে দেখেছ? তবে তাদের কথা নিয়ে অত মাতামাতি কর কেন?'

"আজ্ঞা, আজ্ঞা, হার মানছি চাটুজ্জে মশায়।"

'আঙ্গুরাক্য মানতে হয়। আরে, প্রত্যক্ষ করা কি যার তার কম? শ্রীভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তদের বলেন— দিব্য দদানি তে চক্ষুঃ। সেই দিব্যদৃষ্টি পেলে তবে সব দেখতে পাওয়া যায়।'

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি দেখতে পেয়েছেন চাটুজ্জে মশায়?'

'জ্যাঠামি করিস নি। এই কলকাতা শহরে রাস্তায় যারা চলাকেরা করে— কেউ কেরানী, কেউ দোকানী, কেউ মজুর, কেউ আর কিছু—তোমরা ভাব সবাই বুবি মানুষ। তা মোটেই নয়। তাদের তেতর সর্বদাই দু-দশটা ভূত পাওয়া যায়। তবে চিনতে পারা দুষ্ট। এই রকম ভূতের পাল্লায় পড়েছিলেন মহেশ মিত্র।'

'কে তিনি?'

'জান না! আমাদের মজিলপুরের চৰণ ঘোষের মামার শালা। এককালে তিনি কিছুই মানতেন না, কিন্তু শেষ দশায় তাঁকেও দীকার করতে হয়েছিল।'

সকলে একবাক্যে বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুজ্জে মশায়!'

চাটুজ্জে মহাশয় হাতে তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। মহেশ মিত্র তখন শ্যামবাজারের শিবচন্দ্র কলেজে প্রফেসরি করতেন। অঙ্গের প্রফেসর, অসাধারণ বিদ্যে, কিন্তু প্রচও নাস্তিক। ভগবান আস্থা পরলোক কিছুই মানতেন না। এমন কি, শ্রী মারা গেলে আর বিবাহ পর্যন্ত করেন নি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ছিল না,

বলতেন—ওঝোর না খেলে হিনুর উন্নতির আশা নেই, ওটা বাদ দিয়ে কেনও জাত বড় হতে পারে নি। মহেশের চালচলনের জন্য আস্থীয়স্বজন তাঁকে একদলে নারোছিল। কিন্তু যতই অনাচার করুন তাঁর স্বত্ত্বাবটা ছিল অকপট, পারতপক্ষে মিথ্যা কথা কইতেন না। তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন হরিনাথ কুমু, তিনিও এই কলেজের প্রফেসর, ফিলসফি পড়াতেন। কিন্তু বন্ধু হ'লে কি হয়, দুজনে হরদম মাঝাড়া হ'ত, কারণ হরিনাথ আর কিছু মানুন না মানুন ভূত মানতেন। তাঙ্গাড়া মহেশবাবু অত্যন্ত গুরীর প্রকৃতির মানুষ, কেউ তাঁকে হাসতে দেখে নি, আর হরিনাথ ছিলেন আমুদে লোক, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে বন্ধুকে উদ্ব্যাপ্ত করতেন। অবু মোটের ওপর তাঁদের পরম্পরারে প্রতি খুব একটা টান ছিল।

তখন রাজনীতিচর্চার এত রেওয়াজ ছিল না, আর ভদ্রলোকের ছেলের অল্লিচ্ছাৎ এমন চমৎকারা হয় নি, দু-একটা পাস করতে পারলে যেমন— তেমন চার্কার্স জুটি যেত। লোকের তাই উচুদের বিষয়ে আলোচনা করবার সময় ছিল। ছোকরারা চিন্তা ক'রত—বউ ভালবাসে কি বাসে না। যাদের সে সন্দেহ মিটে গোছে, তারা মাথা ঘামাত—ভগবান আছেন কি নেই। একদিন কলেজে কাজ ছিল না, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে গল্প করছিলেন। গল্পের আরম্ভ যা নিয়েই হোক, মহেশ আর হরিনাথ কথটা টেনে নিয়ে ভূতে আর ভগবানে হাজির করতেন, কারণ এই নিয়ে তর্ক করাই তাঁদের অভ্যাস। এদিনও তাই হয়েছিল।

আলোচনা শুরু হয় বি-চাকরের মাইনে নিয়ে। কলেজের পণ্ডিত দীনবন্ধু বাচস্পতি মশায় দুঃখ করছিলেন—'ছোটলোকের সোভ এত বেড়ে গোছে যে আর পেরে ওঠা যায় না।' মহেশবাবু বলিলেন—'লোভ সকলেরই বেড়েছে, আর বাড়াই উচিত, নইলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হবে কিসে।' পণ্ডিত-মশায় উভর দিলেন—'লোভে পাপ, পাপে মৃত্য।' মহেশবাবু পাল্টা জরাব দিলেন—'লোভ ত্যাগ করলেও মৃত্যাকে ঢেকানো যায় না।'

তকটী তেমন জুতসই হচ্ছে না দেখে হরিনাথবাবু একটু উসকে দেবার জন্য বললেন—'আমাদের মতন লোকের লোভ হওয়া উচিত মৃত্যুর পর।' মাইনে তো পাই মোটে পৌনে দু-শ, তাতে ইহকালের কটা শথই বা মিটবে। তাই তো পরকালের আশায় ব'সে আছি, আস্থাটা যদি স্বর্গে গিয়ে একটু ফুর্তি করতে পারে।'

দীনবন্ধু পণ্ডিত বললেন—'কে বললে তুমি স্বর্গে যাবে? আর স্বর্গের তুমি জানই বা কি?'

'সমস্তই জানি পণ্ডিত মশায়। খাসা জায়গা, না গরম না ঠাণ্ডা। মন্দাকিনী কুলকুলু বইছে, তার ধারে ধারে পারিজাতের বোপ। সবুজ মাট্টের মধ্যখালে কল্পতরু গাছে আঙুর বেদানা আম রসগোল্লা কাটলেট সব রকম ফলে আছে, ছেঁড় আর খাও। জন-কতক ছোকরা-দেবদৃষ্ট গোলাপী উডুনি গায়ে দিয়ে সুধার বোতল সাজিয়ে ব'সে রায়েছে, চাইলেই ফটোফট খুলে দেবে। এই হোথা কুঞ্জবনে বাঁকে বাঁকে অঙ্গরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, দুদণ্ড রসালাপ কর, কেউ কিছু দলবে না।'

যত খুশি নাচ দেখ, গান শোন। আর কালোয়াতি চাও তো নারদ মুনির আস্তমান
যাও।'

মহেশবাবু বললেন—'সমস্ত গাজা। পরলোকে আজ্ঞা ভূত ভগবান কিছুই
নেই। ক্ষমতা থাকে প্রমাণ কর।'

তর্ক জামে উঠল। প্রফেসররা কেউ এক পক্ষে কেউ অপর পক্ষে দাঁড়ালেন।
পণ্ডিত মশায় দারুণ অবঙ্গিয় ঢোটি উলটে ব'সে রইলেন। বৃক্ষ প্রিসিপাল যদু
সাঁওল রুফা ক'রে বললেন—'ভূতের তেমন দরকার দেখি না, কিন্তু আজ্ঞা আর
ভগবান ব্যাদ দিলে চালে না।' মহেশ মিত্র বললেন—'কেউ-ই নেই, আমি দশ
মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিছি।' হরিনাথ কৃষ্ণ মহা উৎসাহে বক্সুর পিঠ চাপড়ে
বললেন—'লেগে যাও।'

তারপর মহেশবাবু ফুলকাপ কাগজ আর পেনসিল নিয়ে একটি বিরাট অঙ্ক
করতে লেগে গেলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা আর ভূত—এই তিনি রাশি নিয়ে অতি জটিল
অঙ্ক, তার গতি বোঝে কার সাধ্য। বিস্তর ঘোগ বিয়োগ ও গুণ ভাগ ক'রে হাতির
শুল্ডের মতন বড় বড় চিহ্ন টেনে অবশেষে সমাধান করলেন—ঈশ্বর = ০, আজ্ঞা
= ভূত = ০

বাচস্পতি বললেন—'বক্ষ উন্মাদ।'

মহেশবাবু বললেন—'উন্মাদ বললেই হয় না। এ হ'ল গিয়ে দস্তুরমত
ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলস। সাধ্য থাকে তো আমার অঙ্গের ভূল বার করুন।'

হরিনাথ বললেন—'অঙ্ক-টক্স আমার আসে না। বাচস্পতি মশায় যদি ভগবান
দেখাবার ভাব নেন তো আমি মহেশকে ভূত দেখাতে পারি।'

বাচস্পতি বললেন—'আমার ব'য়ে গেছে।'

মহেশবাবু বললেন—'বেশ তো, হরিনাথ তুমি ভূতই দেখাও না। একটার
প্রমাণ পেলে আর সমস্তই মেনে নিতে রাজী আছি।'

হরিনাথবাবু বললেন—'এই কথা ? আজ্ঞা, আসছে হগ্ন শিবচতুর্দশী
পড়ছে। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে রাত বারটায় মানিকতলায় নতুন খালের ধারে
চল, পষ্টাপষ্টি ভূত দেখিয়ে দেব। কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে তো আমাকে দুষ্টে
পারবে না।'

'যদি দেখাতে না পার ?'

'আমার নাক কেটে দিও। আর যদি দেখাতে পারি তো তোমার নাক
কাটব।'

প্রিসিপাল যদু সাঁওল বললেন—'কাটাকাটির দরকার কি, সত্যের নির্ণয়
হলেই হ'ল।'

শিবচতুর্দশীর রাতে মহেশ মিত্র আর হরিনাথ কৃষ্ণ মানিকতলায় গেলেন।
জায়গাটা তখন বড়ই ভীমণ ছিল, ঝাস্তায় আলো নেই, দু-ধারে বাবলা গাছে
আরও অক্ষকার করেছে। সমস্ত নিষ্ঠক, কেবল মাঝে মাঝে প্যাচার ডাক শোনা

শাহে। হোচ্চট খেতে খেতে দুজনে নতুন খালের ধারে পৌছলেন। বছর-দুই
শাখা শুধানে প্রেগের হাসপাতাল ছিল, এখনও তার গোটাকতক খুঁটি দাঢ়িয়ে
আছে।

মহেশ মিত্র অবিশ্বাসী সাহসী লোক, কিন্তু তাঁরও গা ছবছব করতে লাগল।
হরিনাথ সারা রাত্তা কেবল ভূতের কথাই করেছেন—তারা দেখতে কেমন মেজাজ
কেমন, কি খায়, কি পরে। দেবতারা হচ্ছেন উদারপ্রকৃতি দিলদারিয়া, কেউ
কানেক না মানলেও বড়-একটা কেঁচার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে
গাঁটো ব'লে তাঁদের আবসম্যানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধ'রে তাঁদের
আপা মর্যাদা আদায় করেন। এই সব কথা।

হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ শোনা গেল, যেন কোনও অশ্বরীর বেড়াল তার
গলাতকা প্রণয়নীকে আকুল আহরণ করছে। একটু পরেই মহেশবাবু রোমাঞ্চিত
হয়ে দেখলেন, একটা জম্বা রোগা কুচকুচে কালো মূর্তি দু-হাত তুলে সামনে
দাঢ়িয়ে আছে। তার পিছনে একটু দূরে ঐ রকম আরও দুটো।

হরিনাথবাবু খরখর ক'রে কাপতে কাপতে বললেন—'রাম রাম সীতারাম !' ও
মহেশ, দেখছ কি, তুমও বল না !'

আর একটু হলৈই মহেশবাবু রামনাম উচ্চারণ ক'রে ফেলতেন, কিন্তু তাঁর
কনশেস বাধা দিয়ে বললে—'উহ, একটু সবুর কর, যদি ঘাড় মটকাবার লক্ষণ
দেখ তখন না—হয় রামনাম ক'রো।'

ঝুঁটা একটা পাকুড় গাছের নীচে ছিলেন। হঠাৎ ওপর থেকে খালিকটা কাঁদা-
গোলা জল মহেশের মাথায় এসে পড়ল।

তখন সামনের সেই কালো মূর্তিটা নাকী সুরে বললে—'মহেশবাবু, আপনি
নাকি ভূত মানেন না ?'

এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই ব'লে থাকেন—'আজে হাঁ, মানি বই কী।
কিন্তু মহেশ মিত্র বেয়াড়া লোক, হঠাৎ তাঁর কেমন একটা খেয়াল হ'ল, ধী
ক'রে এগিয়ে গিয়ে ভূতের কাথ থামচে ধ'রে জিজেস করলেন—'কেন ক্লাস ?'

ভূত থতমত থেয়ে জরাব দিলে—'সেকেও ইয়ার স্যার !'
'রোল নম্বর কত ?'

ভূত করুণ নয়নে হরিনাথের দিকে চেয়ে জিজেস করলে, 'বলি স্যার ?'
হরিনাথের ঘুথে রাম রাম ডিল্লি কথা নেই। পিছনের দুই ভূত অনুশ্য হয়ে
গেল। পাকুড় গাছে যে ছিল সে টুপ ক'রে নেমে এসে পালিয়ে গেল। তখন
বেগতিক দেখে সামনের ভূতটি বাকুনি দিয়ে মহেশের হাত ছাড়িয়ে চোচা দোড়
মারলে।

মহেশ মিত্র হরিনাথের পিঠে একটা প্রচণ্ড কিল মেরে বললেন—
'জোচোর !'

হরিনাথও পালটা কিল মেরে বললেন—'আহাম্বক !'
নিজের নিজের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে দুই বক্সু বাড়ি-মুখে হলেন।

আমল ভূত যারা আশেপাশে লুকিয়ে ছিল তারা মনে বললে—আজি
রজনীতে হয় নি সময়।

প্রদিন কলেজে হলসুল বেধে গেল। সমস্ত ব্যাপার শব্দে প্রিনসিপাল ভয়বের
রাগ ক'রে বললেন—‘অত্যন্ত শেমফুল কাও। দুজন নামজাদা অধ্যাপক একটা
ভূজ বিষয় নিয়ে হাতাহাতি! হরিনাথ তোমার লজ্জা নেই?’

হরিনাথবাবু ঘাড় চুলকে বললেন—‘আজে আমার উদ্দেশ্যটা ভালই ছিল।
মহেশকে রিফর্ম করবার জন্য যদি একটু ইয়ে ক'রেই থাকি তাতে দোষটা
কি—হাজার হোক আমার বন্ধু তো?’

মহেশবাবু গর্জন ক'রে বললেন,—‘কে তোমার বন্ধু?’

প্রিনসিপাল বললেন—‘মহেশ, তুমি চুপ কর। উদ্দেশ্য যাই হোক, কলেজের
হেলেদের এর ভেতর জড়ানো একেবারে অমাজনীয় অপরাধ। হরিনাথ তুমি বাড়ি
যাও, তোমায় সাসপেন্ড করলুম। আর মহেশ, তোমাকেও সাবধান ক'রে দিছি—
আমার কলেজে আর ভাতুড়ে তর্ক তুলতে পারবে না।’

মহেশবাবু উন্নত দিলেন—‘সে প্রতিশ্রূতি দেওয়া শক্ত। সকল রকম কুসংস্কার
দূর করাই আমার জীবনের ব্রহ্ম।’

‘তবে তোমাকেও সাসপেন্ড করলুম।’

অন্যান্য অধ্যাপকরা চুপ ক'রে সমস্ত শনছিলেন। তারা প্রিনসিপালের হৃদয়
শব্দে কোনও প্রতিবাদ করলেন না, কারণ সকলই জানতেন যে তাদের কর্তব্য
রাগ বেশী দিন থাকে না।

মহেশবাবু তার বাসায় ফিরে এলেন। হরিনাথের ওপর থচও রাগ— হতভাগ।
একটা গভীর তন্ত্রের মীমাংসা করতে চায় জুরোচুরি দ্বারা! সে আবার ফিলসফি
গড়ায়! এমন অপ্রত্যাশিত আঘাত মহেশবাবু কখনও পান নি।

মানুষের মন যখন নিদারূল ধাক্কা খায় তখন সে তার ভাব ব্যক্ত করবার
জন্য উপায় খোজে। কেউ ক'রে, কেউ তর্জন-গর্জন করে, কেউ কবিতা লেখে।
একটা ভূজ কোচ-বকের হত্যাকাও দেখে মহৱি বাল্যাকিরি মনে যে ঘা লেগেছিল,
তাই প্রকাশ করবার জন্য তিনি হঠাতে দু-ছত্র শ্বেত রচনা ক'রে ফেলেন—মা
নিষাধ প্রতিষ্ঠাং ভূম ইত্যাদি। তারপর সাতকাও রামায়ণ লিখে তার ভাবের বোঝা
নায়াতে পেরেছিলেন। আমাদের মহেশ মিস্টির চিরকাল নীরস অঙ্গশাস্ত্রের চৰ্চা
ক'রে এসেছেন, কাব্যের কিছুই জানতেন না। কিন্তু আজ তারও মনে সহসা
একটা কবিতার অঙ্গু গজগজ করতে লাগল। তিনি আর বেগ সামলাতে পারলেন
না, কলেজের পোশাক না ছেড়ে দেড় একখানা আলজেরো খুলে তার প্রথম
পাতায় লিখলেন—

হরিনাথ কুঠ,

খাই তার মুঁঁ।

কবিতাটি লিখে বাব বাব ডাইন বাঁয়ে ঘাড় বেকিয়ে দেবে আদিকবি

বাল্যাকিরি যতন ভাবলেন, হাঁ, উন্নত হয়েছে।

কিন্তু একটা খটকা লাগল। কুঠুর সঙ্গে মুগুর মিল আবহান কাল থেকে
চালে আসছে, এতে মহেশের কৃতিত্ব কোথায়? কালিদাসই হোন আর রবীন্দ্রনাথই
হোন, কুঠুর সঙ্গে মুগু মেলাতেই হবে—এ হ'ল প্রকৃতির অলঞ্চনীয় নিয়ম। মহেশ
কাটু তেবে ফের লিখলেন—

কুঠু হরিনাথ

মুগু করি পাত।

হাঁ, এইবাবে মৌলিক রচনা বলা যেতে পারে। মহেশের মনটা একটু শাস্তি
হল। কিন্তু কাব্যসমৰ্থতা যদি একবাব কাঁধে ভর করেন তবে সহজে নামতে চান
না। মহেশবাবু লিখতে লাগলেন—

হরিনাথ শুরে,

হবি তুই ম'রে

নৱকের পোকা

অতিশয় বোকা।

উহ, নৱকই নেই তার আবার পোকা। মহেশবাবু হিঁর করলেন—কাব্যে
বুসক্তার নাম দিয়ে তিনি শীঘ্ৰই একটা প্রবন্ধ রচনা করবেন, তাতে মাইকেল
রবীন্দ্রনাথ কাকেও রেহাই দেবেন না। তারপর তার কবিতার শেষের ঢার লাইম
কেটে দিয়ে ফের লিখলেন—

ওবে হরিনাথ

তোরে করি পাত,

পিঠে মারি চড়—

এখন চৰায় নহেরের চাকরটা এসে বললে—‘বাবু, চা হবে কি দিয়ে? দুধ
তো ছিড়ে গেছে।’ মহেশবাবু অন্যমন্ত্র হয়ে বললেন—‘সেলাই ক'রে নে।’

পিঠে মারি চড়—

ঝুঁকে গঁজি খড়।

জুলে দেশলাই

আওন লাগাই।

কিন্তু আবার এক আপত্তি। হরিনাথকে পুড়িয়ে ফেললে জগতের কোলও লাভ
হবে না, অনর্থক খালিকটা জান্তুর পদার্থ বরবাদ হবে। বৰং তার চাইতে—

হরিনাথ শুরে,

পোড়াব না তোরে।

নিয়ে যাব ধাপা

দেব মাটি-চাপা।

সার হয়ে যাবি,

ঢ্যাক্স ফলাবি।

মাহেশবাবু আরও অনেক লাইম রচনা করেছিলেন, তা আমার মনে নেই।

কবিতা লিখে খানিকটা উজ্জ্বল বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁর হন্দয়টা বেশ হলকা হ'ল, তিনি কাপড়চোপড় ছেড়ে ইঞ্জিচেয়ারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তিনি দিন যেতে না যেতে প্রিনসিপাল মহেশ আর হরিনাথকে ডেবে পাঠালেন। তাঁরা আবার নিজের নিজের কাজে বহাল হলেন, কিন্তু তাঁদের বন্ধুর ভেঙে গেল। সহকর্মীরা মিলনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। হরিনাথ বরং একটা সফির আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু মহেশ একদানে পাথরের মতন শক্ত হয়ে রইলেন। কিছুদিন পরে মহেশবাবুর খেয়াল হ'ল— প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে একতরফা বিচার করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়, এর অনুকূল প্রমাণ কে কি দিয়েছেন তাও জানা উচিত। তিনি দেশী বি঳িতী বিজ্ঞ বই সংগ্রহ করে পড়তে লাগলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অবিষ্কার আরও প্রবল হ'ল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছুই নেই, কেবল আছে—অমুক ব্যক্তি কি বলেছেন আর কি দেখেছেন। বাধের অভিত্বে মহেশের সন্দেহ নেই, কারণ জন্মের বাগানে গেছেই বাস দেখা যায়। তৃতীয় যদি থাকেই তবে খাঁচায় পুরে দেখা না বাপু। তা নয়, শুধু ধাপপাবাজি। প্রেততত্ত্ব চর্চা করে মহেশবাবু বেজায় চ'টে উঠলেন। শেষটায় এমন হ'ল যে তৃতীয়ের শুষ্টিকে গালাগাল না দিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না।

প'ড়ে প'ড়ে মহেশের মাথা গরম হয়ে উঠল। রাতে ঘুম হয় না, কেবল স্বপ্ন দেখেন ভৃতে তাঁকে ভেংচাছে। এমন স্বপ্ন দেখেন ব'লে নিজের ওপরেও তাঁর রাগ হ'তে লাগল। ডাঙুর বললে—পড়াশুনা বন্ধ করুন, বিশেষ ক'রে ঐ ভৃতড়ে বইগুলো—যা মানেন না তার চর্চা করেন কেল। কিন্তু ঐ সব বই পড়া মহেশের এখন একটা নেশা হয়ে দাঢ়িয়েছে। পড়লেই রাগ হয়, আর সেই রাগেতেই তাঁর সুখ।

অবশেষে মহেশ মিজির কঠিন রোগে শয্যাশয়ী হয়ে পড়লেন। দিন দিন শরীর কয়ে যেতে লাগল, কিন্তু রোগটা নির্ণয় হ'ল না। সহকর্মীরা প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। হরিনাথও একদিন এসেছিলেন, কিন্তু মহেশ তাঁর মুখদর্শন করলেন না।

সাত-আট মাস কেটে গেল। শীতকাল, ব্রাত দশটা। হরিনাথবাবু শোবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মহেশের চাকর এসে খবর দিলে যে তার বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, অবস্থা বড় খারাপ। হরিনাথ তখনই হাতিবাগানে মহেশের বাসায় ছুটলেন।

মহেশের আর দেরি নেই, মৃত্যুর কয়ও নেই। বললেন—‘হরিনাথ’ তোমায় কমা করলুম। কিন্তু ভেবো না যে আমার মত কিছুমাত্র বদলেছে। এই রইল আমার উইল, তোমাকেই অছি নিযুক্ত করেছি। আমার পৈতৃক দশ হাজার টাকার কাগজ ইউনিভার্সিটিকে দান করেছি, তার সুন্দ থেকে প্রতি বৎসর একটা পুরস্কার দেওয়া হবে। যে হাতা ভৃতের অনস্তিত সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লিখবে সে ঐ পুরস্কার

নামে। আর দেখ—খবরদার, শ্রাদ্ধ-ট্রান্স—ক'রো না। ফুলের মালা চন্দন-কাঠ খি এসব দিও না, একদম বাজে খরচ। তবে ইঁ, দু-চার বোতল কেরোসিন ঢালতে নাম। দেড় সের গুঁক আর পাঁচ সের সোয়া আমনো আছে, তাও দিতে পার, টেপট কাজ শেষ হয়ে যাবে। আজ্ঞা, চললুম তা হ'লে।’

বাত প্রায় সাতে এগারটা। মহেশের আঘাতুরজন কেউ কলকাতায় নেই, যাকেন্দ্র বোধ হয় তারা আসত না। বড়দিনের বন্ধ, কলেজের সহকর্মীরা প্রায় সকালেই অল্প গেছেন। হরিনাথ মহা বিপদে পড়লেন। মহেশবাবুর চাকরকে বললেন পাড়ার জনকতক লোক ডেন আনতে।

অনেকক্ষণ পর দুজন মাতব্বর প্রতিবেশী এলেন। ঘরে চুকলেন না, দরজার সামনে দাঢ়িয়ে বললেন—‘চুপ ক'রে ব'সে আছেন যে বড় ? সংক্ষেপে ব্যবস্থা কি করলেন ?’

হরিনাথ বললেন—‘আমি একলা যানুষ, আপনাদের ওপরেই ভরসা।’

‘ওই বেলেঝি হতভাগার লাস আমরা বইব ? ইয়ারকি পেয়েছেন নাকি।’ এই কথা ব'লেই তাঁরা স'রে পড়লেন।

হরিনাথের তখন মনে প'ড়ল, বড় বাস্তার মোড়ে একটা মাটকোঠা সাইনবোর্ড দেখেছেন—বৈতরণী সমিতি, ভদ্ৰমহোদয়গদের দিবাৱাৰ সত্ত্বার স্বত্কার। চাকরকে বসিয়ে রেখে তখনই সেই সমিতিৰ বোজে গেলেন।

অনেক চেষ্টার সমিতি থেকে তিনি জন লোক যোগাড় হ'ল। পনের টাকা সারিশুমিক, আর শীতের ওপুধ বাবদ ন-সিকে। সমস্ত আয়োজন শেষ হ'লে হরিনাথ আর তাঁর সঙ্গীরা খাট কাঁধে নিয়ে বাত আড়াইটাৰ সময় নিয়মতন্ত্রে রওনা হলেন।

আমাবস্যার রাত্রি, তার ওপর আবার কুয়াশা। হরিনাথের দল কর্ণওয়ালিস স্টুট দিয়ে চললেন। গ্যাসের আলো মিটমিট করছে, পথে জনশ্বানৰ নেই। কাঁধের বোবা ক্রমেই ভারী বোধ হ'তে লাগল, হরিনাথ হাপিয়ে পড়লেন।

বৈতরণী সমিতিৰ সর্দাৰ ত্রিচোলন পাকড়াশী বুকিয়ে দিলেন—এমন হয়েই থাকে, যানুষ ম'রে গেলে তার গুপৰ জননী বসুন্ধৰার টাল বাড়ে।

হরিনাথ একলা নয়, তাঁর সঙ্গীরা সকলেই সেই শীতে গলদুর্ঘৰ্ম হয়ে উঠল। খাট নামিয়ে বানিক জিয়িয়ে আবার যাত্রা।

কিন্তু মহেশ মিতিৱের ভার ক্রমশই বাঢ়ছে, পা আর এগোয় না। পাকড়াশী বললেন—‘চেৱ বয়েছি মশায়, কিন্তু এমন জগদ্দল মড়া কখনও কাঁধে করিন নি। দেহটা তো শুকনো, লোহা খেতেন বুঁধি ? পনের টাকায় হবে না মশায়, আরও পাঁচ টাকা চাই।’

হরিনাথ তাতেই গাজী, কিন্তু সকলে এমন কাবু হয়ে পড়েছে যে দু-পা গিয়ে আবার খাট নামাতে হ'ল। হরিনাথ ফুটপাথে এলিয়ে পড়লেন, বৈতরণী তিনি জন

হাপাতে হাপাতে তামাক টানতে লাগল।

ওঠবার উপক্রম করছেন এমন সময় হরিনাথের নজরে পড়ল—কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা আবছারা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে দেখলেন—কালো রায়াপার মুড়ি দেওয়া একটা লোক। লোকটি বললে—‘এ আপনারা হাপিয়ে পড়েছেন দেখছি। বলেন তো আমি কাঁধ দিই।’

হরিনাথ অদ্বিতীয়ে খাটিরে দু-একবার আপন্তি জানালেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠটার রাতী হলেন। লোকটি কোনু জাত তা আর জিজ্ঞাসা করলেন না, কারণ মহেশ মিনে ও-বিষয় চিরকাল সমদর্শী—এখন তো কথাই নেই। তা ছাড়া যে লোক উপর্যাচক হয়ে শৃঙ্খালাজ্ঞার সঙ্গী হয় সে তো বাস্তব বটেই।

ত্রিলোচন পাকড়াশী বললেন,—‘কাঁধ দিতে চাও দাও, কিন্তু বখরা পাবে না, তা বলে রাখছি।’ www.banglabookpdf.blogspot.com
আগস্তুক বললে—‘বখরা চাই না।’

এবার হরিনাথকে কাঁধ দিতে হ'ল না। তার জ্যোতির্য নতুন লোকটি দাঢ়াল। আগের চেয়ে যাত্রাটা একটু দ্রুত হ'ল কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আর পা চলে না, ফের খাট নামিয়ে বিশ্রাম।

পাকড়াশী বললেন—‘কুঁড়ি টাকার কাজ নয় বাবু, এ হ'ল মোষের গাড়ির বোকা। আরও পাঁচ টাকা লাগবে।’

এমন সময় আরেকজন পথিক এসে উপস্থিত—ঠিক প্রথম লোকটির মতন কালো রায়াপার গায়ে। এও খাট বইতে প্রস্তুত। হরিনাথ ফিরস্তি না ক'রে তার সাহায্য নিলেন। এবার পাকড়াশী মশায় রেহাই পেলেন।

খাট চলেছে আর একটু জোরে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার ঝুঁতি। মহেশের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে, তার দেহে কিছু চেকেনি তো? খাট নামিয়ে আবার সবাই দম নিতে লাগল।

কে বলে শহুরে লোক স্বার্থপুর? আবার একজন সহায় এসে হাজির, সেই কালো রায়াপার গায়ে। হরিনাথের ভাববার অবসর নেই, বললেন, ‘চল, চল।’

আবার যাত্রা আরও একটু জোরে, তারপর ফের খাট নামাতে হ'ল। এই যে, চতুর্থ বাহক এসে হাজির, সেই কালো রায়াপার। এতা কি মহেশকে বইবার জন্ম এই তিন প্রহর রাতে পথে বেরিয়েছে? হরিনাথের আশ্চর্য হবার শক্তি নেই। বললেন, ‘ওঠাও খাট, চল জলন্দি।’

চারজন অচেনা বাহকের কাঁধে মহেশের খাট চলেছে, পিছনে হরিনাথ আর বৈতরণী সমিতির তিনজন। এইবার গতি বাঢ়ছে, খাট হল হল করে চলছে। হরিনাথের আর তাঁর সঙ্গীদের ছুটতে হ'ল।

‘আরে অত তাড়াতাড়ি কেন একটু আস্তে চল।’ কেই বা কখন শোনে! ছুট—ছুট। ‘আরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। বীড়ন স্ট্রীট ছাড়িয়ে গেলে যে! লোকগুলো কি শুনতে পায় না? ওরে পাকড়াশী, খামাও না ওদের।’ কোথায় পাকড়াশী?

মহেশের খাট তখন তীর বেগে ছুটছে, ‘হরিনাথ পাগলের মতন পিছু পিছু দাঢ়িয়েছেন। কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, গোলদিঘি বউবাজারের মোড়—সব পার হয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সামনের সমস্ত পথ ফুটে উঠেছে—এ পথের কি শেষ নাই? ব্রাত্তা কি ওপরে উঠেছে না নিচে নেমেছে? এ কি আলো না অঙ্ককার? মূরে ও কি দেখা যাচ্ছে—সমন্দের ঢেউ, না ঢোখের ভুল?

হরিনাথ ছুটতে ছুটতে নিরস্তর চীৎকার করছেন—‘হাম, হাম।’ ও কি খাটের উপর উঠে বসেছে কে? মহেশ? মহেশই তো! কি ভয়ানক! দাঢ়িয়েছে, ছুটন্ত খাটের ওপর বাড়া হয়ে দাঢ়িয়েছে। পিছনে কিরে লেকচারের ভঙ্গীতে হাতনেড়ে নি বলছে?

দূর-দূরান্ত থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—‘হরিনাথ—ও হরিনাথ—ওহে হরিনাথ—’

‘কি, কি? এই যে আমি।’

‘ও হরিনাথ, আছে আছে সব আছে, সব সত্তি।—’

মহেশের খাট অগোচর হয়ে গেল, তখনও তাঁর শ্বীণ কষ্টস্বর শোনা যাচ্ছে—‘আছে, আছে—’

হরিনাথ মৃহিত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে শুয়েলেস্লি স্ট্রীটের পুলিশ হাকে দেখতে পেয়ে মাতাল বলে চালান দিলে। তাঁর স্ত্রী খবর পেয়ে বছ কঠে তাকে উদ্ধার করেন। www.banglabookpdf.blogspot.com

বংশলোচনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—‘গয়ায় পিতৃ দেওয়া হয়েছিল কি?’

‘ওবু গয়ায়! পিতিদাদনখাতে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নি, পিতৃ ছিটকে কিরে এল।

‘তার মানে?’

‘মানে, মহেশ পিতৃ নিলে না, কিংবা তাকে নিতে দিলে না।’

‘আশ্চর্য! মহেশ মিত্রের টাকাটা?’

‘সেটা ইউনিভার্সিটিতে গচ্ছিত আছে। কিন্তু কাজে কিছুই হয় নি, ভূতের বিপক্ষে প্রবন্ধ লিখতে কোন ছাত্রের সাহস নেই। এখন সেই টাকা সুদে-আসলে প্রায় পঁচিশ হাজার হয়েছে। একবার সেনেটে প্রস্তাব ওঠে, সেই টাকাটা প্রত্নবিভাগের জন্য খরচ হোক। কিন্তু ছাদের ওপর এমন দুপদাপ শব্দ শুরু হ'ল যে সক্রান্তি ভয়ে পালালেন। সেই থেকে মহেশ ফান্ডের নাম কেউ করে না।’

ডাইনী

তারাশক্তির বন্দেত্যাপাখ্যায়

আমাদের একালে ডাইনী নাই। ডাইনী নাই, মায়াবিনী নাই।
সে হিসাবে একালের ছেলেরা ভাগ্যবান।

আমাদের আগলে, মানে চলিশ-গঁথতাণ্ট্রিশ বৎসর আগে ডাইনী, ডাকিনী
মায়াবিনী। একালের ছেলেরা ডাইনী-ডাকিনীর কথা তনে হেসে উঠবে। কিন্তু সে
আগলে আমাদের অস্তরাত্মা শকিয়ে যেত এদের নামে।

আমাদের ধারে আমাদেরই বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড়
তালগাছে ঘেরা। তাদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর।

একেবারে ঘাসের থাত। একপাশে জেলেপাড়া, অন্যপাশে
বাউরীপাড়া—মাঝখানে খালিকটা খালি জায়গা। সেই খালি জায়গায় একটা
অধিথ গাছ। সেই গাছতলায় ছোট একখানি ঘর। তারপর, অর্ধাং স্বর্ণের বাড়ির
পর পূর্বদিকে আর বসতি নাই, প্রান্তর চলে গিয়েছে। বালি আর কালচে মাটির
থাতর। সেই প্রান্তরের মধ্যে লালুকচাঁদা নামে পুরুটা ছিল আমের শাশান।
এখানে অবশ্য শব্দাহ করা হ'ত না, মুখাগ্নি করা হ'ত। চারিদিকে পড়ে
থাকত—মড়ার বিছানা, মাদুর, বালিশ, ন্যাকড়া, বাঁশ, মাটির সরা, ভাঁড়,
আধপোড়া কুঁচি-কাঁচি। পুরুটার ওপারে একটা ঝাকড়া বটগাছ। দিনের
বেলাতেও কেউ সে গাছতলায় যেত না। রাত্রে সেটা জয়েট অঙ্ককারের মত
থমাপথ করত।

স্বর্ণ নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে তাকিয়ে থাকত সেই বটগাছটার দিকে।
আমরা তাই ভাবতাম।

নইলে—প্রান্তরটা যেখানে শেষ হয়েছে—সেইখানেই তরা হয়েছে থানের
ক্ষেত। সবুজ শস্যক্ষেত্র। কিন্তু ডাইনী কি সবুজ ভালবাসে? না বালতে পারে।
স্বর্ণ ডাইনী। আমাদের দেশের ভাষায় 'সনা ভান'।

তকনো কাঁচির মতো চেহারা। শক্ত দু-পাটি দাঁত, কিন্তু নরমনে-চেরা চোখের
মত ছোট। তাতে খয়েরী রঙ-এর তারা। বিচিত্র হিন দৃষ্টি। ভাবলেশহীন
শক—যেন খটখট করত দুটো হলদে চোখ এই পাথর শুকনো ভাঙ্গার বুকে।
ডাইনীর দৃষ্টি।

এক দৃষ্টিতে ডাইনীরা কঢ়ি নধর দেহের, সুন্দর সুশ্রী মানুষের তরুণী নববধূর
দেহের অস্তি চর্ম ঘেদ মাঝস ভেদ করে—ভিতরে প্রবেশ করে থুজত প্রাণ-পুতুলী।

তাকে পেলে চুয়ে চুয়ে তারা ঘেয়ে ফেলে। নধর মানুষ শকিয়ে অস্তি চর্মসার হয়ে
যায়, সোনার মত দেহের বর্ণ কালো হয়ে যায়। তরুণী নববধূর সব লাবণ্য ঝড়ে
গাতে। শুধু মানুষ কেন, কঢ়ি পাতায় ভরা লকলকে সতেজ গাছ অকস্মাত শকিয়ে
যায়। ডাইনীরা তারও সরস প্রাণটুকু দৃষ্টিযোগে পান করে নেয় নিঃশেষে।

তন্ম হীনের হিপুহরে তালগাছের মাঝায় চিল চ্যাচায়—চি-ই-ই-লো। চি-
ই-লো, চি-ই-লো!

কান পেতে উললে শুনতে পাওয়া যায়—ঘরের দাওয়ায় বসে ডাইনী তার
সুরে সুর মিলিয়ে সঙ্গীত গাইছে—অনুনাসিক মিহি সুরে গাইছে—চি-ই-ই-ই-হু!
চি-ই-ই-ই-হু!

রাত্রে—গভীর রাত্রে স্বর্ণ ডাইনীর ঘরের দেওয়ালে কান পাতলে শোনা
যায়—শব্দ উঠছে—হট-পাট, হট-পাট, হট-পাট।

বাট বইছে স্বর্ণ। যারা ডাইনী তারা ভগবানের অভিসম্পাতে রাত্রে মাটির
উপর বুকে হেঁটে বেড়ায়। বাট বয়।

তয় হয় না এর পর?

স্বর্ণ তরিতরকারি বেচে বেড়াত। এই ছিল তার জীবিকা। তিন-চার ক্রেশ
দূরের হাট থেকে কিনে আনত, বেচত আশেপাশের গ্রামে। পান, কাঁচকলা, পাকা
বড়া, শাক, কুমড়ো এই সবই আমাদের আমে সে বেচত না। আশেপাশের গ্রামেই
বেচত। গ্রামের কারও বাড়িতে চুকতে সে চাইত না। কি জানি—কান অনিষ্ট সে
করে বসবে। তার ভিতর যে লোভটা আছে, সে যখন লকলক করে জিভ বার
করবে তখন তো স্বর্ণের বারণ শুনবে না। কিন্তু স্বর্ণ যে লজ্জায় মরে যাবে। হি-হি-
হি। ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়। সেই তো ওর জীবনের মালিক,
তারই হৃকুম ছাড়া ওর মরবারাও অধিকার নেই। তার ভিতরের যে ডাইনীটা—সে এক সিদ্ধাবিদ্যা, তাকে কোন নতুন মানুষকে না
দেওয়া পর্যন্ত স্বর্ণ মরবে না।

স্বর্ণের মাসী কি কে যেন ছিল ডাইনী!

মৃত্যুকালে আঞ্চীয়-সজনদের খবর পাঠিয়েছিল কিন্তু কেউ যাইনি। ভয়ে
যাইনি, যদি সে কোন কৌশলে তাকে দিয়ে যায় ঐ সর্বনাশ ভয়কর বিদ্যা!— সে
যে ডাইনী হয়ে যাবে!

মৃত্যুর পর স্বর্ণ গেল। বিদ্যা সে তো কাউকে দিয়ে
দিয়েছে। নইলে মরণ হল কেমন করে। গিয়ে দেখলে—তখন মাসীর অনেক
আঞ্চীয় যা ছিল ভাগ করে নিয়েছে। সকলে চলে গেল। বিধৱা
তরুণী স্বর্ণ বসে রাইলো দাওয়ার উপর। তার যেমন অদৃষ্ট। হঠাৎ ম্যাত ম্যাত শব্দ
করে মাসীর পোষা বিড়ালটি তার পা ঘেঁষে বসল। ওটাকে কেউ নিয়ে যাইনি।
বিড়ালটা তার পায়ে পা ঘসলে, গরগর শব্দ করলে। সেজাটা উচু করে তার
নাকে-মুখে ঠেকিয়ে দিলে। যেন বললে—আমাকে তুমি নিয়ে চল। তুমি কিছুই
পাওনি। আমাকেও কেউ নেয়নি।

বর্ণের মায়া হল। নিয়ে এল বেড়ালটা। মাছ ভাত-দুধ বাওয়ায়, কোলের কাছে নিয়ে শোয়। পাশের জেলেপাড়ায় যায়, বাটীর পাড়ায় যায়।

সেদিন হইচই উঠল জেলেপাড়া।

জেলেদের একটা কচি ছেলের কি হয়েছে—ধনুকের মতো বেংকে যাচ্ছে, আর কাঁদছে—কাঁদছে—যেন বেড়ালের মত আওয়াজ করে। এঁয়া-ও। অবিকল বেড়ালের শব্দ।

গুণীন এল। গুণীন দেখে বললে—ডাইনীর কাজ। কিন্তু—
—কিন্তু কি?

—ডাইনটা মনে হচ্ছে—

বলতে হ'ল না শেষটা—বর্ণের বেড়ালটা ছুটে এল উঠোনে, রোয়া ফুলিয়ে সেজ ফুলিয়ে—এঁয়া-ও শব্দ করে থাবা পেতে বসল।

—এই। এই তো বেড়ালটা, এইটাই ডাইন।

—বেড়াল ডাইন?

—হ্যাঁ। কোন ডাইন মরবার সময় ওকে দিয়ে গেছে ডাইনীবিদ্যে।

—ঠিক কথা। বর্ণের মাসী ছিল ডাইনী। বেড়াল তো তারই। কি সর্বনাশ!

একটা জোয়ান জেলের ছেলে দুরস্ত ক্রোধে বসিয়ে দিলে এক লাঠি তার মাথার উপর। মাথাটা প্রায় চুর হয়ে গেল। কিন্তু তবু মরল না; সেজ পাছড়াতে লাগল। নখগুলো বের করে মাটির উপর আঁচড়াতে লাগল।

গুণীন বলল—সাবধান। কেউ কাছে যাবে না। ও এখন ডাইন-মন্ত্রটি দেবার চেষ্টা করবে। নইলে ওর মৃত্যু হবে না।

সে মন্ত্র পড়লে, নিজের অঙ্গবন্ধন করলে—তারপর সন্তর্পণে লেজে ধরে বের করে ফেলে দিয়ে এল গ্রামের প্রান্তে।

স্বর্ণ ঘরে বসে সভয়ে কেঁপে উঠল।

গোকে তাকে গাল দিয়ে গেল। কেন এনেছিল ও এই পাগকে।

সকের মুখে ক'টি ছেলে পথ দিয়ে গেল, তারা ব'লে গেল বেড়ালটা এখনও মরেনি।

—ইং, কি গোঞ্জেছ! বাপরে! শিউরে উঠল তারা।

স্বর্ণ গেল চুপি চুপি। না দেখে থাকতে পারলে না।

সাদা দুধের মত বেড়ালটার রঙ—রঙে-ধূলোয় পিঙ্গল হয়ে গেছে। কি যন্ত্রণাকারী শব্দ।

স্বর্ণ এগিয়ে গেল—দু পা, এক পা করে।

তাকে স্পর্শ করলে।

বেড়ালটা মরে গেল।

বর্ণের একি হল?

বর্ণের চোখে একি দৃষ্টি! একি হ'ল তার? এসব সে কি দেখছে? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে—তার গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে,

ওই যে কলাগাছটা— ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে—কলার মোচ।

তার জিভ সরস হয়ে উঠছে। লকলক করে উঠছে! একি হ'ল তার? হে তৎস্বান!

এমনি করে নাকি স্বর্ণ হয়েছিল ডাইনী।

সে আবার কাউকে ডাইনীবিদ্যা দেবে-তবে তার মরণ হবে। নইলে ওই মাথাভাঙ্গা বেড়ালটার মত কাতরাবে, কাতরাবে, কাতরাবে—তবু তার মৃত্যু হবে না। মৃত্যু চোখের সামনে বসে থাকবে।

ও বলবে—আমাকে নাও গো—আমাকে নাও।

মৃত্যু বলবে—কি ক'রে নেব? এই বিদ্যে তুই আগে কাউকে দে—তবে নেব। নইলে তো পারব না।

বর্ণের হাত নাই তার ভিতরের ডাইনীর উপর।

সে কি গ্রামের কারুক বাড়ি যেতে পারে? বাপরে!

আমার অনেক বয়স পর্যন্ত স্বর্ণ বেংচে ছিল। আমি বললাম—স্বর্ণ পিসি।

ছেলেবেলায় কখনও সামনে যেতে সাহস হত না। বড় হবার পর ওপরে গিয়েছি এসেছি; নিজের ঘরে আধো-আক্ষকার আধো-আলোর মধ্যে চুপ করে বসে থাকতে দেখেছি। চুপ করে বসে থাকত। কারও সঙ্গে কথা বলত না। কেউ কথা বললে তাড়াতাড়ি দু-একটা জবাব দিয়ে যাবে চুকে যেত।

আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স যখন হ'ল, তখন আমি তার বেদনা বুঝলাম। মর্মান্তিক বেদনা ছিল তার। নিজেও সে বিশ্বাস করত—সে ডাইনী। কাউকে মেহে করে মানে মানে সে শিউরে উঠত। কাউকে চোখে দেখে ভাল লাগলে চোখ বন্ধ করত। তার আশক্তা হ'ত, সে বুঝি তাকে খেয়ে ফেললে;—হয়ত বা খেয়ে ফেলেছে বলে শিউরে উঠত। মনে হ'ত ডাইনী-মন্ত্র—বিষাক্ত তার ভালবাসা—লোভ হয়ে তীরের মত গিয়ে তাকে বিধে ফেলেছে তার হৃৎপিণ্ডে!

ডাইনীতে আজ আর বিশ্বাস করি না। একালের ছেলেরাও করে না। কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীতের একটি বিচিত্র পরিচয় আমার সৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। সেই কথাটি বলব।

তখন আমার বয়স নয় কি দশ। কিন্তু ঘটনাটি আজও মনে হয় এই কদিন আগের দেখা ঘটিল। হঠাৎ শুনলাম—ও পাড়ার অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনে খেয়েছে। অর্থাৎ ডাইনে নজর দিয়ে—দৃষ্টিবাগে বিন্দু করেছে, তার ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাকে শুষে থাচ্ছে। গ্রামটা একেবারে তোলপাড় করে উঠল। বিশ্যাত গুণীন ছিলেন আমাদেরই বাড়িতে। আমার বাবা গ্রামের বাইরে বাগানে তারামন্ডির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—সেইবানে থাকতেন এক সন্ধ্যাসী, পশ্চিম দেশীয় সাধু। আমি তাকে বলতাম গোসাইবাবা; অর্থাৎ গোসাইবী-বাবা। তিনি জানতেন অনেক বিদ্যা। তাকে খবর দেওয়া হ'ল। তিনি এলেন; আমি তাঁরই সঙ্গে গেলাম, স্বর্ণ ডাইনের কৌতু দেখতে এবং গোসাইবাবার ডাইন তাড়ানো দেখতে।

অবিনাশদাদা, অবিনাশ মুখ্যজ্ঞের বড়স তখন সতের-আঠারো। বাড়িতে আছে মা আর দুই বোন। অবিনাশদাদার যা—গোসাইবাবাকে বলেন গোসাইদাদা, অবিনাশদাদা বলেন—গোসাইমামা। অবিনাশদাদার বাড়ি তখন গোকে লোকারণ্য; স্বর্ণ ডাইন অবিনাশকে খেয়েছে, রামজী সাধু বাড়বেন।

মেটে কোঠার উপর অবিনাশদাদা ওঝে আছেন, চোখ বক্ষ। প্রবল জুব। ডাকলে সাড়া নাই। মাথার শিয়ারে বসে মা। পাশে বসে বোন। চোখের জগ ফেলছেন। রামজী সাধু গিয়ে একপাশে বসলেন—তার পাশেই আমি।

ডাকলেন—ভাগ্না। অবিনাশ ভাগ্না।

কোন উত্তর দিলেন না অবিনাশদাদা।

—অবিনাশ! এ! গায়ে নাড়া দিলেন।

এবার অবিনাশ ঘূরে শুল। বললে—মৰ হাঘরে গোসাই। আমি মেয়েছেলে। আমার গায়ে হাত দিছিস কেন?

—ই। তু কৌন? মেয়েছেলে? কে রে তু?—অবিনাশদাদা উত্তর দিল না।

—এ। তু কে রে? এ?

—বলব না।

—বলবি না?

—না।

মন্ত্র পড়া শুরু হ'ল। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়েন আর ফুঁ দেন—চু! চু! চু!

পরিত্রাহি চীৎকার করে অবিনাশদাদা। বলছি। বলছি, বলছি!

তবু মন্ত্রপঢ়া চলল, সঙ্গে সঙ্গে ফুঁকার—চু! চু! চু!

বাবারে, মারে! মরে গেলাম রে! ও গোসাই, আর মেরো না। বলছি আমি

—বোল। বোল তু কে? বোল।

—আমি স্বর্ণ!

আজও স্পষ্ট কানে শুনতে পাচ্ছি। আমি স্বর্ণ! চোখে সব দেখতে পাচ্ছি! থাক সে কথা।

গোসাই প্রশ্ন করলেন—স্বর্ণ? তু কাহে ইয়া? আ? এখানে কাহে?

—আমি একে খেয়েছি যে।

—হাঁ-হা। উ তো জানছি। ওহি তো শুধাচ্ছি—কাহে—কাহে খেলি?

কি করব? আমার ঘরের সামনে দিয়ে এই বড় বড় আম হাতে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি থাকতে পারলাম না, আমি আম না পেয়ে ওকেই খেলাম।

—কাহে, তু মাঞ্জলি না কাহে? কাহে বললি না—হামাকে দাও?

—কি করে বলব? একে লোভের কথা, তার উপরে মেয়েলোক, আমি

পঞ্জায় বলতে পারলাম না।

—হাঁ! তব ইবার তু যা ভাগ।

—না। তোমার পায়ে পড়ি, যেতে আমাকে বোল না।

আদেশের সুরে গোসাই বললেন, যা তুই। হামি বলছে।

—না! বিদ্রোহ ঘোষণা করলে অবিনাশদাদার মুখ দিয়ে স্বর্ণ ডাইনী।

—না? আচ্ছা এ দিদি, আন সরুমা।

সরমে এল। হাতের মুঠোর সরমে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে ছুঁ শব্দে ফুঁ নিয়ে ছিটিয়ে মারলেন অবিনাশদাদার গায়ে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠল অবিনাশদাদা—বাবারে মারে, ওরে মেরে ফেললে গো! ওরে বাবারে!

আবার মারলেন সরমের ছিটে।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, আর মেরো না, আমি যাচ্ছি।

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

সঙ্গে সঙ্গেই অবিনাশদাদা কেঁদে উঠল—ওগো, যেতে যে পারছি না গো।

—পারছিস না? চালাকি লাগাইয়াছিস, আ? হাত তুললেন রামজী সাধু মারবেন ছিটে। অবিনাশদাদা চীৎকার করলে আবার—না না। যাচ্ছি।—

—যাবি?

—হ্যাঁ যাব।

—তব এক কাম কর। ঘরের বাহারে একটো কলসীমে জল আছে, দাঁতে উঠাকে লে যা। নেহি তো—

—তাই, তাই যাচ্ছি।

জুরে অচেতন অবিনাশদাদা উঠে দাঁড়াল। দাদার মা ধরতে গেলেন। রামজীবাবা বললেন—না।

ঘর থেকে অবিনাশদাদা বের হল। চোখে বিহুল দৃষ্টি তার। ঘরের বাইরে দেতলার বারান্দায় জলপূর্ণ কলসী আগে থেকেই রাখা ছিল, সেটার কানা দাঁতে কামড়ে তুলে নিলে। দাঁতে ধরেই সে নেমে গেল সিডি বেয়ে, উঠানে শামল, বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, দাঁত থেকে কলসীটা খসে পড়ে ভেঙে গেল, সে নিজেও পড়ে গেল মাটির উপর—ধরলেন গোসাইবাবা। এবার বিপুল বলশালী পশ্চিমদেশীয় সন্ধ্যাসী কিশোর বা সদা-যুবা অবিনাশকে ছোট ছেলেটির মত পাঁজাকোলে করে তুলে উপরে এনে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। গোসাইবাবার পাশে পাশেই রয়েছি আমি।

এবার গোসাইবাবা ডাকলেন—অবিনাশ, মামা!

—আঁ?

—কেমন আছ?

—ভাল আছি।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জুব হেড়ে গেল। আমার শিশুচিঠে

ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বন্ধ হয়ে গেল। স্বর্ণ সে দফা যে মার খেয়েছিল, একথা বলাই
বাহ্য।

অনেক দিন পর। তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ
আমাদের বাড়ি যাওয়া-আসা শুরু করলে। পান তরকারি নিয়ে আসত। উন্নাম,
ফুলপুরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। মা তাবে
বলতেন, ঠাকুরবি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ। স্বর্ণ আসত এবং পর আমাদের বাড়ি।
আমার ভয় চলে গেল। স্বর্ণকে বুঝতে লাগলাম। পথে যেতাম, স্বর্ণ নিজেন
দাওয়ায় বসে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, অথবা আধো-অঙ্ককার ঘরের
দুয়ারটিতে টেস দিয়ে বসে আছে। নিঃসঙ্গ পাথরী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ।

স্বর্ণ ছাড়া আরও আরও অনেক ডাইনী ছিল। তার চেয়ে গল্প ছিল অনেক
বেশী। প্রকাও মাঠে একটা অশ্বথগাছ ছিল। মাঠটার চারিদিকে আর যে গাছগুলি
ছিল সেগুলি সবই বট, মাঝাখানে ওই অশ্বথ গাছটি খালিকটা হেলে দাঁড়িয়ে ছিল।
একদিকের শিকড় উঠে বেরিয়ে পড়েছিল। মনে হ'ত গাছটার আধখানা। আছে
আধখানা মাই। উন্নতাম ওটা ডাকিনীর গাছ। দেশে নাকি ছিল ভারী এক গুণীন।
কাউরের অর্থাৎ কামরূপের বিদ্যাও তার জানা ছিল। একদিন গরমকালের রাতে
হামের প্রাণে বসে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে গালগাল করছে, এমন সময়
আকাশপথে একটা শব্দ শোনা গেল। প্রচণ্ড বেগে যেন একখানা মেঘ উড়ে
চলছে। সকলে বিস্রিত হল—একি। আচর্য মেঘ তো ? গুণীন হেসে
বললে—মেঘ নয়! গাছ উড়ে চলছে।

—গাছ ? গাছ উড়ে চলে ?—কি বলছ ?

—চলে। কামরূপের ডাকিনীবিদ্যা যারা জানে তারা গাছে বসে বিদ্যার
প্রভাবে উড়িয়ে নিয়ে চলে—দেশ থেকে দেশান্তরে। ডাকিনী চলেছে
আকাশপথে।

বিশ্বাস করলে না কেউ। বললে তুমি ধোকা দিছ।

—দেখবে ?

—দেখাও।

গুণীন হাঁকতে লাগল মন্ত্র। আকাশে চীৎকার উঠল, চিলের মত চীৎকার,
একসঙ্গে যেন বিশ-পঁচিশটা চিল দুর্বল ত্রেণে আকাশের বুক চিরে চীৎকার করে
উঠল—ই—।

সকলে ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু গুণীন আপন মনে মন্ত্র উচ্চারণ করেই
চলল। মেঘের মত জিনিসটার গতি থামল না। কিন্তু সে সামনে আর ফুটল না।
পাক খেয়ে শুরতে লাগল। শুরতে শুরতে মাটির উপর নেমে এল এক অশ্বথগাছ।
গুণীনের মন্ত্র তখনও থামেনি। মাটি ফাটল, গাছের শিকড় মাটির সেই ফাটলে
চুকল, গাছটি এখানে জন্মালো গাছের মত সোজা হয়ে দাঢ়াল। তার চেয়েও
বিশ্বয়ের কথা—গাছের মাঝায় দেখা দিল অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। একপিঠে

লোচুল কিন্তু সম্পূর্ণ বিবর্ণ।

লোকে মাথা হেঁট করলে।

ডাকিনী বললে—আমাকে নামালে তুমি গুণীন, দশের সামনে এই অবস্থায়!
আমাকে লজ্জা দিলে! আমি ডাকিনী হলেও মেঘেছেলে, আমার লজ্জা রক্ষা কর,
আমাকে কাপড় দাও।

গুণীন হাসল।

ডাকিনী তখন হাত বাড়িলে বললে—দাও, কাপড় দাও।

গুণীন হেসে ঘাড় নাড়লে।—সবুর কর। সবুর কর।

কিন্তু যারা গুণীনের সঙ্গী তাদের সবুর হল না।

একজন বললে—ছি ভাই!

গুণীন তাকে ধমকে দিলে—না।

ততমনে একজন অতর্কিতে গুণীনের কাঁধের গামছাখানাই টেনে মেঘেটিকে
উড়ে দিলে। গুণীন আতকে উঠল—করলি কি ? করলি কি ?

ডাকিনী খিলখিল করে হেসে উঠল। গামছাখানায় মাথা থেকে পা পর্যন্ত
শামনের দিকে চেকে নিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের দিকে গামছাটার প্রান্তটা ধরে
উপরের দিকে টেনে নিয়ে পিছনের দিকে মাথা পার করে ফেলে দিলে। গুণীন
মর্মান্তিক চীৎকার করে উঠল—সকলে সভয়ে দেখলে, গুণীনের দেহের চামড়াও
পায়ের দিক হতে ছিঁড়ে ক্রমশ মাথার দিকে গুটিয়ে পিছনের দিকে উলটে গেল।
চামড়া ছাড়ানো মানুষটা পশ্চর মত আর্তনাদ করে উঠল। সে গিয়ে আবার চাপল
সেই গাছে।

গুণীন সেই অবস্থাতেই তখনও মন্ত্র পড়ছিল।

মন্ত্র আধখানার বেশী পড়তে পারলে না সে। গাছটা আধখানা উঠল না,
আধখানা ছিঁড়ে আবার উঠল আকাশে। আবার আকাশে শব্দ হতে লাগল। উড়ত
মেঘের মত চলে গেল—কোথায় নিঃশব্দেশ হবে। এই অশ্বথ গাছটা সেই
আধখানা গাছ।

আজ সেকালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে
আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার পাচ অঙ্ককারে যারা
আজ ভুবে আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সেকালের ডাইনীর বিচ্চি গল্পও
আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে কিন্তু অন্য বিশ্বাসই তো
নাই—আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদন। সারাটা জীবন তারা এই অপরাদের
গ্রানি বহন করে চলাত। নিজেরাও বিশ্বাস করে নিত এই অগবাদকে সত্য বলে
আর ভগবানকে ডাকত দৰ্শনের মত—আমার এ লজ্জার বোরা নামিয়ে দাও প্রভু।
এ ভরংকর জীবনে অবসান কর। চোখের জল মুছে ফেলত কাপড়ের আঁচলে,
মাটিতে কোলকুমে একফোটা ঝারে পড়লে শিউরে উঠত, মা বসুমাতীর বুক যে
জলে উঠবে।

ভুলোর ছলনা

তারাশক্তির বন্দেয়োপাধ্যায়

ভুলো কে জানো ? মানুষ নয়। ভুলো মানে ভাস্তি—মাতোলায় ; মিথ্যে ভুলো ভোলায়। আমাদের দেশে বলে—ভুলো হল একরকম ভূত। ব্ৰহ্মদৈত্য, মামদৈ, শীৰ্ষচূড়ী, গোদানা, গলায়দড়ের ঘৃত এত এক রকমের ভূত। নিশির নাম অনেকে জানে—ভুলো অনেকটা নিশির ঘৃত। কিন্তু নিশি ডাকে ভোরবেলা কি মাঝেরাত্রে, ভুলোর খেলা সব সময়েই। তবে ঠিক সন্ধ্যার পর থেকে একটু অস্বাকার হলে ভুলোর খেলা জন্মে ভাল। নিশি, ভূত বা প্রেতিলীর সঙ্গে মিল এর অনেকটা। তফাত—নিশি ডাকে ঘুমের মধ্যে আর ভুলোর খেলা জাগাত মানুষের সঙ্গে।

হয়তো কেউ সক্ষেবেলা যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে রাঙ্গা ধরে, তাবৎকে কোন বন্ধুর কথা কি আপন জনের কথা, হঠাৎ একসময়ে সে বন্ধু তার সামনে এসে দাঢ়াল, বলল—এই যে রে!

সে বললে—তুই ? আরে তোর কথাই ভাবছিলাম যে।

—হ্যাঁ রে, তাই তো এলাম। এখন আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মানুষটার মনেও হবে না যে বকুল কোথাকে এল। হয়তো তখন আসল বন্ধ দশ বিশ মাইল কি একশো মাইল দূরে রয়েছে, সে কথা লোকটি জানে, তবু তার মনে সেই থোকাই জাগবে না। ভুলোর মায়া। সে বিশালিত হয়ে যাবে তাকে দেখে; এবং মুহূর্তে মন্ত্রমুঞ্চের ঘৃত তার পিছনে পিছনে চলবে। ভুলো চলবে পথ হেড়ে অপথে বিপথে, খানাখন্দ কৌটা খোচা ভৱা জায়গার উপর দিয়ে, মায়ার ভোলা মানুষটার মনে সে কথা উঠবে না, জিজ্ঞাসাও করবে না যে এদিক দিয়ে কোথায় চলছিস ভাই। মনে তখন থোর লেগেছে তার, সে চলবে মুখ্য বন্ধ করে।

তারপর ? তারপর মানুষটার দেহ হয়তো পাওয়া যাবে কোন খানাখন্দের মধ্যে ; নয়তো কোন নদীর নদী। নয়তো কোন উচু জায়গার নীচে একটা পাথরে মাথা হেঁচে পড়ে থাকবে। www.banglabookpdf.blogspot.com

লোকটা ভুলো-ভূতের সঙ্গী হয়ে গেল আরপর থেকে।

তার বাসা হল যে জায়গায় সে মরেছে সেই জায়গায় আর ভুলো ফিরে গেল আপন জায়গায়।

রাত্রে দুজনে মাঠের মধ্যে ঝুঁজে বেড়াতে লাগল আর কাকে সঙ্গী কুড়া যায়। আর না হয় তো রাত্রে মাঠের মধ্যে নাচতে গাইতে লাগল—

হায় কি মজা হায় রে—

ভুলোর খেলা মজার খেলা খেলবি যদি আয় রে।

ফুস মন্ত্র ভুল ভুলিয়া—যাবি রে সব দুখ ভুলিয়া—
মিলি ধূরণের গান। গানটা অবশ্য আমি আন্দাজ করে লিখলাম। কারণ কী
যে তারা গায় সে আমি কানে তো শুনি নি। তবে হ্যাঁ, ভুলো-ভূতে লোককে
মিয়ে যাচ্ছে এ আমি দেখেছি। আরে বাপ, সে কী কাও! ভুলোয় ভুলিয়ে
যাচ্ছে—একশো লোক ভুলোলাগা লোকটাকে ধরবার জন্মে ছুটেছে; কিন্তু
কিছুতে ধরতে পারছে না। ভুলো দেখেছে লোকে দেখেছে তার কাও, ছুটে
মানছে তুকে ধরে জোর করে আটকাবার জন্মে, লোকটা সোজা ছুটলে ধরে
মানছে, সুতরাং ভুলো-ভূত তখন একেবেকে ছুটতে লাগল—সোজা চলছে, হঠাৎ
বাইনে বেকম, তারপর আবার দায়ে, তারপর আবার দায়ে, পিছনে ভুলোলাগা মানুষটা ঠিক
মানও বা একেবাবে উলটো মুখে; আর তার পিছনে ভুলোলাগা মানুষটা ঠিক
মানছে তারা কিছুতেই তাকে ধরতে পারছে না। অবশ্যে ভুলো-ভূত একটা
মানছে যাবি পথে তেমনি করে একেবেকে ছুটতে লাগল। মানে যাবি পিছন থেকে ধরতে
একটু অস্বাকার হলে ভুলোর খেলা জন্মে ভাল। নিশি, ভূত বা প্রেতিলীর সঙ্গে মিল
এর অনেকটা। তফাত—নিশি ডাকে ঘুমের মধ্যে আর ভুলোর খেলা জাগাত
মানুষের সঙ্গে।

রখনও কখনও লোকে ধরে ফেলে, কিন্তু তাতেও বিপদ, লোকটা তখন সব
মানে গেছে। মা-বাপ-স্তু সব। ফোলফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। এ আমি চোখে
নেই। ভুলোলাগা লোকটাকে বহুকষ্টে ধরেছি। তারই কথা বলছি তোমাদের।

একেবাবে হৃষ্ণ সত্য, আগামোড়া। বানানো নয়। সেহজন্মে এ কাহিনীর
মাধ্যমে যে আমি বলে লিখেছে সে আমিহি—তারাশক্তির বন্দেয়োপাধ্যায়, বাড়ি
শান্তিগুর। www.banglabookpdf.blogspot.com

শটনাটা অনেক দিনের। বলি শোন।

ইংলেজী ১৯২৯ সাল। আমি তখন লাভপুর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।
সেকালে ইউনিয়ন বোর্ড ছিল ; এখন ডাঁটি পিলো পক্ষায়েত হয়েছে।

পাচ-সাত কি নদীশ খানা শাম নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ড। লোকের উপর ট্যাঙ্গ
করে, সেই ট্যাঙ্গ আদায় করে চৌকিদারদের মাইলে দেয় আর যা বাড়তি থাকে
করে, তা থেকে করে কিছু শাম বাজা-ঘাট, কিছু পানীয় জলের জন্মে কুয়ো। আর
তা থেকে করে কিছু শাম বাজা-ঘাট, কিছু পানীয় জলের জন্মে কুয়ো। আর
দেশে তখন প্রচঙ্গ ম্যালেরিয়া—তার জন্মে সরকারের কাছ থেকে পাওনা
সিনকোনা ট্যাবলেট বিতরণ করে। ডোবায় কেরোসিন দেয় মশাৰ ডিম মারবার
জন্মে।

তখন আমি সাহিত্যিক নই। তখন দেশের কাজ করি, কংগ্রেস কুঠি, বাসনা
দেশের সেবা করব। দেশ স্বাধীন করব। তার সুবিধের জন্মে ইউনিয়ন বোর্ডের
প্রেসিডেন্ট হয়েছি। কিন্তু কাজ তো করা যায় এ থেকে! আমার বয়স তখন
একত্রিশ বছর। রাস্তাঘাট করাই ; তার সঙ্গে এই ম্যালেরিয়া নিবারণে কাজটা
নিয়েছি। মশা মারতে হবে। অ্যানোফিলিস মশা দূর হলেই ম্যালেরিয়া যাবে।
কারণ মাছি যেমন কলেবার বীজ ছড়িয়ে বেড়ায় তেমনি আনোফিলিস-ই
ম্যালেরিয়ার বিষ চুকিয়ে দেয় মানুষের দেহের দফতে। মশা মারবার জন্মে তিনি
সে সময় প্রকল্পদণ্ড দণ্ড ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। মশা মারবার জন্মে তিনি

একটা নতুন সহজ পছন্দ আবিষ্কার করেছেন তখন।

আগে জঙ্গল সাফ করে, ডোবায় কেরোসিন দিয়ে মশা মারবার উপর আমাদের জানা ছিল। কিন্তু সে প্রায় কামান দেন্দে মশা মারার মত ব্যাপার। এম অন্ধগলে কত জঙ্গল পরিষ্কার করবে। কত খানা ডোবায় কেরোসিন দেবে। সে খরচের টাকা কোথায়?

দন্ত সাহেব পথ বের করেছেন—সহজ পথ, কামান না, বন্দুক না, লাঠি না। মশাও তোমাকে মারতে হবে না; তুমি টোপা 'ডুর্রলি' বা পানা নির্মল করে ফেল, তাহলে অ্যানেকফিলিস বাঁকবন্দী থাকলেও ওদের কামড়ে ম্যালেরিয়া হবে না। এই টোপা পানার রস খেয়েই অ্যানেকফিলিস মশার ভিতর ম্যালেরিয়া জন্মায়, তখন সে কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয়।

ধর, মাতাগোরে উপদ্রব হয়েছে! মাতালেরা দাঙা করছে। নিত্য চেচামেচি করছে, গালাগালি করছে মাতাল অনেক। সুতরাং মাতাল তুমি কত ধরবে কত বাঁধবে? তার থেকে তুমি যদি মনের দোকান তুলে দাও, তবে মাতাল আর কেউ হবে না। লোকগুলো তো আর মদ না খেলে মাতলামি করতে পারবে না।

মনের দোকান তোলা যায় না। কিন্তু মশার বিষ শেষ করতে টোপা ডুর্রলি বা পানা নিশ্চয় শেষ করা যায়। খবচও এতে অনেক কম। সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ডে বোর্ডে হৃকুম এল—টোপাপানা বা ডুর্রলি তুলে ফেল।

দন্ত সাহেব নিজে উৎসাহী হয়ে দলবল জুটিয়ে পুরুরের ডোবায় নেমে টোপাখানা পরিষ্কার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে কাজ শুরু করেছিলেন। টোপাখানা তুলে তার চারপাশে খড়কুটো দিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতেন। তার চারপাশে তার দলের লোকেরা ঘূরত এবং গান করত—

মশার মাসী, সর্বনাশী; আয় দোব তোর গলায় ফাঁদি—

ছিড়ব বে তোর ঘেরাটোপ—পোড়াব তোর দাঢ়ি পোফ।

আবও বড় গান। সব ঠিক মনে নেই। যাই হোক, টোপাখানা মশাদের দাঢ়িগোফওয়ালা মাসী—সেই সর্বনাশী মাসীকে নির্মলের ব্যবস্থা করা ছিল তখন ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ।

প্রথম একদফা অনেক লোক লাগিয়ে গ্রামের যে সব পুরুরে টোপাপানা ছিল—তা সব তুলে দিয়ে পুড়িয়ে ব্যবস্থা করা হল যে নিয়মিতভাবে দুজন করে লোক কাজ করবে প্রতি গ্রামে যাদের কাজ হবে পুরুরগুলো ঘূরে ঘূরে দেখা আর একটা দুটো যেমন দেখা যাবে অমনি তুলে ফেলা।

লাভপুরের এই কাজের জন্য দুজন বাউড়ী জোয়ানকে রাখা হয়েছিল। নিতাই এবং পাঁড়ে। নিতাইরের নাম তোমাদের শোনা নাম কিন্তু পাঁড়ের নাম 'পাঁড়ে' অর্থাৎ পাঁও কেন তার অর্থ বলব কি আমিও ঠিক জানি না। পাঁড়ে বাউড়ী। অর্থাৎ দস্তুর মত নাম। পাঁড়ে আজ বেঁচে নেই কিন্তু নিতো আজো আছে। বুড়ো হয়েছে। এরা দুজনে ছিল বন্দু। বুব কড়া বাটুনি তারা খাটতে নারাজ ছিল; চাষ করত না, কাগজ ঘরে 'মান্দেরি'ও করত না। হালকা কাজ থেজে বেড়াত। এবং

বার জন্যে মজুরি তারা কম হলেও আপত্তি করত না। এই গ্রাম ঘূরে এখানে এখানে ডুর্রলি বা টোপাখানা থেজে তুলে ফেলার কাজটা তারা খুশি হয়ে নাহোচিল। সকালে উঠে—তামাক টামাক খেয়ে দুজনে বের হত; বিড়ি টানত এবং ডুর্রলি দেখলে তুলে ফেলে গাছতলায় জিরিয়ে নিত, গান গাইত। খাবার পাই অর্থাৎ বারোটী বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে কিছু ডুর্রলি যালা অর্থাৎ বারোটী বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে কিছু ডুর্রলি যালা অর্থাৎ বারোটী বাজতে চক্কর দেওয়া শেষ করে দেখাবার জন্যে এবং আজড়া। যামছায় বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরত। জল খেয়ে বটতলার ছায়ায় ঘূম এবং আজড়া। বিকেলে চারটের পর স্নান করে টেড়ি কেট কিছু মদ খেয়ে আসত ইউনিয়ন বোর্ড আপিসে। ডুর্রলিগুলো দেখিয়ে ফেলে দিত গর্তে, ঘাটি চাপা দিত—তারপর ইউনিয়ন বোর্ডের খাতায় বুড়ো আঙুলের ছাপ দিয়ে প্রত্যেকে ছ-আনা পয়সা টাকাকে উঁজে মনের দোকানে গিয়ে আনা দুই-তিনের পচাটী মদ খেয়ে টিলতে টিলতে বাড়ি ফিরত। আমি তখন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে প্রত্যেকে খাতায় পয়সাকড়ি দিয়ে সকলকে বিদায় করে আমিও ফিরতাম বাড়ি। বন্দুরা বসে আছেন তখন আসর জমিয়ে, তাস খেলছেন।

এরই মধ্যে একদিন—১৯২৯ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ। তার আগে একটা কথা বলার দরকার। সেটা এই যে, বাঞ্ছলা দেশে ১৯২৯ সালে খুব ভাল বর্ষা হয়েছিল; শ্রাবণের তৃতীয় সপ্তাহ আসতে শেষ হয়ে গেছে। মাঝ সবুজ ধামে ভরে উঠেছে। আষাঢ়ে পৌতা জমিতে ধান বেশ বড় হয়েছে; তা প্রায় ধামে ভরে উঠেছে। আষাঢ়ে পৌতা জমিতে ধান বেশ মোটা হয়েছে। পুরুর ডোবা নালা উচ্চতে হাঁটুর সমান এবং বাড়ে-গোছেও বেশ মোটা হয়েছে। পুরুর ডোবা নালা নদী জলে টাইটুবুর। আমাদের গ্রামের গায়ে দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা রেললাইন, তার দক্ষিণে মাইলখানেক বিড়ত ধানের ক্ষেত্রে ওপারে কুয়ে নদী। কুয়ে তখন ভরাভর্তি।

সেদিন বিকেলে সাড়ে চারটের সময় বোর্ডে গেলাম। দেখলাম নিতো বা নিতাই এসে বসে আছে—পাঁড়ে আসেনি। নিতোকে বলেছে—তু চল এগিয়ে, আমি যাচ্ছি। তু কিন্তুক আগে ভাগে নিয়ে যেন চলে আসিস না। দুজনে পয়সা নিয়ে মনের দোকানে ফিরব।

সাড়ে চারটা থেকে পাঁচটা, পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত আমরা অর্থাৎ সেক্রেটারি এবং আমি বোর্ডের কাজকর্ম সারলাম—অপেক্ষা কেবল পাঁড়ের, সে এলি নিতোর এবং তার টিপ নিয়ে পয়সা দিয়ে বাড়ি ফিরব।

ছ-টার সময় বললাম—কই রে, পাঁড়ে এল কই!

নিতো মদ খানিকটা খেয়েছিল—তার বোঁকে এবং চুপচাপ বসে থাকায় বিমুলিতে সে মধ্যে মধ্যে চুলছিল। আমার কথায় সজাগ হয়ে উঠে চোখ কচলে বললে—তাই তো মশায়, কই এল। সে নিশ্চয় আসবে বলেছে।

খুল চিপ্পিত হয়ে পড়ল সে।—তাই তো!

কিন্তু আমরা বসে থাকি কত? সঙ্গে হয়ে আসছে। সেক্রেটারি বাড়ি থাবার জন্য উসখুস করছে, আমার মনও টানছে তাসের আজড়ার। তবু আবও মিলিট

পাড়ের পয়সা রাকি রইল, কাল নেবে।

তাই নিয়েই সে যেন চিন্তিত মনে উঠে গেল। বিড়বিড় করতে করতে গেল—শালার কাজ দেখ দিকি। শালা বদমাশ কোথাকার!

কথাটা আমার কানে এল। আমরা খোঁ থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখলাম নিতো পশ্চিম মুখে চলেছে, ঘাবার কথা তার পুর মুখে। বুবলাম, পশ্চিম মুখে একটু এগিয়ে গিয়ে সে রেললাইন ধরবে। পুর মুখে ফিরে সোজা এসে উঠে তাদের পাড়ার। তাদের পাড়াটা আমার বাড়ির দক্ষিণ-পূর্বে, একেবারে লাগাও। টেশনের গায়ে।

বাড়ি ফিরলাম—তখন অঙ্ককার হয়েছে। আমার বৈষ্টকখানায় তখন আলো ভেলে তাসুড়ে বঙ্গরা বসে গেছেন। আমিও পাশে বসলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গি হার্টস, ত্রি নো-ট্রামসের ডাকের নেশা জমে উঠল।

হঠাৎ নেশাটা যেন একটা ঠোকর খেয়ে ভেঙে গেল। ঠিক দক্ষিণ দিকে একটা গোলমাল উঠল।

—গোলমাল? কিসের গোলমাল? বৈশাখ-জৈষ্ঠো আগুনের ভয় থাকে কিন্তু এটা বর্ষাকাল এবং সেবারকার মত ভরাভৃতি জরজমাট বর্ষাকাল। আগুন লাগান তো কথা নয়। কান বাজিয়ে শুনলাম।

বহু লোকের একটা আঙ্কেপ এবং শঙ্কাপূর্ণ একটা 'গেল রে—গেল রে' শব্দ।

ঠাওর করতে পারল না— কী গেল! গেল বা যাজে—যেন টেনে ছিড়ে কিছু চলে যাজে বা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাজে!

কোলাহলটা নিকটে—ওই রেললাইনের ধারে। আমার বৈষ্টকখানা থেকে ধীরে সুন্দে পাঁচ-ছ মিনিটের পথ। দৌড়ে গেলে তিন-চার মিনিট লাগে।

আমরা কেউ বসে থাকতে পারলাম না ওই গেল গেল শব্দ ভুলে। সকলে ছাটেই বেরিয়ে এলাম। এবং মিনিট দুয়ের মধ্যে গ্রামপ্রান্তে এসে নজরে পড়ল রেললাইনের উপরে অনেক লোক। তারা দাঁড়িয়ে ওই 'গেলরে—গেলরে' বলে একরকম হাহাকারই করছে। লাইনের ওপারে মাঠে দেখলাম গোটা দুই লঞ্চনের আলো যেন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একবার এদিক একবার ওদিক, কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। আলেয়ার মত।

লাইনে এসে উঠে দেখলাম বাটড়ীপাড়ার মেঝে পুরুষেরা সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে ওই হায় হায় করছে। কতকগুলি পুরুষ চেচে—গেল রে। গেল রে। ওই!—কতকগুলি ভদ্রলোকও তখন এসে দাঁড়িয়েছেন, তারা বলছেন—ওই! ওই! না?

—কী হয়েছে?— জিজ্ঞাসা করলাম সামনে থাকে পেলাম।

সে আমাকে চিনে কেবল উঠে বললে—ওগো বাবু গো, নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল গো। নিতোকে ভুলোতে নিয়ে গেল।

ভুলোতে নিয়ে গেল—কথাটা চট করে বুঝিনি। বললাম, নিতোকে ভুলোয় নিয়ে গেল কি?

মে বললে—হ্যাঁ বাবু, ওই দেখ মাঠে ছুটছে গো, আর চেচে— দাঁড়া রে— পাড়ে রে দাঁড়া রে।

বিরক্ত হয়ে বললাম—মানে কী?

—ও গো ভুলো ভুত, পাড়ে সেজে এসে ওই দেখ মাঠে মাঠে ভকে ছুটিয়ে গো চলেছে, কেউ ধরতে পারছে না। নিয়ে গেল নদীতে ভুবিয়ে মারবে গো; নদীতে নদী দুকূল পাথার আঃ আঃ ভরা জোয়ান গো—আঃ আঃ।

—পাড়ে কোথায়?

—সি ওই দেখ, ওইখানে রাইচে গো। ভয়ে ডরে সিও কাপছে। নিতো মলে মে ওকে লেবে গো!

অর্ধেক বুবলাম, অর্ধেক বুবলাম না। তবু মাঠে নেমে পড়লাম। আমার সঙ্গে আম দুই সঙ্গী, সামনে ওই বিস্তীর্ণ এক মাইল কোয়ার জলে উইটুমুর ধানভরা খেতের মধ্যে। থায় দুশো গজ দূরে তখন আলোগুলো ইতস্তত ছুটোছুটি বাছে—এদিক ওদিক সেদিক কখনও সোজা কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে। জল ও ধান—ভরতি জমির আলোর উপর দিয়ে আলো হাতে বেতে গেলে এমনিই হবে। আর একস্থল অঙ্ককারে থেকে অঙ্ককার-অভ্যন্তর চোখে দেখলাম—কালো কালো মানুষ অস্ত ত্রিশ পঁয়াজিশ জল, কৃষ্ণপদ্মের বাত্রির অঙ্ককারে প্রেতবোনির মত ছুটিছাটি করছে। এবং তার খানিকটা আগে চিৎকার হচ্ছে, তারবারে আর্তকচ্ছে বাকুল হয়ে কেউ গ্রাণ ফাটিয়ে ডাকছে—দাঁ-ড়া-রে, দাঁ-ড়া-রে—পা-ড়ে-রে, মাড়া রে, ও রে দাঁ ড়া রে!

কল্পনার নিতোর তা চিনতাম। কিন্তু কাকে বলছে? পাড়ে টেশনে দাঁড়িয়ে থাপছে ভয়ে। কিন্তু নিতো যাকে ডাকছে সে যে তার সামনে—তাতে তো সম্মেহ নেই। সে যেন নিতোর চেয়েও জোরে ছুটে চলেছে সামনে এঁকে-বেঁকে—কখনও ডাইনে কখনও বাঁয়ে কখনও সোজা। যেন সে হাওয়ায় উড়ছে। নিতো দুই হাত যাড়িয়ে তাকে ধরবার জন্যে ছুটছে—ছুটছে। যেন সে হারিয়ে যাবে, যেন সে পালিয়ে যাবে। নিতো আর তার কখনও নাগাল পাবে না।

পিছনের লোকেরা বহু জনে একসঙ্গে ডাকছে, নিতো! নিতো থাম—থাম! কিন্তু নিতো বধির হয়ে গেছে। সে শুনতে পাচ্ছে না। তার জাফেপ নেই, সে যেন সমস্ত পিছনটা চিরদিনের মত ফেলে চলে যাচ্ছে।

কে যেন টর্চ ফেললে। টর্চের আলোটা নিতোর চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে পড়ল, দেখলাম—দু' হাত বাড়িয়ে নিতো ছুটছে; আচর্য সে হাত বাড়ানো। এবং আচর্য সে তার হোটা। উর্ধ্বস্থাসেই শুধু নয়, দিঘিদিক জানশূন্যের মত ছুটছে। জল এবং ধান-ভরা মাঠ ভেঙে ছুটছে। কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনও সোজা। কখনও কখনও পড়ছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠে আবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। একবার দাঁড়ায় না। আরও আচর্য এই যে, পিছনের অনুসরণকারীরা যখন কাছে আসে পড়ছে তখন হঠাৎ আরেক দিকে বেঁকে সে ছুটে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে দিয়ে জল ভেঙে কাদা ভেঙে। অনুসরণকারীরাও থাণপথে ছুটছে কিন্তু জলে ধানের

মধ্যে নামতে পরিষে না তারা। তারা আইলে আইলে ছুটছে। ঘুর হচ্ছে। ততক্ষণে নিতো আরও এগিয়ে যাচ্ছে। পিছনের আলোর ছটার প্রতি তার দৃষ্টি ফিরছে না। মানুষটা যেন উন্মাদ, মানুষটা যেন দানবের মত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে— থাণের ব্যাকুলতায় ব্যাকুলতায় ব্যাকুলতায়।

—পা-ড়ে-রে—পা-ড়ে-রে—দাঁড়া-রে—দাঁড়া-রে!

চলছে কিন্তু ঠিক পুর-দক্ষিণ মুখে। নদীর দহের দিকে। রেললাইন সোজা পূর্বমুখে এসে একটা বাঁকে দক্ষিণমুখে মোড় নিয়ে নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গেছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড দহ—সেই মুখে চলেছে।

মুহূর্তে মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে—নিতোর সামনে ভুলো পাড়ের চেহারা ধরে হাওয়ায় ভর দিয়ে ডেকে নিয়ে চলেছে। আয়—আয়—আয়।

আমরা কেউ দেখতে পাই বা না পাই, নিতো তাকে দেখছে। ওই চলছে নিতো—ওই—ওই।

আলোঙ্গো কাছে গেল। এইবার ওকে ধরবে।

কিন্তু মুহূর্তে নিতোর কঠ উলটোমুখী হয়ে ছুটে চলল—। যাঃ—আলো অনেক পিছনে পড়ে গেল দেখতে দেখতে। নিতো ছুটেছে পুলের দিকে। পুলের উপাশে দহ। পুলের মুখটা বড় বড় পাথর দিয়ে ঢেকে তারের জাল দিয়ে বেঁধে অন্ত দোতলা বাড়ির সমান উচু এবং লাইনের মুখটা লোহার স্পাইক দিয়ে মানুষ জন্ম জানেয়ারের পক্ষে অনবিগম্য করে রেখেছে। যেন কেউ লাইন ধরে ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পার না হতে পারে। পুল থেকে পড়লেও মরবে নিতো ভুবে। পুলে উঠলে হয় জালে পা বেঁধে পাথরে আছড় খেয়ে পড়ে মরবে, নয় উপরে উঠে ওই স্পাইকে গেঁথে যাবে।

নিয়ে গেল নিয়ে গেল— ভুলো তাকে ছিলিয়ে নিয়ে গেল।

তখন আমি রেললাইনের দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল মাঠ ভেঙে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এবং নিতো তখন আরও সিকি মাইলের বেশি দক্ষিণে নদীর দিকে ক্রমশ ঢালু এবং জলা ধানভোক ক্ষেত্রে মধ্যে উন্মাদের মত ছুটোছুটি করে মিলিটে মিলিটে আরও দক্ষিণে নদীর কিমারার দিকে চলেছে।

তখনে পাছি— দাঁড়া রে—দাঁড়া রে— দাঁড়া রে।

ক্রমশ কঠস্বর দূরবর্তী হচ্ছে। এরপর নদীগতে, নয়তো ওই ব্রিজের মুখে দোতলা সমান উচু বাঁধে উঠে আছড়ে পড়বে। ওই ভুলো—সে তাকে নৃশংসভাবে ভুবিয়ে অথবা পাথরে আছড়ে মেরে নিঃশব্দে হাসবে।

মনে পড়ছিল এখানকার গল্প। চলিত গল্প এই যে বছকাল পূর্বে এই মাঠে একজন পাষণ বন্ধুর ছন্দবেশে একজনকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে মাঠের মধ্যে হত্যা করেছিল। তখন থেকে সেই খুন হওয়া মানুষটি এখনো ভুলো-ভুত হয়ে আছে। সুযোগ পেলেই আঝায় বা বন্ধুর বেশ ধরে অন্যমনক মানুষকে এমনি ভাবে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চেষ্টা করে। মনে পড়ল আমাদের থামের সুধীরবাবুকে ঠিক এমনি সঙ্কেবেলা তার দাদা সেজে এসে ডেকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অন্য মানুষের চোখে পড়েছিল—তাই বক্ষ পেয়েছিলেন; তারা তাঁকে ধরে

পড়েছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর অবশ্য জ্ঞান হয়ে আবার মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু কেউ না দেখলে হয়তো তাঁরও বিপদ ঘটত।

আরও অনেক ঘটনা। ঠিক ওই রেললাইনে একটা মাইলপোস্ট যেখানে পোতা খাই শ্রেষ্ঠানেই নাকি এই ভুলোর আঝা ঘুরে বেড়ায়। ওইখানেই নাকি তাকে যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

তাবছি—এমন সময় একজনকে পেলাম। সে শশী ডোম। আমাদের বানকার বিখ্যাত চোর। সব্বা ছিপছিপে মানুষ। শশী চুরির জন্যে জেল খেটেছে অনেকবার কিন্তু কেউ কখনও তাকে ধরতে পারেনি। তিনি হাত সামনে থেকে উঠলে মিলিটে তিনি হাত ব্যবধান সাত হাত হয়ে যায় এবং পাঁচ মিলিটে সেটা বেড়ে পুরুষ হাত এবং তারপরই সে মিলিয়ে যায়। এমন তার গতিবেগ। এমন সে দৌড়তে পারে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে এবং নদীর ব্রিজের ঠিক মুখটায় একটা অন্টাকে কেটে চলে গেছে। মনে হল, শশী যদি সেই দোড় দোড়ে যায় তাহলে নিতোর আগেই হয়তো ব্রিজের মুখটা আগলাতে পারে। নিতোকে যদি ভুলো নদীতে নিয়ে গিয়ে ফেলে তবে হাত নেই, কিন্তু যদি ব্রিজের বাঁধে তুলে পাথরে আছড়াতে চায় তবে হয়তো শশী তাকে রক্ষা করতে পারবে। নিতোকে ধরে ফেলতে পারবে।

শশীকে বললাম— শশী একবার চেষ্টা করতে পারিস। তুই একবার সেই দোড় দে না বাবা। নিয়ে দাঁড়া ব্রিজের উপর।

শশী বললে—যদি নদীতে যায়—

বললাম—তা হলে হাত নেই। তবু দেখ।

শশী ছুটল এবং শ্বাবণ মাসের মেঘাঞ্জন কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির মধ্যে মিলিট দু-তিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ছুটবার সময় শশীর হাঁটুতে মটমট শব্দ হত। সে কখনও কখনও পেলাম না।

পিছন পিছন আমি এবং আরও দু-তিন জন ছুটলাম। তখন আমার ফুটবল খেলা অভ্যেস ছিল। দোড়াতে আমিও পারতাম। বয়সও তখন তিরিশ-একত্রিশ।

ওদিকে মাঠের মধ্যে শ্বাবণের অক্ষকার রাত্রিতে জলো মাঠের মধ্যে কয়েকটা আলো ছুটোছুটি করছে, দিশাহারার মত ছুটছে, কখনও ডাইনে কখনও বাঁশে কখনও সোজা; আর তার সামনে এক বুক ফাটানো ডাক—দাঁড়া রে! দাঁড়া রে পাড়ে রে।

সম্মুখে তার ছুটেছে পাড়ের ছদ্মবেশী প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত ভুলো-ভুত। তাকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, দেখাচ্ছে শুধু ওই ভুলোর ছলনায় মোহগ্ন নিতো। দু-হাত বাঁধিয়ে সে ছুটেছে—তাকে ধরবে তাকে ধরবে। 'পাড়ে ভাই।' তার কাছে স্থান বিলুপ্ত কাল বিলুপ্ত সব বিলুপ্ত। কতগুলো আলো সে দেখতে পাচ্ছে না। এত ডাক সে উন্তে পাচ্ছে না। পায়ের তলায় কঁটা বিধছে, সে বুরাতে পারছে না। ভুলো ছলনায় তাকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সে হাঁফাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড

কেটে পড়তে চাইছে, স্থির চোখদুটো ইয়তো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে—তবু তার খামবার উপায় নেই। মুহূর্তে মুহূর্তে তার বন্ধুকে ধরবার ব্যাহতা উদ্বাম থেকে উদ্বামতর হয়ে উঠেছে। পরম বন্ধুর জ্বরবেশী প্রেত নিঃশব্দ হাসি হেসে বলছে—আয় আয় আয়! ওই নদীতে পাথরে বাঁপ খাব দুজনে। কিংবা আয় না ওই পুলের বাঁধের উপর দুজনে জাপটাজাপটি করে পড়ব পাথরের উপর। তারপর দুজনে বসে—হি—হি—কত মজা করব।

চুটছিলাম আর ভাবছিলাম। পাকা রাস্তাটা রেললাইনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমে দিকে বেকল—পূর্ব মুখ থেকে দক্ষিণ মুখে, সামনে দেড়শ' গজ দূরে লাইন আর রাস্তা একসঙ্গে মিশেছে। এরপর রাস্তাটা চলে গেছে রেললাইন ক্রস করে পুন দিকে। যদি ওইখানে—শৰী গিয়ে—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হল না। অঙ্ককার চিরে শৰীর ডাক উন্নাম—ধ-রে-ছি।

ধরেছে! শৰী ধরেছে আঁঁ!—আমরা আরও জোরে ছুটলাম। গিয়ে দেখলাম মানুষের কাছে ভুলো হয় হেরেছে নয় নিতোকে নিয়ে খানিকটা নিষ্ঠুর আমোদ করে বা এতগুলো মানুষের ব্যাহতা দেখে নদীতে না ডুবিয়ে ওই পুলের বাঁধের উপর তুলে শৰীর হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

আমরা যেতে যেতে যে আলোড়লো নিতোর পিছনে এতক্ষণ বার্থে ছোটাছুটি করেছে তারা এসে গেল। স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়াল।

আমরা পৌছে দেখলাম, শৰী নিতোকে ধরেছে। দশ বারোটা আলো তারদিকে তাকে ঘিরে রয়েছে। সর্বাঙ্গ জল কাদায় ভরা, তার সঙ্গে গভের চিহ—নিতো বসে আছে পাথরের মৃত্যির মত। তার চোখ দুটো স্থির, জ্বাফুলের মত রাঙ্গা। হাপরের মত হাঁফাছে। দৃষ্টি বিহুল : এবং নির্বাক। বোবা! লোকে ডাকছে—নিতো! নিতো! সে বোবা। ফ্যালফ্যাল করে আকাশে।

দেখতে দেখতে এল তার বাবা তার দাদা তার মা, ঝী।

তারা ডাকলে—নিতো বাবা! নিতো!

ভাই ডাকলে—নিতো রে, নিতো!

ঝী ডাকলে—ওগো! ওগো!

কিন্তু নিতো বোবা, নিতো কালা। সে বসে আছে সেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে। কাউকে সে চিনতে পারছে না। এবার এল সত্যকারের পাঁড়ে। নিতো রে নিতো।

নিতো তাকেও চিনলে না। সে সব ভুলে গিয়েছে।

নিতোর জ্ঞান—চেতনা ফিরল অস্তুতভাবে। তাকে ধরে নিয়ে আসা হল বাড়িতে। নির্বাক বিহুল নিতো যান্ত্রের পুতুলের মত এল। আমি ডাজার দেখাবার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু তাদের বাড়ির দোরে এসে দরজার সামনে দাঢ়িয়ে দেখে সে ভয়াত্ত চিন্কার করে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পর চোখে মুখে জল সিখনের ফলে তার জ্ঞান ফিরল।

তার মা ডাকলে—নিতো।

এবার নিতো সাড়া দিলে—অ্যা। তারপর বলে—পাঁড়ে? পাঁড়ে কোথায়?

পাঁড়ে সামনে এসে বললে—এই বে! আমি তো ঘরেই রইছি বে। তু এমন করে চুটছিলি ক্যানে?

বিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে দেখে বলে—তাহলে সে কি? অবিকল তোর মত। বসেই শিউরে উঠে চোখ বুজল।

অনেকক্ষণ পর বললে—বাবুর কাছে পয়সা নিয়ে আমি গেলাম পানু সহিসের পাঁড়ি। মনে করলাম তু সেখানে গিয়ে জমে গিয়েছিস। তা দেখলাম সেখানে তু মাস নাই। তখন দু-চোক মদ থেকে রেললাইন ধরে আসছি। মুখ আঁধার হয়েছে, তোর কথাই ভাবছি এমন সময় ওই মাইলের কাছে পাথরের ওপরে দেখলাম ত সমে রইছিস। আমি বললাম—পাঁড়ে। তা সে ঠিক তু—সে এসে আমাকে বললে—শালা মজার, ভারি মজার—আয়।

বললাম—কোথা?

তা আমাকে লাথি মেরে বললে—আয় ক্যানে শালা। ভারি মজা হবে। বলে, লাইল থেকে বাঁপিয়ে নেমে ছুটতে লাগল। আমি বললাম, দাঁড়া দাঁড়া। তা সে দিহি করে হেসে—বললে, আয় শালা আয়—কী ছুট ছুটল। আমিও ছুটলাম। দাঁড়া রে দাঁড়া রে।

থামলো নিতো। বললে—এক গেলাস জল খাব।

তার বাবা বললে—বাবা ভুলোতে ধরেছিল বাবা! খুব বেঁচেছিস বে। ওই নিমচ্চের জোলের ভুলো।

নিতো শিউরে উঠল।

পাঁতেরা শুলে বলেন—ভুলো তো ভুত নয়। প্রেতও নয়। ভুলো ভুল। নিতোরই মনের ভুল। মদের নেশার মধ্যে শুধু পাঁড়ের কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল; তার মন থেকে বেরিয়ে এসেছিল পাঁড়ের একটা কঞ্জনায় গড়া ছবি। সে যত তাকে ধরবার জন্যে ছুটেছে তত ছবিটাও ছুটেছে। তবে উল্লাঙ্ঘনের মত নিতো ছুটেছে। ভুলে গেছে সব কিছু।

আমিও ভেবেছি। যুক্তি তাইই বলে। মনের কঞ্জনা। যা একাগ্র মনে ভাবে মানুষ, তা ঘুমের ঘোরে নেশার ঘোরে, এমনকি চিঞ্চা যদি খুব গভীর হয় তবে এই ভাবেই মানুষ ভুল দেখে। ভুল শোনে। এ ভুল মনই করায়।

তোমরা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে এই ভাবে পথ হেঁটে না একলা অঙ্ককারে। বাহ্যজ্ঞান হারিয়ো না।

এ কথার পরেও কিন্তু আমার এই নিমচ্চের জোলের ভুলো-প্রেত সম্পর্কে সংশয় যায়নি। মনে পড়ে এই মাঠে এই জায়গাতেই অনেক মানুষ এমনি ভুল করেছে। এই ঘটনার বছরখানেক পরে আমি দেখেছিলাম একজনকে। এমনি করেই মাইল খানেক পথ হেঁটেছিলাম। সে অন্য কাহিনী। এবং কে যেন বলে মানুষের হিংসা মানুষের পাপ নির্দেশ মানুষকে হত্যা করে। প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেত করেছে—সে যুগান্ত ধরে এমনি করেই সুযোগ পেলে ভুলিয়ে নিয়ে ছুটবে—নদীর দিকে, পাথরের দিকে, পুকুরের গভীর জলের দিকে আর অট হেসে বলবে—আয়-আয়-আয়—হি-হি-হি—আয়। কেমন মজা দেখ।

তারানাথ তাত্ত্বিকের গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাত্তায় পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া
বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে,
এখানে কি ? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম
শোনলি ? মন্ত বড় শুণী।

হাত দেখালোর বৌক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও
দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি ? যা বলে তা সত্য হয় ?
আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে ? ভবিষ্যাতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে ? দু-টাকা বেবে, তোমার হাত
দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা
বাড়ির গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। এইশাস্ত্রে
কবচ তঙ্গোজ মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার
করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে।

দশলী নামমাত্র।
বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বললাম—সোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার উক্ত তার এই
বাড়ি ?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া
উঠিল—কে ? www.banglabookpdf.blogspot.com

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ি আছেন ?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোনো উন্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা
খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উকি মারিয়া আমাদের দিকে সর্কিফ ঢেকে
খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন ?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।
কিছুক্ষণ কাহারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে
দিনাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার
বা মা দেখতে। এবার ভেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন
ভেতরে। www.banglabookpdf.blogspot.com

ছোট একটা ঘরে ভঙ্গপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের
দরজা চেলিয়া একজন বৃক্ষ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঢ়াইয়া হাত জোড়
করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—গণ্ডিমশায় আসুন।

বৃক্ষের বয়স ষাট-বাহটির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও
গাঁথের রঙের জোপুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে
শূর্ততা ও বৃদ্ধিমত্তা মেশালো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। চোখ দুটি
বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে
পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে
আক্ষপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুণ্ঠিত
রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিষ্কৃট। অর্ধাং ঘৃতটা ভরসা লইয়া
জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই
ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিছি হাত দেখাইলাম।

বৃক্ষ নিবিটিমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—
আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক ? আপনার বিবাহ
হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, এ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক ? কিন্তু জন্মামে বিয়ে তো
হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখিলি। কথাটা খুব ঠিক।
বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের
দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটা গোলমাল হইয়াছিল।
তারানাথ জ্যোতিষী নিচ্যাই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই,
আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের,
তাও এক ত্রিজ খেলার আভদ্রায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোনো
অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃক্ষ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর
বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে
গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মন্ত বড়
ফাড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু কষতা
আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট
যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু
ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন

আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রায় হইতে নমিবার সময় পাঁচখালা নোটস্যু মানিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধহয় ধট.-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে ? এটুকু বোধহয় ধাক্কা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো মন দুরো শুধু মিছি মিছি কথাই বলে না।

আমার সবচেয়ে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শুন্দা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আজ্ঞা দিতে।

লোকটার বড় অস্তুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তাত্ত্বিক শুরু সাক্ষাৎ পায়। তাত্ত্বিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তার কাছে কিছুদিন তত্ত্বসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারিবার খুলিল এবং শুরুদণ্ড ক্ষমতা তাঙ্গাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মাকেট, ঘোড়দৌড়, ফাটক ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্ৰই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটোর গাড়ির ভিত্তে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজ্ঞ। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঢ়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি লেশা ছিল প্রথম—ঘোড়দৌড়, নাচী ও সুরা। এই তিনি দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর মূলাঙ্গ যথাসর্বত্ব আহতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণ্ডকার ব্রাহ্মণমাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পুরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাচুক্রও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সৃত্যকার পদ্মার নষ্ট হইল। তবু ধৃততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ উপরাজির কোনোটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খালিকটা পদ্মার বজায় রাখিতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তত্ত্ব বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই ?

আমার মতো গুগমুখ ভজ্জ তারানাথ পদ্মার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিখ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখাবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি

এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দুর্দশন করতে চাও ? চন্দুর্দশন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে বান জোর করে চেপে চিত হয়ে ওয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যস করলেই চন্দুর্দশন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই বলে দেবে। ভালো ক'রে চন্দুর্দশন যে অভ্যস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দুর্দশন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এখন সব অস্তুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোলা তো যাইয়ি না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনোদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোটি কাগজের পুঁথির পাতা উলটাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—‘চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন, দেখা করে আসি। খুব ভালো তাত্ত্বিক শুনেছি।’ তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তাত্ত্বিক হয়, তবে তারানাথ সব কয় ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাট। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোনো একটা গক্কের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুম্মাল আছে ? বার করে দেখ।

রুম্মাল বার করিয়া দেবি তাহাতে বেলফুলের গক্ক ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ধরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুম্মালখনাতে আমার নামও লেখা সুতরাং—হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদো নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তাত্ত্বিকশক্তির সাহায্যেই আমার রুম্মালে গক্কের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবু এত কষ্ট করিয়া তত্ত্বসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঢ়ায়, সে সাধনার আমি কোলো মূল্য দিই না। আতর তো বাজারেও কিমিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তত্ত্বসাধন করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মহুর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুম্মালে যে বেলফুলের গক্ক চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাও বৈজ্ঞানিক অসম্ভব্যতা রহিয়াছে contact at a distance—এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপনটিজম, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার

উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহা সামন্ধি হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপনটিজমের প্রভাব অস্তুগ্র রহিয়াছে, তে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক ওরষ্টর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবু তো সত্যিকার তান্ত্রিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তত্ত্ব এক ধরনের আদু, যাকে তোমরা বলো ঝ্যাকম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চৰ্চা দে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গুরু আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক দেখেছি, তন্মে পরে বিশ্বাস করলে না। একজনকে জানত্ম সে বিষ খেরে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছে। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও দেঁচে গেল, জিতে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তত্ত্বচর্চার শক্তি ঝ্যাকম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অঙ্গু শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান ? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুঁটিমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গঁথ করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—তুই তোখের মাঝখানে ভুক্ত একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম— চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিঞ্জাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছি আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘট্টোখানেক চেয়ে থাকতাম—সব দিন ঘটে উঠত না, হঞ্চার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাসতিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিঙ্গিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক শামনে খুব ছিল, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও মোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টৈকে না। ঠাকুরমার বাস্তু ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাস্তুর ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমঙ্গু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সামা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে থাসা বাঁলায় বললেন— বাবাজীর বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রঞ্জপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রঞ্জপুর ? তারপর কি যেন রাজা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রঞ্জপুরের রামকৃপ সান্ন্যালের নাম শনেছ ? তাদের বংশে এখন কে জানে জান ?

আমাদের আমে সন্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-বাড়ি, সন্ন্যাল হাতি বাঁধা থাকতো শনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। খুব খারাপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শনিনি ! সন্ন্যাসীকে সমন্বয়ে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি হ'লো! পেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো ?

খেয়াঘাট ! রঞ্জপুরে নদীই নেই, মজে গিরেছে কোন কালো, এখন তার ওপর নিয়ে মানুষ-গুরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বছ জাতিন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শনেছি সান্ন্যালদেরই জানে পূর্বপুরুষ, ত্রি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন ?

বিখ্যাতের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন দেখছি ?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি খুব মেহময় বৃক্ষ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরাণ, অবোধ পৌত্রের কোনো ছেলেমানুষির কথার জন্য। সত্য বলছি, সে হাসির শৃঙ্খল আমি এখনও ভুলতে পারিনি, খুব উচু না হ'লে আমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সন্মেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস কেন ? ধর্মকর্ম করবি বলে ?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম কিছু করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেল না, কিছু হবে না কেন ? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-নাপের মনে কষ্ট দিস্ত নে।

কথা শেয় ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেল না ? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমি নাহোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খালিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস ?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সন্মেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোনো লাভ হবে না।

তোকে সৎসার করতেই হবে। তোর সাধা নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে
যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সৎসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আবার
ইচ্ছাসহ্রেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুগুলি
পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি গেই। বুরতে পারলুম না কোনু শালিব
মধ্যে তিনি চুকে পড়েছেন বা কোনু দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গমে বাঁলে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃক্ষ
লোকদের কাছে বৌজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোনো ইদিশ মেলাতে পারলুম
না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছেকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের
এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেসন নিয়ে সেনার
শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশঁস্তি করতে তিনি
বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা বাতা
দেখেছি, তাতে আমার বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের এ
সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী
যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে
রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ
ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সৎসারে তিনি বড়
একটা লিঙ্গ ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই
অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে
ফেরেননি। অন্তত দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—এই শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেঁৰাঙ্গা জায়গায়
কেন?

—আ নয়। ওখানে তখন বহুতা নদী ছিল। খুব স্নোত ছিল। বড় বড় কিন্তু
চলত। কোনো নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে বাঁলে ওর
নাম লা-ভাঙ্গার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট!

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যা, জ্যাঠামশায়ের মুখে
শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙ্গার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব
কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে
বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই।
কোনো অন্তু যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের
এক গ্রামে শুল্লাম সেখানকার শুশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড়

খালীক সন্ন্যাসীনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শুশানে। ছেঁড়া
ঝাঁটা কাঁধা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই
গালিম জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো
এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে?

ওর আলুখালু বিকট মলিন চেহারা দেখে ঘনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে
মাত্র কঢ়ে চেপে বললাম মা, আমাকে আগন্তুর শিশা ক'রে নিন, অনেক দূর
থেকে এসেছি, দয়া করুন আবার উপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—গালা
এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শুশান, তবু হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—
পাপল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার
প্রদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি?

বললাম, মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাধি। বললে—ফের যদি আসিস তবে
বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে ওয়ে তবে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। এ
এক পাগলের পাণ্ডুয়া পড়ে আগটা যাবে দেখছি কোন্দিন।

শেষ রাত্রে খপ্প দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে
চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাধিটা খুব লেগেছে
না বৈ? তা রাগ করিস নে, কাল যাস আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার
গেলাম। ওয়া, খপ্প-টপ্প সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমূর্তি হয়ে শুশানের
একখানা পোড়াকাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি,
বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন বল্পে? তুমিই তো
আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম বল্পে। তোর
মুণ্ড চিবিয়ে থেকে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অন্তুতভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি
বুন্দাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যাতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান
করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে
টানছে।

হঠাত সে বললে—বোস এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন

শুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্তৃর মতো—তার সে হকুম পালন না ক'রে যে
উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস বল তো? তোর দ্বারা কি হলে,
কিছু হবে না। তোর সৎসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই
থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছ কিছু খাবি? আমার এখানে যখন
এসেছিস, তার ওপর আবার বাধুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার? বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতুহল হ'ল। এর আগে
লোকের মুখে উনে এসেছি, যা চাঞ্চল্য যায় সাধু-সন্ধ্যাসীরা এনে দিতে পারে।
কলকাতার গুরুবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য
ব'লে মনে হয়নি। বললাম—খাব অম্ভি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান
কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শাশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা
পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক! ইত্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি
এরকম অসম্ভব হাসি হেসে বললে—খা—খা ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোনো কান্দজান নেই, এর
কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর
ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা
থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিণী, বিশ্বাদ চিতার কয়লার টুকরো
মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে
এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বক্ষ উন্মাদ, পাড়াগায়ের ভূতের
সাধু বলে নাম বটিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা?
পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শাশানে আমার কাছে? দূর হ
জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও
কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে
উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে
বপ্পে দেখলাম, আমার শিয়ারের দিকে দাঁড়িয়ে হসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস
নে। আসিস আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে হপ্পে দেখেছিলাম, না জাহ্নত
অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যান্তু করলে
না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মৃতি তারী প্রসন্ন। বললে— আবার

বললাম দেখছি। আচ্ছ নাহোড়বান্দা তো তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচছে আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে
বিমেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ বকম হয়রান ক'রে তোমার
পাশ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি?
বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা
ব্যাক প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল। গলা
চিপে মেরে ফেল। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে
হবে। মিহর ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-
হোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে
মখম, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-হোলা ভাজা দিবি। তোর
মাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে। রাজে হয়ত অনেক
বকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয়
ক'রিবা না। ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত ছারাতে পার। কেমন
হাঁজি?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা উনে তো অবাক হয়ে
গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর
ত্রিমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেঁগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো,
দূর হ—

আরও নানা বকম অশ্বীল গ্যালাগাল দিলো। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড়
ঝারাপ। আমি আজকাল ওঞ্জলো আর তত গায়ে মাথি নে, গা-সওয়া হয়ে
গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি
না অন্দরোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্র লোকের ছেলে। ভদ্র
লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস কেন ত্রি, ও অলপেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-
মন্ত্রের সাধনা ভদ্র লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে
হোসে ঢাকবি কর গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না।
আমি যখন ফাসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বক্ষ উন্মাদ। এব কাছে
এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুধু সংকৃত শ্বেত শুনেছি, তন্ত্রের কথা
ওনেছি। সময়ে সময়ে সত্যাই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুরী ব'লে সন্দেহ হয়।
সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম,

তখন আপনিই তেকে বললে—আমার রাগ হ'ল আর জ্ঞান থাকে না, তোকেও
ওবেলা পালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা
করতে চান্ত নি। ও সব নিম-তত্ত্বের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি থা-
হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা বকল
জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে
চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম থাণ্ডা
আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিছু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না।
তত্ত্বে এদের ডাকিনী, শৌখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ
ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলিমান ফকিরেরা এদের জিম
বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তত্ত্বসাধনার বলে এদের দশ করা
যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই।
কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাধারণ তুমি যদি হয়েছ,
তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শনি নি। এর
মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক
অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গোম শুশান, একটা বড় তেতুলগাছ আর এক
দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকঢ়ালা আর
একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনোদিকে সোকজন নেই।
অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অস্তুত ধরনের কথা।

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তত্ত্বে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি
ভয়নক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মাঝা ব'লে পদার্থ নেই
তাদের। পশুর মতো মন। কিছু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন
প্রেতলোকের বাষ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি
দুঃসাহস, এমন তাঙ্গিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই
ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে
নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুবিস নে, তাই রাগ করিস।

কৌতুহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাই'লে
হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর পশু করলাম না, বুবলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে
না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

পরদিন আমের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে।
বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়নক মানুষ, ওর

মনে এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে
বেলি ধাটাবেল না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘৰে না। বিদেশী লোক
মানা পাইবেল শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না
গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেল না। একদিন সক্ষেত্রে পরে
পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে শিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর
নেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ঘোড়শী বালিকা গাছের
পাতাতে টেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভূল নয় মশায়, আমার
তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপঝা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?
দু-এক পা এগিয়ে সক্ষেত্রের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায়
গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বলল—আ মরণ, কে তার নামটাই বল
না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার
ভঙ্গি। এই ঘোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে। সে এক আস্তুত
আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ঘোড়শী
বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ'লে পড়ে আর কি। বললে—এসো না, বস না এসে পাশে-
লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এসো—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে
হ'ল না— তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোনো বিপদে
ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কল্পের ভাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম,
দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব
না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এসো, বস।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলো কেন? তোমার মতলবখানা
কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল ব'কছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোনো ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা বলে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন তবে। তুই সে-রকম নস। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অতি সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেয়, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগগির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা বলে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনো কালেই, তবু কখনও মড়ার উপর বসে সাধনা করব এ-কলনাও করিনি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর অস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্দেয়ের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি মুপি এসো।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমণ্ড শেকড়ের মধ্যে একটা মোল-সতের বছরের যেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধহয়।

ও বললে, তোল মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। একে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না; আর চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর বসে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাব নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাত আশ্চর্য হয়ে চিন্কার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোনো তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেচিয়ে মরছিস কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সঙ্গে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সন্ধে সব কথা তোমায় বলবাবও নয়। সন্ধের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্ধশূলা মন্ত্র

আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, তাতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোনো বিভাষিকা দেখ, তবে তা পোয়া না। ভয় পেলেই মরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শাশান, কেউ কোনো দিকে নেই, নৌকা জনকার দিগবিদিক দুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাত এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাঢ় বোপের দাঢ়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শাশানে একটা চাটকা মড়ার ওপর বসে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার হচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে বলে কোনো স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকন সঙ্গে আমার মনে হ'ল শাশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্লবংসী বৌ, মুখে ষোমটা টানা, ভল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় যিরে দাঢ়াল—আমি একমানে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব করুণা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যাখেছে হয়। দু-পায়ে গঞ্জির ভাবে ইটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল। হরি হরি। পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেঘেগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিঁসে হয়ে ভমে দেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্লবংসী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ষোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে.... আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরককাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বায়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঢ়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাতের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় বোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেকে আছে। তাদের মুখও মানাদিকে ফেরানো—দাঢ়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঢ় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে গোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই

ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধৰা হাড়ের রাশি খৃপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তাৰা যেন সবাই সংজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শৃশান থেকে পালাতে না পাবি। হাড়ের হাত মাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমায় পল্প টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাৰছি, এমন সময় দেখি আমাৰ সামনে এক অতি ঝুপসী বালিকা আমাৰ পথ আগলৈ হাসিমুখে দাঢ়িয়ে। এ আৰাৰ কে? যা হোৱা সব রকম বাপারেৰ জন্যে আজ প্ৰস্তুত না হয়ে আৱ শবসাধনা কৰতে লাগি নি। আমি কিছু বলবাৰ আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ঘোড়শী মহাবিদ্যাদেৱ মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ, আমাৰ তোমাৰ পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যাৰ নাম উনেছিলাম বটে পাগলীয় কাছে, কিন্তু তাদেৱ তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'ৰেও দেখা মেলে না, আৱ এত সহজে ইনি....বললাম—আমাৰ মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন....আমাৰ জীবন ধনা হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাভাগীৰ সাধনা কৰছ কেন?

—আজে, আমি তো জানি নে কোনু সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি কৰাছি।

—বেশ, মহাভাগীৰ সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্ৰ জপ ক'ৰো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমাৰ আৱ কিছুতে দৱকাৰ নেই। তুমি মহাভাগীৰ তৈৱৰীকে দেখ নি—অতি বিকট তাৱ চেহাৰা... তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্ৰ।

সাহসে ভৱ ক'ৰে বললাম—সাধনা ক'ৰে আপনাদেৱ আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলোন কেন?

—তোমাৰ সন্দেহ হচ্ছে?

আমাৰ মনে হ'ল, এই মুখ আমি আপে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমাৰ মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক কৰতে পাৰলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশৰ্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।....যদি অপৱাধ কৰি মাপ কৰসন, কিন্তু কথাটাৰ জৰাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাভাগীৰকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লৈ আৱ চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস কৰাছ? দিবোঁঘ পথেৱ নাম শোন নি তঙ্গে? পায়ওদলনেৱ জন্যে ঐ পথে আমাৰা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমাৰ মন্ত্ৰ দিবোঁঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই চুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুবাতে পাৰলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পায়ও?

বালিকা খিলখিল কৰে হেসে উঠল।

বললে—তোমাৰ বেলা এসেছি সপ্রদায় রক্ষাৰ জন্যে....অত ভয় কিনেৱ।

আম না তোকে দাথি মেৰেছি? শৃশানেৱ পোড়া কাঠ ছুড়ে মেৰেছি। তোকে লাগিব না ক'ৰে কি সাধনাৰ নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশৰ্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আৰাব বললে—কিন্তু মহাভাগীৰ বড় ভৌমণ রূপ, তোৱ যেমন ভয়, সে তুই পাৰবি লে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহেৱ উপৰ বসে আছি, তাৱ দিকে আমাৰ নজৰ পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিশ্বে আমাৰ সৰ্বশৰীৰ কেমন হয়ে গেল!

শবদেহেৱ সঙ্গে সম্মুখেৱ মোড়শী ঝুপসীৰ চেহাৰাৰ কোনো তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই রয়েস।

বালিকা ব্যাসেৱ হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখিলু কি?

আমি কথার কোনো উভৰ দিলাম না। কিন্তু ক্ষম থোকে একটা সন্দেহ আমাৰ মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্ৰকাশ ক'ৰে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শৃশানেৱ পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপেৱ হাসিতে রাত্ৰিৰ অঙ্ককাৰ চিৰে ফেড়ে চৌচিৰ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠিময় নৱকক্ষাল হাড়েৱ হাতে তালি দিতে দিতে একেবৰেকে উদ্বায় নৃত্য শুৰু কৰলে। আৱ অমনি সেগুলো নাচেৱ বেগে ভেঙে পড়তে লাগল। কোনো কঢ়ালেৱ হাত বসে গেল, কোনোটাৰ মেৰদও, কোনোটাৰ কপালেৱ হাড়, কোনোটাৰ বুকেৱ পাঁজুৱাণ্গুলো—তবু তাদেৱ নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়েৱ রাশি উঠু হয়ে উঠল, আৱ হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক ঠক শব্দ!

হঠাৎ আকাশেৱ এক প্ৰান্ত যেন জড়িয়ে গেল কাগজেৱ মতো, আৱ সেই ছিদ্ৰপথে যেন এক বিকটমূৰ্তি নারী উন্মাদিলীৰ মতো আলুথালু বেশে মেমে আসছে দেবলাম। সঙ্গে সঙ্গে চাৰ পাশেৱ বলে শেয়ালেৱ দল আৰাব ডেকে উঠল, বিশ্বি মড়া পচার দুৰ্গকে চাৰদিক পূৰ্ণ হ'ল, পেছনেৱ আকাশটা আগন্মেৱ মতো রাঙ্গা-মেঘে ছেয়ে গেল, তাৱ নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীৰ বাত্ৰে! শেয়ালেৱ চিৎকাৰ ও নৱকক্ষালেৱ ঢোকাটুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিষ্ঠক, সৃষ্টি নিয়ুক্ত।

আমাৰ গা শিউৱে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমাৰ দিকেই যেন ছুটে আসছে! তাৱ আগন্মেৱ ভাট্টাৰ মতো জুলন্ত দুচোখ ঘৃণা, নিষ্ঠৰতা ও বিদ্রূপ মেশালো, সে কি ভীষণ কুৰ দৃষ্টি! সে পৃতিগ্ৰহ, সে শেয়ালেৱ ভাক, সে আগন্মেৱ রাঙ্গা মেঘেৱ সঙ্গে পিশাচীৰ সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্য—সকলেই তাৱা আমায় নিষ্ঠুৰ ভাবে হত্যা কৰতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিন্কার করে কেন্দে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ বাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শুশানে। ছাঁপান্ন বছর... কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসল ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুরে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধহয় অঙ্গান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে... সেই বটতলায় আমি আম পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোৰা গিয়েছে। আসল ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও বিমবিম করছে।

বলজুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব ইঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনায় বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস না, শ্রীষ্ঠোড়শী সাক্ষাৎ বৃক্ষশক্তি।

‘এবং দেবী ত্যক্তী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।’

ক’হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রাক্ট হন না। ক’হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই তার জ্ঞানিস্থ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিক্ষণ্ডনে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল— কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস, তিনি মহাডামৰী মহাত্মেরী—তুই তার তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসল ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপরে সে হঠাত হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বৌদ্ধর কোথাকার। উনি দেখা পাবেন তৈরবীদের। আমি যাদের নাম মুখে আলতে সাহস করি নে—ইঁকিনীদের নিয়ে কাবরার করি। ওরে অলঝেয়ে, তোকে ভেক্সি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসল ছেড়ে এলি? এই তো সবে সঙ্গো—!

—আঁঝা!

আমার চমক ভাঙ্গল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সঙ্গ।

হা-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল—ছ-টায়। আঘাত মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙ্গায় তোলা, শবসাধনা, নরকদ্বাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিলশকুনির বাঁক—সব আমার ভয়!

হতভয়ের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মধ্যে এত ভয় দেখালে? www.banglabookpdf.blogspot.com

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয়, তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনোদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেক্সি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুৰাবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামৰী, ত্রিপুরা, এবং মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীকূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ-জন্মেও গেল। ওরুম দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিন্তু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনোদিন।

তখন আমি চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন বে চিরজন্ম শুশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত— তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুৰাবে? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এসো চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা ওরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

ମାର୍ଗା

দু'বছর আগের কথা বলি। এখনে অঙ্গ অঙ্গ যেন মনে পড়ে। সব ভুল হয়ে যায়। কি করে এলাম এখানে! বগুলা থেকে বাস্তা চলে গেল সিদ্ধান্তির দিকে। চলি সেই বাস্তা ধরেই। রোধনী বায়ুনের চাকরিটিকু ছিল অনেক দিনের, আজ তা গেল।

যাক, তাতে কোনো দুঃখ নেই, দুঃখ এই, অবিচারে ঢাকিয়িটা গেল। যি চুরি
আমি করিনি, কে করেচে আমি জানিও না, অথচ বাবুদের বিচারে আমি দোষী
সাব্যস্ত হলাম। শান্তিপাড়া, সর্বে, বেজেরভাঙ্গা পার হতে বেলা দুপুর ঘুরে গেল।
খিদেও বেশ পেয়েচে। জোয়ান বয়স, হাতে সামান্য কিছু পত্রসা থাকলোও খাবার
দোকান এ পর্যন্ত এসে আজ পাড়াগাঁয়ে ঢোকে পড়ল না।

ରାତ୍ରାର ଏକ ଜୀଯଗାୟ ଭାରି ଚମର୍କାର ଏକଟା ପୁକୁର । ଶ୍ଵାନ କରନ୍ତେ ଆମି ଚିରକାଳେ ଭାଲୋରାସି । ପୁକୁରେର ଭାଙ୍ଗ ସାଠେ କାପଡ ନାମିଯେ ରେଖେ ଜଳେ ନାମଲାମ । ଜଳେ ଅନେକ ପାନୀ-ଶେଷଜୀ, ସେଷଲୋ ସରିଯେ ପରିହାର ଭାଲେ ଆମ ଭରେ ଡୁବ ଦିଲାମ । ବୈଶାଖେର ଶେଷ, ଗରମ ଓ ବେଶ ପଡ଼ୁଛେ, ଶ୍ଵାନ କରେ ସତି ଭାରି ଭୁଣି ହୋଲ । ପୁକୁରେର ଧାରେ ଏକଟା ତେତୁଳଗାଛେ ଭାଲେ ଭିଜେ କାପଡ ରୋଦେ ଦିଲାମ । ଶରୀର ଠାଙ୍ଗ ହୋଲ କିନ୍ତୁ ପେଟ ସମାନେ ଜୁଲାଛେ । ଏ ସମୟ କୋଣୋ ବଲେର ଫଳ ନେଇ ? ଚୋରେ ତୋ ପଡ଼େ ନା, ଯେଦିକେ ଚାଇ ।

www.BanglaBookPat.blogspot.com
এমন সময় একজন বুড়ো গোক পুরুষটাতে নাইতে আসতে দেখা গেল।
আমাকে দেখে বললে— বাড়ি কোথায় ?

আমি বললাম,—আমি গৱীব ত্রাসণ, চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপ্যাততঃ বড় খিদে পেয়েচে, খাবো কোথায়, আপনি কি সদ্বান দিতে পারেন?

বুড়ো লোকটি বললে— রোসো, নেয়ে নি—সব ঠিক করে দিচ্ছি!

শ্বান সেৱে উঠে লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমের মধ্যে চুকে জঙ্গলে ঘোৱা
একটা পুরোলো বাড়িতে চুকলো। কললে—আমাৰ নাম নিৰাবৰণ চত্ৰবৰ্তী। এ
বাড়ি আমাৰ, কিন্তু আমি এখানে থাকিলৈ। কলকাতায় আমাৰ ছেলেৰা ব্যবসা
কৰে, শ্যামবাজারে ওদেৱ বাসা। এত বড় বাড়ি পড়ে আছে আৱ সেখানে মাত্ৰ
তিনখানা ঘৰে আমৱা থাকি। কি কষ্ট বলো দিকি! আমি মাসে মাসে একবাৰ
আসি, বাড়ি দেখাওনো কৰি। ছেলেৰা ম্যালেরিয়াৰ ভয়ে আসতে চায় না। মন্ত্ৰ

गांगा आहे बाडीचे पेचले। ताते सब-रक्कम कलेऱ्या गाठ आहे—वारो भूते खाय। तमि एखाने थाकवे?

বলভাগ—খারাতে পারি

—କି କାଜ କରାତେ ?

—ରୀଧୁନୀରୁ କାଜି ।

—५८ कृष्ण

—খুব ভালো।
আমি রাজি হয়ে যেতে লোকটা হঠাৎ যেন ভারী খুশী হোল। আমার খাওয়ার
ব্যবস্থা করে দিলে তখনি। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমাকে একটা পুরোনো মাদুর
আর একটা মোটা তাকিয়া বালিশ দিয়ে বললে—বিশ্রাম করো।

পথ হেটে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যুগিয়ে ঘখন উঠলাম, বেলা তখন
নেই। বাঞ্ছা রোদ বড় বড় গাছপালার উচু ডালে। এবি মধ্যে বাড়ির পেছনের
জঙ্গলে শেরালের ডাক শুন্দ হোল। আমি বাড়ির বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক
খালিকটা ঘূরে বেড়ালাম। যেদিকে চাই, সেদিকেই পুরোনো আম-কঁঠালের বন
আর জঙ্গল। কোনো লোকের বাড়ি নজরে পড়লো না। জঙ্গলের মধ্যে একস্থানে
কেবল একটা ভাঞ্ছা দেউল দেখতে পেলাম। তার মধ্যে উকি মেরে দেখি, ওধু
চামচিকের আড়ত।

ফিরে এসে দেখি, বুড়ো নিবারণ চক্ষি বসে তামাক খাচ্ছে! আমায়
বললে—চা করতে জালো? একটু চা করো। চিড়ে ভাজো। তেল-পুন মেখে
কাচালদ্বা দিয়ে খাওয়া যাবে।

সন্ধ্যার পর বললে—ভাত চড়িয়ে দাও। সরু আতপ আছে, গাওয়া ধি আছে,
আল ভাতে ভাত,—ব্যাস!

—যে আছে! www.banglابookpdf.blogspot.com

—তোমার জন্মে বিশেষে একটা তরুকারি করে নিও। বিশেষে আছে গান্ধারীর পেছনে। আলো হাতে নিয়ে তুলে আনো এইবেলা। আর একটা কথা—গান্ধারীর সর্বদা আগো জেলে রাখবে।

—তা তো বাখতেই হবে, অন্দরে কি রান্না করা যাব।

—ହୀ ତାଇ ବଲ୍ଚି

মন্তব্য করে আসে। ওপরে নীচে বোধ হয় চোল-পনেরোখানা ঘৰ। এছাড়া টানা বারান্দা। দু-চারখানা ছাড়া অন্য সব ঘরে তালি দেওয়া। রান্নাখণ্ডের সামনে মন্তব্য করা হয়। লম্বা রোয়াক, গোয়াকের ও-মুড়োয় চার-পাঁচটা নারকেল পাছ আৰ একটা বড় লম্বা রোয়াক, গোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে বাতাবি লেবুৰ পাছ। কিংতু তুলতে হোলে এই লম্বা রোয়াকের ও-মুড়োয় গিয়ে আমায়া উঠানে নামতে হবে, তাৰপৰ ধূৰে রান্নাখণ্ডের পেছন দিকে যেতে হবে তখনো সম্পূর্ণ অক্ষকাৰ হয়নি, আলোৱ দৱকাৰ নেই ভেবে আমি এমনি শুধুহাতেই বিশ্বে তুলতে গেলাম।

বাবাৎ, কি আগাছার জঙ্গল রান্নাঘরের পেছনে! বুনো বিংশে গাছ, যাকে এটো গাছ বলে। অর্থাৎ এমনি বীজ পড়ে যে গাছ হয় তাই। অনেক বিংশে ফলেচে দেখে বেছে বেছে কচি বিংশে তুলতে লাগলাম। হঠাৎ আমার চোখ পড়লো, একটি বৌমতো কে মেয়েছেলে আমার সামলাসামনি হাত দশেক দূরে বোপের মধ্যে নীচ হয়ে আবাধোমটা দিয়ে আমারই মতো বিংশে তুলচে! দুবার আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম, তারপর পেছন ফিরে সাত-আটটা কচি বিংশে তুলে নিয়ে চলে আসবার সময় আর একবার চেয়ে দেখলাম। দেখি, বৌটি তখনো বিংশে তুলচে।

—আজ্জে হ্যাঁ, অনেক বিংশে হয়ে আছে। আর একজন কে তুলছিল।

নিবারণ নিশ্চয়ের সুরে বগালে—কোথায়?

—ওই রান্নাঘরের পেছনে। বেশী জঙ্গলের দিকে।

—পুরুষ মানুষ?

—না, একটি বৌ।

নিবারণ চক্রতির মুখ কেমন হয়ে গেল। বললে—কোথায় বৌ? চলো দিকি দেখি।

আমি ওকে সঙ্গে করে রান্নাঘরের পেছনে দেখতে গিয়ে দেখি, কিছুই না।

নিবারণ বললে—কৈ বৌ?

—ওই তো ওখানে ছিল, ও বোপটার কাছে।

—হঃ, যতো সব! চলো, চলো। দিনদুপুরে বৌ দেখলে অমনি!

আমি একটু আশ্চর্য হোলাম। যদি একজন পাড়াগাঁয়ের বৌ-বী দুটো জংলী বিংশে তুলতে এসেই যাকে, তবে তাতে এত যাঞ্চা হবার কি আছে ভেবে পাই নে! তাছাড়া আজ না হয় উনি এখানে আছেন, কাল যখন কলকাতায় চলে যাবেন, তখন বুনো বিংশে কে চৌকি দেবে?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর চক্রতি-বুড়ো আবার সেই বিংশে চুরির কথা তুললে। বললে—আলো নিয়ে যাওনি কেন বিংশে তুলতে? তোমায় আমি আলো হাতে নিয়ে যেতে বলেছিলাম, মনে আছে? কেন তা যাওনি?

আমি বুঝলাম না কি তাতে দোষ হোল! বুড়োটা খিটখিটে ধরলেন। বিনা আলোতে যখন সব আমি দেখতে পাচি, এমন কি বিংশে-চুরি করা বৌকে পর্যন্ত—তখন আলো না নিয়ে গিয়ে দোষ করেচি কি?

বুড়ো বললে—না, না, সক্ষ্যাত পর সর্বদা আলো কাছে রাখবে।

—কেন?

—তাই বলচি। তোমার বয়স কত?

—সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে।

—অনেক কম বয়স আমাদের চেয়ে। আমার এই তেষ্টি। যা বলি কান পেতে শুনো।

—আজ্জে, নিশ্চয়।

রাত্রে শুয়ে আছি, ওপরের ঘরে কিসের মেল ঘটিয়ে শব্দ ওলে ঘুম ভেঙে গেল। জিনিসপত্র টানাটানির শব্দ। কে বা কারো যেন বাস্তু-বিছানা এখান থেকে ওখানে সরাকে। ভারী জিনিস সরাকে। বুড়ো কাল সকালে চলে যাবে কলকাতায়, তাই বোধ হয় জিনিসপত্র গোছাকে! কিন্তু এত রাত্তিরে?

বাবাৎ! কি বাতিকগ্ন মানুষ!

সকালে উঠে বুড়োকে বলতেই বুড়ো অবাক হয়ে বললে—আমি?

—হ্যাঁ, অনেক রাতে।

—ও! হ্যাঁ—না—হ—ঠিক।

—আমাকে বললেই হোত আমি গুছিয়ে দিতাম!

চক্রতি-বুড়ো আর কিছু না বলে চুপ করে গেল। বেলা নটার মধ্যে আমি ডাঙ-ভাত আর বিংশেভাজা রান্না করলাম। খেয়ে-দেয়ে পোটলা বেঁধে সে রাণু হোল কলকাতায়। যাবার সময় বার বার বলে গেল—নিজের ঘরের সোকের যত থেকে ঠাকুর। পেঁয়ারা আছে, আম-কঁাঠাল আছে, উৎকৃষ্ট পেঁপে আছে, তরিতরকারি পৌতো, আমার খাস-জমি পড়ে আছে তিনি বিমে। ভদ্রাসন হোল দেড় বিঘের ওপর। লোক—অভাবে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। খাটো, তরকারি উৎপন্ন করো, খাও, বেঢ়ো—তোমার নিজের বাড়ি ভাববে। দেখাওনো করো, থাকো। ভাবনা নেই। আর একটা কথা—

—কি?

চক্রতি-বুড়ো অকারণ সুর খাটো করে বললে—কত লোকে ভাঙ্গি দেবে। কারো কথা তনো না যেন। বাড়ি দেখাওনো যেমন করবে, নিজের মতো থাকবে, কোনো কথায় কান দেবে না, গাছের ফল-ফুলুরি তুমিই যাবে। দুটো ঘর খোলা রাইল তোমার জন্যে।

বুড়ো চলে গেল। আমাকে যেন আকাশে তুলে দিয়ে গেল। আরে, এত বড় বাড়ির বড় বড় দুখানা ঘর আমার ব্যবহারের জন্য রয়েচে—তাছাড়া বারান্দা, রান্নাঘর, রোয়াক তো আছেই! বাড়িতে পাতকুয়ো, জলের কষ্ট নেই। শুকনো কাঠ যথেষ্ট, কাঠের কষ্ট নেই। দশটা টাকা আগাম দিয়ে গিয়েচে বুড়ো, থায় আধ-মণ্টাক সরু আতপ চালও আছে। গাছ-ভরা আম-কঁাঠাল। এ দেন স্বপ্নবানের দান আকাশ থেকে পড়ল হঠাৎ!

বিকেলের দিকে তেল-নূন কিনবো বলে মুদির দোকান খুজতে বেরলাম। বাপ রে, কি বন-জঙ্গল গাঁথানার ভেতরে! আর এদের যেখানে বাড়ি তার ত্রিসীমানায় কি কোনো লোকালয় নেই? জঙ্গল ভেঙে সুড়িপথ ধরে আধ মাইল যাবার পর একজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল। সেও তেল কিনতে যাচে, হাতে তেলের ভাড়। আমার দেখে বললে—বাড়ি কোথায়?

—এখানে আছি নিবারণ চক্রতির বাড়ি।

—নিবারণ চক্রতি? কেন?

—দেখাওনো করি। কাল এসেচি।

—ও বাড়িতে থাকতে পারবে না।

—কেন?

—এই বলে দিলাম। দেখে নিও। কত লোক ও-বাড়িতে এল গেল। ওর নিজেরাই থাকতে পারে না, তা অন্য লোক! ও-বাড়ির ছেলে-বৌয়েরা কশ্চিনকালে ও-বাড়িতে আসে না—

—কেন?

—তা কি জানি! ও বড় ভয়ানক বাড়ি। তুমি বিদেশী লোক। খুব সাবধান।

আর কিছু না বলে লোকটা চলে গেল। আমি দোকান খুঁজে জিনিস কিনে বাড়ি ফিরলাম। তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামচে। দূর থেকে জঙ্গলের মধ্যেকার পুরোনো উচু দোতলা বাড়িখানা দেখে আমার বুকের ভেতরটা হাঁঁৎ করে উঠলো। সত্তি, বাড়িখানার চেহারা কি বুকম যেন! ও যেন একটা জীবন্ত জীব, আমার মতো শুন্দি লোককে ঘেল গিলে কেশবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসচে! অমনতর ওর চেহারা কেন?

কিছু না। লোকটা আমার মন খারাপ করার জন্য দায়ী। আমি যখন তেল-নূন কিনতে যাই তখন আমার মনে দিব্যি শুর্তি ছিল—হঠাতে এমন হওয়ার কারণ হচ্ছে ওই লোকটার ভয়-দেখানো কথাবার্তা। গায়ে পড়ে অত হিত করবার দরকার কি ছিল বাপু তোমার? চক্রতি-বুড়ো তো বলেই গিয়েছে, কত লোক কত কথা বলবে, কারো কথায় কান দিও না।

কিছু না, গাছপালার ফল-ফুলুর গায়ের লোক চুরি করে থায় কিনা। বাড়িতে একজন পাহারাদার বসালে লুঠপাট করে খাওয়ার ব্যাধাত হয়, সেইজন্যেই ভয় দেখানো। যেমন ওই বৌটি কাল সন্ধ্যাবেলা বিঞ্চে চুরি করছিলো।

অনেকদিন এমন আরামে থাকিমি। বিনা-খাটুনিতে পয়সা রোজগারের এমন সুযোগ জীবনে রখনো ঘটেনি। নিজের জন্য শুধু দুটো রান্না—মিটে গেল কাজ! সকাল সকাল রান্না সেবে নিয়ে নীচের বড় রোয়াকে বসে আপনমনে গান গাইতে লাগলাম। এত বড় বাড়ির আমিই মালিক। কারো কিছু বলবার নেই আমাকে। যা খুশী করবো।

হঠাতে ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। দোতলার মালিক মুখ দিয়ে পড়তে লাগলো জল, যেমন ওপরের বারান্দাতে কেউ হাত-পা খুলে জল পড়ে-বেশ মোটাধারে জল পড়তে লাগলো। তখনি আমি উঠে রোয়াকের ধারে দাঁড়িয়ে দোতলার বারান্দার দিকে চেয়ে দেখলাম। তখনো জল পড়চে—সমানে মোটাধারায়। ওপরের সিঁড়ির দরজায় তালা দেওয়া। চাবি চক্রতি মশায় নিয়ে গিয়েচেন, সুতরাং দোতলায় যাবার কোনো উপায় আমার নেই। এ জল কোথা থেকে পড়চে?

মিনিট দশেক পড়ার পর জলের ধারা বন্ধ হয়ে গেল। আমার মনে হোল, চক্রতি মশায় বোধ হয় কোনো কলসী বা দ্বারাতে জল দেখে দিয়েছিলেন ওপরের

বারান্দাতে, সেই কলসী কিভাবে উল্টে পড়ে গিয়ে থাকবে। নিশ্চয় তাই। তা ছাড়া জল আসবে কোথা থেকে?

একটু পরে গিয়ে তয়ে পড়লাম। আলো নিরিয়ে তয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে যুম জড়িয়ে এলো। অনেক রাতে একবার যুম তেজে গেল, জানলা দিয়ে সুন্দর জ্যোৎস্না এসে পড়েচে বিছানায়। কি একটা ফুলের গন্ধও আসচে। বেশ সুবাস ফুলের।

কি ফুল?

যুমের ঘোরেই ভাবচি এমন কোন সুগন্ধওয়ালা ফুল তো বাড়ির কাছাকাছি দেখিলি!

তড়ক করে লাফিয়ে উঠলাম। ও কি! জানলার সামনে দিয়ে একটি বৌ চলে গেল রোয়াক বেয়ে। হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেচি—ভুল হবার নয়। আমি তখনি উঠে দরজা খুলে রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালাম। রোয়াকে দাঁড়াতে দুটো জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হোল। প্রথম সেই ফুলের সুবাসটা রোয়াকে অনেকখানি ঘন, এ বৌটি ঘেল এই সুবাস ছড়িয়ে দিয়ে গেল এই কতক্ষণ! না, কোনো ফুলের সুবাস নয়। এ কিসের সুবাস, তা আমার মাথায় আসচে না।

কেমন একরকম যেন লাগচে! একরকম নেশার মতো! কেন আমি বাইরে এসেচি? ও! কে একটি বৌ রোয়াক বেয়ে খানিক আগে চলে গিয়েছিল—সেই ছড়িয়ে গিয়েচে এই তীব্র সুবাস। কিন্তু কোনো দিকে নেই তো সে! গেল কোথায়!

সে-রাতে সেই পর্যন্ত। কতক্ষণ পরে ঘরে এসে শুয়ে যুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে মনে হোল, সব স্বপ্ন। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। কাজ-কর্মে ভালো করে মন দিলাম। বন-জঙ্গল কেটে কিভাবে তরি-তরকারির আবাদ করবো, সেই আলোচনা করতে লাগলাম মনের মধ্যে।

একটা অসুবিধে এখানে থাকবার—বড় নির্জনে থাকতে হয়। কাছাকাছি যদি একস্বর লোকও থাকতো, তবে কষ্ট হোত না—কথা বলবার একটা লোক নেই, এই হোল মহাকষ্ট।

সেদিন দুপুরে এক ঘটনা ঘটলো।

আমি ভাত নামিয়ে হাঁড়ি রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দোতলার বারান্দাতে অনেক লোক যেন একসঙ্গে হেসে উঠলো। সে কি ভীষণ অটহাসি! আমার গা যেন দোল দিয়ে উঠলো সে হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসি নয়—খলখল করে হাসি। আকাশ-বাতাস থামথমিয়ে উঠলো সে হাসির শব্দে।

ভাত ফেলে রেখে দৌড়ে গেলাম। রোয়াকে গিয়ে ওপরের দিকে দেখি, কিন্তু না। নিচের জানলা যেমন বন্ধ, ওপরের ঘরের সারবন্দি জানলা তেমনি বন্ধ। হাসির লহর তখন খেয়ে নিশুল্প হয়ে গিয়েচে।

ব্যাপার কি? কোনো বদমাইশ লোকের দল ওপরে আড়তা বেঁধেছে? ওপরের সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখি দরজায় তেমনি কুলুপ ঝুলচে।

আমার ভয় হয়নি। কেননা দিনমান, চারিদিকে সুর্যের আলো। এ সময়ে মনের মধ্যে কোন ভূতের সংক্রান্ত থাকে না। এই হাসিই যদি আমি রাত্রে শুনতাম, তখন বোধ হয় তবে অজ্ঞান হয়ে যেতাম, চাবি দিয়ে দাঁত খুলতে হোত।

রান্নাঘরে ফিরে এসে ভাতের ফেন গেলে বিঞ্জের তরকারি চাপিয়ে দিই। প্রাচুর বিঞ্জে জঙ্গলে ফলেচে, যত ইছে তুলে নিয়ে থাও। আমারই বাড়ি, আমারই বিঞ্জে লতা। মালিক ইওয়ার যে একটা মাদকতা আছে, তা কাল থেকে বুরাচি। আমার মতো গরীব বামুনের জীবনে এমন জিনিস এই প্রথম।

কান পেতে রাইলাম ওপরের ঘরে কোনো শব্দ আসে কিনা শুনতে। ছাঁচ পড়বার শব্দও পেলাম না। খেয়েদেয়ে নিজের মনে বিছানায় গিয়ে ওয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—ঘুমের ঘোরে শুনচি, ঘরের মধ্যে অনেক লোক কথাবার্তা বলচে, হাসচে। ঘুমের মধ্যেও আমি ওদের কথাবার্তা যেন শুনচি, যেমন কোনো বিয়ে বাড়িতে ঘর-ভর্তি লোকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে লোকজনের গলার শব্দ ঘুমের মধ্যেও পাওয়া যায়! হয়ত সবটাই আমার মনের ভুল! মনের সেই যে ভাব হয়েছিল হাসি শুনে, তারই ফল!

এর পর ন'দিন আর কোনো কিছু ঘটেনি।

মানুষের মনের অভ্যাস, অণীতিকর জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি দিবি ভুলে যেতে চায়, পারেও ভুলে যেতে। আমি নিজের মনকে বেৰালুম, ওসব কিছু না। কি শুনতে কি শুনেচি, বৌ দেখা চোখের ভুল, হাসি শোনা ও কানের ভুল! সব ভুল।

এ ন'দিনে আমার শরীর বেশ সেরে উঠলো। খাই-দাই, আর শুধু ঘুমই। কাজ-কর্ম কিছু নেই-কেমন একরকমের কুড়েমি পেরে বসেছে আমাকে। আমি সাধারণত ঘুৰ খাটিয়ে লোক, ওয়ে বসে থাকতে ভালোবাসিনে—কিন্তু অনেকদিন ধরে অতিরিক্ত খাটুনির ফলে কেমন একরকমের অবসাদ এসে গিয়েছে, শুধুই আরাম করতে ইচ্ছা হয়।

ন'দিনের দিন বিকেলে মনে হোল রান্নাঘরের পেছনে সেই বিঞ্জের জঙ্গলটা কেটে একটু পরিষ্কার করি, বিঞ্জের লতাগুলো বাঁচিয়ে অবশ্য। ওখানে বালের চারা পুতুবো, আর একটা চালকুমড়োর এঁটো লতা হয়েচে ওই জঙ্গলের মধ্যে, সেটা বাশের কঢ়ি দিয়ে রান্নাঘরের ছাদে উঠিয়ে দেবো। এ বাড়িতে কাজ করে সুখ আছে; কারণ দা, কোদাল, কাস্তে, নিডেন, শাবল, কুড়ুল, সব মজুত আছে—ঘরের কোণে একটা হাত-করাত ইন্তক।

অলস্কণ মাত্র কাজ করেছি—আধ ঘন্টাও হবে না।

হঠাতে দেখি, সেই বৌটি বিঞ্জে তুলতে এসেচে। নীচ হয়ে ঝোপের মধ্যে বিঞ্জে তুলচে।

সঙ্গে সঙ্গে দোতলার ঘরগুলোর মধ্যে এক মহা-কলরব উপস্থিত হোল। অনেকগুলো লোক—আন্দাজ জনপঞ্চাশেক, একসঙ্গে যেন হৈ-হৈ করে উঠলো—সব দরজা-জানলা যেন একটা বাড়ের বাপট লেগে একসঙ্গে খুলে গেল।

বন কাটা ফেলে আমি ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম। সামনের রোয়াকে এসে নাড়ুলাম—কৈ, একটা দরজা-জানলার কপাটও খোলেনি দোতলার! যেমন তেমনি আছে!

ব্যাপার কি? বাড়িটার মৃগী রোগ আছে নাকি? মাঝে মাঝে এমন বিকট চীৎকার শুঠে কেন? এবার তো ভুল হবার কোনো কথা নয়—সম্পূর্ণ সুস্থ মনে কাজ করতে করতে এ চীৎকার আমি শুনেচি এইমাত্র। এখন আবার চারিদিক নিঃশব্দ, কোনো দিকে কোন শব্দ নেই।

সেই বৌটি আবার বিঞ্জে তুলতে এসেচে এই গোলমালের মধ্যে। দোড়ে গেলাম রান্নাঘরের পেছনে। সেখানেও কেউ নেই।

সেদিন রাত্রে এক ঘটনা ঘটলো। ভাবি মজার ঘটনা বটে।

খেয়েদেয়ে সবে শুয়েচি, সামান্য তন্ত্র এসেচে—এমন সময় কিসের শব্দে তন্ত্র ছুটে গেল। চেয়ে দেখি, আমার বিছানার চার পাশে অনেক লোক জড়ে হয়েচে—তাদের সবারই মাথায় লাল পাগড়ি, হাতে ছোট ছোট লাঠি—আশ্চর্যের বিষয়, সকলেরই মুখ দেখতে একরকম। একই লোক যেন পঞ্চাশটি হয়েচে, এইরকম মনে হয় প্রথমটা। বছ আরশিতে যেন একটা মুখই দেখচি।

কে যেন বলে উঠলো—আমাদের মধ্যে আজ কে যেন এসেচে!

একজন তার উজ্জ্বর দিলে—এখানে একজন পুরুষীর লোকের বাড়ি আছে অনেক দিন থেকে। আমি দেখিনি বাড়িটা, তবে শুনেচি। যারা দেখতে জানে, তারা বলে। সেই বাড়ির মধ্যে একটা লোক রয়েচে।

—সব মিথ্যে! কোথায় বাড়ি?

—আমরা কেউ দেখিনি।

—তবে এসো, আমরা নাচ আরঝ করি।

বাপ রে বাপ! কথায় বলে ভূতের লেত্য। শুনেই এসেছিলাম এতদিন, এইবার রচকে দেখলাম। সে কি কাঙ্গ। অতগুলো লোক একসঙ্গে লাঠি বাজিয়ে এক তাওর নৃত্য শুরু করে দিলে, আমার দেহের মধ্যে দিয়ে কতবার যে এল গেল! তার সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার আর হয়া!

আমার বিছানার বা আমার দেহের কোনো অংশ তারা স্পর্শও করলো না। আমি যে সেখানে আছি, তাও যেন তারা জানে না। ওদের হক্কার আর তৈরব ন্তো আমি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলাম।

যখন জ্ঞান হোল, তখন শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্না খোলা জানলা দিয়ে এসে বিছানায় পড়েচে। সেই ফুলের অতি মৃদু সুবাস ঘরের ঠাণ্ডা বাতাসে। আমি আধ-অচেতনভাবে জানলার বাইরের জ্যোৎস্নামাখা গাছপালার দিকে চেয়ে রাইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না ভোর হয়ে গেল।

বিছানা হেঁড়ে উঠে দেখি ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। সুশিশ্রা হোলে শরীর যেমন বারবারে আর সুস্থ হয়, তেমনি বোধ করচি।

তবে সে ভূতের নাচ কে দেখেছিল? সে নাচ কি তবে ভুল? খেয়েদেয়ে পর্যন্ত

আরামে শয়ে ধূমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেবেচি ?

তাই যদি হয়, তবে এই শেষ-রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যে ফুলের সুবাস পেয়েচি,
তা কোথা থেকে এলো ? সেই বৌটি যখন চলাফেরা করে, তখনি অমন সুবাস
হড়ায় বাতাসে। সুবাসটা ভুল হতে পারে না। এখনো সে-গুরু আমার নাকে লেগে
রয়েচে!

কোনো অজ্ঞান বন-ফুলের সুবাস হয়তো! তাই হবে।

তেল কিনতে গিয়েচি দোকানে, দোকানী বললে—কি রকম আছো? বলি,
কিছু দেখচো নাকি ?

—না।

—ওমচো কিছু ?

—না।

—তুমি দেখচি সাধু লোক। তুক-তাক জালো নাকি ? ভৃতের মন্ত্র ?

—তেল দাও, চলে যাই। ওসব বাজে কথা।

—আজ্ঞা, একটা মেয়েকে ওখানে কোনো দিন দাখোনি? বৌ-মত ? কোনো
গুণ পাওনি ?

—কিসের গুণ ?

—কোনো ফুলের সুগন্ধ ?

—না।

—শুর বেঁচে গিয়েচি তুমি। তোমার আগে যাবা ওখানে থাকতো, তারা সবাই
একটি বোকে দেখতো ওখানে থায়ই। এমন হোত শেষে, ও বাড়ি ছেড়ে তারা
নড়তে চাইতো না। তারপর রোগা হয়ে দিল দিন ওকিয়ে শেষ পর্যন্ত মারা
যেতো। দুটি লোকের এই রকম হয়েচি এ পর্যন্ত। বাড়িতে ভৃতের আড়ত। ভৃতে
লোককে পাগল করে দেয়ে। তাদের কাউন্টান থাকে না, এমন ভালো দাগে এ
বাড়ি—না থেয়ে, না দেয় ওখানে পড়ে থাকে—ছেড়ে যেতে চায় না! তুমি দেখচি
ভৃতের মন্ত্র জালো। আমরা তো ও বাড়ির ত্রি-সীমানায় যাইলে। মাঝা খারাপ
করে দেয় সাধারণ মানুষের।

তেল নিয়ে চলে এলাম। ভাবতে ভাবতে এলাম, মাঝা খারাপ হওয়ার সূত্রপাত
আমারও হোল নাকি ? বাড়ির সীমানায় পা না দিতেই আমারও মনে হোল, নাঃ,
সব ভুল ! পরম সুখে আছি। এ ছেড়ে কোথায় যাবো ? বেশ আছি, খাসা আছি,
তোকা খাসা আছি।

সেই থেকে আজ দু'বছর পড়ে আছি এ বাড়িতে। চক্রতি মশায় মাইলে-টাইলে
কিছুই দেয় না, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। বাড়ি দেখাখনা করি, বেগুন-
কলা বেঢি, দিনরাত ওঁদের নৃত্য দেখি, ওঁদের মধ্যেই বাস করি—এক-পা যাইলে
বাড়ি ছেড়ে।

গিন্নি-মা

কামাঙ্কীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দরজার কড়া নাড়বার শব্দ শুনে যে আধবুড়ী মানুষটা দরজা খুলল তার
পরনের কাপড়ে হলুদের ছোপ। চাউলিটা কেমন যেন! মলিনাকে সে বলল, ‘গিন্নি-
মাৰ সেবা-যত্ন কৰতে এসেছ, বাছাই আমি তৱকারিটা চড়িয়েছি। এস। তোমাকে
আশীর্বাদ কৰছি: ভালয়-ভালয় বাড়ি যেন ফিরে যেতে পার।’

মলিনা বেশ ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। এসেছে আয়াৰ কাজ কৰতে। ভালয়-
ভালয় কেন যে সে বাড়ি ফিরতে পারে, কেন বুড়ীৰ আশীর্বাদ— কিছু সে বুৰাতে
পারল না।

এই আধবুড়ী মানুষটা পাগলি-পাগলি ধৰনের। আপন মনেই কথা কয়।
রান্নাঘরে যাবার সময় আপন মনে গজগজ কৰতে কৰতে সে বলে চলল, ‘আবাৰ
জোয়ান ছুড়ি.... কতঙ্গো ছুড়িৰ সৰমাশ হতে দেখলাম যে.... নারায়ণ, নারায়ণ,
মেয়েটা যেন বাচে.... চলাচলেপনা মুখটা.... আমার সেই মেয়েটার মত... নারায়ণ,
নারায়ণ.... মেয়েটা যেন....’

তৱকারি সাতলে মলিনাকে বলল, ‘শুর সাবধান। প্রেট-টেটে যেন কিছু না
পড়ে। ইদিক-উদিক হলোই গিন্নি-মা ভুলকালাম কৰবে।’

প্রেটে খাবার সাজিয়ে দোতলায় গিন্নি-মাৰ ধৰেৱ ভেজান দরজার সামনে
পৌছে মলিনার বুকেৰ ভিতৰটা দুৱদুৱ কৰে উঠল। কেন যে হাত-পা শিৰশিৰ
কৰতে লাগল সে বুৰাল না। আয়াৰ কাজ সে নতুন কৰছে না। প্রায় পাঁচ বছৰ হল
কৰছে। মিলনেৱ সঙ্গে বিয়েৰ পৰ ধৰেকৈই। নহিলে সংসাৰ চলে না। কিছু এমনটা
তো কই আগে কখনো হয়নি! ভয়জ্ঞ নেই বলে মনে তাৰ বেশ গৰ্ব ছিল। কিন্তু
আজ এ কী ব্যাপার ? নিজেৰ উপৰ সে বিৰক্ত হল।

তারপৰ বেশ সম্পৰ্কে হাটু দিয়ে ভেজানো দরজাটা খুলে সে ঘৰেৱ ভিতৰে
গেল।

ৰাস্তাৰ দিকে দক্ষিণেৱ জানালার একটা পাটি খোলা। আৱ সব জানালা বৰক।
স্বরটায় তাই আৰছা আলো। খাটটা জানালা থেকে হাতখানেক দূৰে। পৰ-পৰ
তিনটো বালিশে মাথা রেখে গিন্নি-মা শুয়ে। শীতকাল, তাই গিন্নি-মাৰ শৰীৰ লেপে
চাকা। ওধু দুটো হাত আৱ মুখ বেয়িয়ে আছে। লেপ-চাকা শৰীৰ ছোটখাটো
পাহাড়েৰ মত। আৱ হাত তো নয়, যেন হাতিৰ পা। ঝুলে-পড়া গাল দুটোৰ মধ্যে
কত স্তৱ যে মেদ জমেছে কে জানে। মনে হয় তাৰ শৰীৰে থলথলে মেদেৱ নিচে
হাতগোড় বলে কিছু নেই।

কিন্তু চোখ দুটো অসম্ভব তীক্ষ্ণ। চোখে চোখ পড়লে বুকেৰ ভিতৰটা হিম হয়ে
আসে। সাগেৱ চোখেৰ মত। এ-ৱকম নিষ্ঠুৰ চাউলি, এ-ৱকম মোটা শৰীৰ জীবনে

মলিনা দেখেনি।

সে ভেবেছিল পঞ্জানু বছর ধরে পক্ষাঘাতে গিন্নি-মা বিছানায় শয়ে। পঞ্জানু বছর ইটা-চলা নেই। তাই বেজায় মোটা হয়ে পড়েছেন। কোনদিন এ-বকম মানুষের মুখেমূরি যে হতে হবে মলিনার কল্পনাতেই ছিল না।

কৃতকৃতে চোখ দুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মলিনাকে বিধে বাজখাই দরে গিন্নি-মা বললেন, ‘তই তা হলে নতুন ছুঁড়ি, আয়ার কাজ করতে এসেছিস? বেশ-বেশ। পাশের টেবিলে ট্রে-টা নামা। কাছে আয়। ভাল করে দেখি।’

ট্রে নামিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে গিন্নি-মার চোখ দুটোর দিকে আনার তাকাতেই মলিনার মাথার মধ্যে সরকিছু যেন উলটো-পালটো হয়ে গেল। মনে হল তার শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে। মনে হল সে যেন ডুবতে বসেছে। তার শরীরটা যেন গলে যাচ্ছে। মনে হল, এই ঘরটা যেন নেই, খাট-চোর-টেবিল-আলমারি নেই। গিন্নি-মাও যেন নেই। আছে শুধু কৃতকৃতে দুটো চোখ আর তরঙ্গের নিটুর একটা চাউলি। আর কিছু নয়....

কিন্তু সেটা মাঝে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল ঘর, চোর-টেবিল খাট-আলমারি আর গিন্নি-মার চাউল শরীরটা।

গিন্নি-মা চোখ বুঁজে বললেন, ‘তোর বয়েসটা বেশ কাঁচা বলেই মনে হয়। বাইশ-তেইশের বেশি নয়। শরীরটা মজবুত আর বেশ পুরুষও। কিন্তু কাপের জেলুশ নেই। তোর বয়েসে আমি ছিলাম—যাকে বলে ডান-কাটা পরী। একমাথা ঘন চুল, মাখনের মত গায়ের চামড়া। ছিপছিপে শরীর। কোমরটা তোর মত ভাবী নয়। কত ছোড়ার যে মাথা শুরিয়ে দিতাম। কত ছোড়া যে আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে হনো হয়ে ঘুরত, যদি জানতিস—কিন্তু আজ? পঞ্জানু বছর ধরে বিছানায় পড়ে। পঞ্জানু বছর মেঝেও পা দিইনি। কিন্তু সে দিনগুলোর কথা ভুলিনি, যখন কৃপসী ছিলাম, যখন জোয়ান ছিলাম, যখন যৌবন ছিল।’

গিন্নি-মার কথা শনে তার জন্য মলিনার কিন্তু বিনুমাত্র কর্মণা হল না। তার শরীরের অবশ ভাবটা আর নেই। কিন্তু তার বদলে মাথার মধ্যে হঠাৎ শুরু হয়েছে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। মাথার মধ্যেকার দপদপ যেন কানের মধ্যে ধাক্কা দিচ্ছে। মলিনা তখন ঘর থেকে এক দৌড়ে একতলার রান্নাঘরে আধবুড়ী মানুষটার কাছে পালাতে পারলে বাঁচে।

হঠাৎ সুর পালটে গিন্নি-মা বলে উঠলেন, ‘এই ছুঁড়ি, জনুথুরু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বালিশগুলো একটা উচু করে দে। নইলে থার কী করে?’

মলিনা মাথার বালিশগুলো ঠিকঠাক করছে এমন সময় গিন্নি-মা আচমকা তার ডান হাতের কঙিটা চেপে ধরলেন। উঃ! এই মেদবহুল খলথলে হাত দুটোর মধ্যে এমন প্রচও শক্তির কথা কে কল্পনা করতে পেরেছিল? গিন্নি-মার ঠাঁটে একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল। তারপর জন্ম হাত দিয়ে মলিনার কলুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত হাত বোলাতে লাগলেন। একবার আলতোভাবে চিমাটি কাটলেন।

হাত বোলাতে বোলাতে গিন্নি-মা বলে চললেন, ‘তই ভেবেছিলি আমি একটা খলথলে বুড়ী? মোটেই নয়। শুধু খাবারে আমার তৃণি নেই। জোয়ান বয়েসের

দিনগুলোর কথা একটুও ভুলিনি। জোয়ান বয়েসের গা-শিউরনো আয়েসগুলোর কথা। ভেবেছিস বুঁকি ডবকা ছুঁড়ি বলে একাই তুই সেগুলো ভোগ করবি! তাই না? তোর সিথিতে সিদুর। নিশ্চয়ই তা হলে বিয়ে হয়েছে। বরটা বেঁচে আছে? তোর বয়ের গল্প করে যা। হোকরা লসা? জোয়ান? কী বকম জোয়ান? রোজ তোর সঙ্গে প্রেম করে? কবার করে প্রেম করে? খুব তাগড়া? খুব তাগড়া? বলে যা, বলে যা, বলে যা—কেমন করে প্রেম করে—কেমন করে প্রেম করে—’

মরিয়া হয়ে একটা বাটকায় মলিনা তার হাত ছাঢ়িয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি-মার স্বর থেমে গেল। চোখের পাতা বুজে এল। তারপর ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ট্রের দিকে থলথলে হাতটা তিনি বাড়ালেন।

রান্নাঘরে সে যথন পৌছল সর্বাঙ্গ তার থরথর করছে। গা গুলিয়ে-গুলিয়ে উঠছে। কী ঘিনঘিনে মন! কী জয়ন্য মন! তার ইচ্ছে করছিল সরকিছু আছড়ে-আছড়ে ভাঙতে।

বালতি থেকে মগ-মগ জল তুলে দু-হাতে হড় হড় করে সে ঢালতে লাগল।

আধবুড়ী মানুষটা তার দিকে সামান্য অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে চলল, ‘এর মধ্যেই গিন্নি-মার সঙ্গে খিটিমিটি বাধিয়েছে বাছা? মানুষটার সঙ্গে মানিয়ে চলা খুবই যে কঠিন সে-কথা মানছি। তবে পরের বাড়িতে চাকরি করতে গোলে আনেক কিছু সহিতে হয়। তাই খুব সময়ে চল। কত মেয়েকেই যে আসতে বেতে দেখলাম আয়ার কাজ করতে। কেউই টিকতে পারে না। সত্তা কথাটা বলেই বেলি। গিন্নি-মার মেজাজের দরজন সেই যে শ্রাবণ মাসে আয়া-মেয়েটা বাড়ি থেকে পালাল, আজ মাঘ মাসের আমাবসো—এর মধ্যে আয়ার কাজের জন্যে কাউকে জোগাড় করতে পারিনি। এ কটা মাস বেটে-বেটে আমার হাড় কালি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমার মত দুটো আধবুড়ী আয়ার জোগাড় করেছিলাম। গিন্নি-মা তাদের দূর দূর করে তাড়াল। আধবুড়ী আয়া গিন্নি-মার দু চোখের বিষ। চায় জোয়ান-জোয়ান ছুঁড়ি। রোজ-রোজ কোথায় ঝুঁড়ি ধরি বল তো বাছা? আর ঝুঁড়িদের ফেমন বতাব। কাটা দিন কাটতে না কাটতেই গিন্নি-মার ঘর থেকে বেরিয়ে তাকে নকল করতে শুরু করে দেয়। আমাকে গেরাজাই করে না। গিন্নি-মার মত হাত নাড়ে, গিন্নি-মার মত চোখ কুদি-কুদি করে কেমনতর যেন তাকায়, চোখ ঘোরায়। একটা তো গিন্নি-মার গলার স্বর অবিকল নকল করতে শুরু করেছিল। দেখেওনে তো গায়ে কাটা দিত। বুকের রক্ত হিম হয়ে আসত। মেয়েটা তোমার বয়সী ছিল। মাসখানেক টিকে ছিল। তারপর এক ভোরে বাগানের আমগাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে মরে। কেন যে গলায় দড়ি দেয় আজ পর্যন্ত কেউ তার হাদিশ করতে পারেনি। সে এক দারণ হচ্ছত। দারোগা পুলিশে বাড়ি গিসগিস। হাদিশ করতে পারেনি।’

মলিনার দু-চোখ দিয়ে তখন অবোরে জল ঝরছিল। সেদিকে তাকিয়ে আধবুড়ী মানুষটা বলে চলল, ‘কেঁদো না বাছা, কেঁদো না। বুড়ী মানুষ। মাথার কি আর ঠিক আছে? তীমরাতি ধরেছে যে। যা বলে তা কি আর ভোবে চিন্তে বলে? তার কথায় কান দিয়ো না। মুখটি বুঁজে কাজ করে যেয়ো। আর একটা কথা বাছা—ওই সব ধিঙি ছুঁড়িদের মত গিন্নি-মাকে আড়ালে-আবডালে কষ্টলো ভেংচি

কৌটো না—'

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল মলিনার মাথার যন্ত্রণাটাও বাড়তে লাগল তত। তার সঙ্গে অন্যমনক্ষণ হয়ে উঠতে লাগল। পদে-পদে কাজে তার ভুল হতে লাগল। পেঁয়াজ কুচোতে গিয়ে বুড়ো আঙুল কাটল। হাত থেকে পড়ে চাটনির পাথরের বাটিটা ছুরমান।

বেজায় বেজায় হয়ে বুড়ী মানুষটা বলল, 'হাত-পায়ে যে বশ নেই বাছা। বলি মলটা কোথায় পড়ে আছে গো ? বরের কাছে ?'

দুপুরের খাবার ট্রে-তে সাজিয়ে মলিনা গিন্নি-মার কাছে গেল। হাত-পা তখন বেজায় কাপছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু গিন্নি-মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না।

মলিনা রান্নাঘরে ফিরে গেল। কাঁপা হাতে বাসন-পত্র ধূলো। কোন মতে নাকে-মুখে কিছু ঝঁজল। আর কেবল ভাবতে লাগল সাড়ে সাতটা কখন বাজবে। কখন তার বরের ছুটি হবে ? কারখানার ডিউটি সেৱে মিলন তাকে কখন নিয়ে যেতে আসবে তার কুটারে ?... মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে... মিলন—মিলন, কখন তুমি আসবে ?.... মিলন—মিলন....

বুড়ী মানুষটার কাছ থেকে রাতের খাবারের ট্রে নিয়ে গিন্নি-মার স্বরে মলিনা যখন চুকল তখন সে মনস্তির করে ফেলেছে। গিন্নি-মা যদি আগের মত তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে নির্বিশ্বে কথাগুলো বলেন, তাহলে সে আস ছেড়ে কথা নলবে না। নথ দিয়ে ফালি-ফালি করে ফেলবে থলথলে মুখটা। গেলে দেবে তার সাপের মত কৃব চোখ দুটো।

উঃ, কিন্তু কী হয়েছে তার ? এ-রকম ভাবনা কখনো তো তার মাথায় আসেনি। আর মাথা—মাথায় তার এমন যন্ত্রণা আর তো কখনো হয়নি!

কিন্তু কী আশ্চর্য! এবাবেও গিন্নি-মা তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। একটি কথাও কইলেন না। মলিনা রান্নাঘরে ফিরে কাঁচের বাসনগুলো ধূলো। তারপর নিজের মুখ-হাত পরিকার করে পুরোন হ্যাতব্যাগ থেকে সিদুর কৌটো বার করে কপালে পরল বেশ বড়সড় লাল একটা টিপ।

এমন সময় দরজার সামনে শোনা গেল মিলনের কুটারের চাপা হর্ন। কুটারে সে কারখানায় যাতায়াত করে। ঠিক ছিল ফিরতি শব্দে এসে সে হর্ন দেবে। তারপর মলিনাকে পিছনে বসিয়ে বাড়ি ফিরবে।

এমন সময় আধবুড়ী মানুষটা গিন্নি-মার ঘর থেকে রান্নাঘরে ফিরে মলিনাকে বলল, 'যাও বাছা, গিন্নি-মার সঙ্গে দেখা করে যাও। গিন্নি-মা বলে দিয়েছেন। তোমার বর এসে গেছে দেখছি। তাকে গিয়ে বলছি দু' মিনিট সবুর করতে।'

অসহায় চোখে বুড়ী মানুষটার দিকে তাকিয়ে মলিনা আবার গেল দেতলায় গিন্নি-মার ঘরে।

গলায় মধু চেলে গিন্নি-মা বললেন, 'তোর বর এসে গেছে, তাই না ? জানলা দিয়ে তাকে কুটারে বসে অধৈর্য হয়ে হর্ন দিতে দেখছি।'

মলিনা বলল, 'ইঁয়া গিন্নি-মা।'

আবার গলায় মধু চেলে গিন্নি-মা বললেন, 'বেশ, বেশ। বাড়ি যাবি বৈকি

বাড়া। বরের কুটারের পেছনে বসে, তাকে সাপটে ধরে। তোকে আর ধরে রাখব না। এসার আমি ঘুমোব। শুধু যাবার আগে মাথার তলা থেকে একটা বালিশ পরিয়ে দিয়ে যা।'

তখনি মলিনার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল ঘর থেকে সৌভে পান্দামো। উচিত ছিল সেই সর্বনেশে হাত দুটোর নাগালের মধ্যে না যাওয়া। কিন্তু গিন্নি-মার মধু-বরা ঘরে তার মন খালিকটা ভিজেছিল।

বিছানার কাছে গিয়ে গিন্নি-মার মাথার তলা থেকে একটা বালিশ সে সরালো আর বিদ্যুতের মত সেই সাঁড়াশি-শুক্র একটা হাত বজ্র মুঠোয় মলিনার একটা কাজ ধরে তাকে নিজের কাছে টেনে আনল।

মলিনার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর গিন্নি-মা সাপের মত হিসহিস করে বলে চলেছেন। নাড়ে ছুড়ি, কুটারের পেছনে রসে বরকে সাপটে ধরে তোর আর বাড়ি ফেরা হবে না। জোয়ান বরটার সঙ্গে ঝীবনে আর রাতভোর আয়েস করে শিউরে-শিউরে উঠে প্রেম করা হবে না। বরটা তোর কোন দিন টেরও পাবে না সে-কথা। তুই যে আর মলিনা নোল, কী করে জানবে তোর তাগড়া বর ? ভাববে তার জোয়ান ছুড়ি ভবকা বউ আরো জোয়ান হয়েছে! কী খুশি সে যে হবে....'

মনে হোল গিন্নি-মা যেন কথা কইছেন না। কথা কইছে সাপের মত তার কৃব চোখ দুটো। দেখতে দেখতে ঘরের আবহা আলো আবহা হয়ে উঠল। সেই কৃব চোখ দুটো কাহলাখাদের মত নিকুৎ কালো হয়ে গেল। কালো আর গভীর। তারপর দুটো চোখ যেন এক হয়ে গিয়ে অমাবস্যার রাত হল। আর মলিনা সেখানে তুবতে লাগল, তুবতে লাগল....

ঘরটা বেজায় স্কুল।

মলিনার মাথার মধ্যে আর যন্ত্রণা নেই। সর্বাঙ্গে শুধু একটা কিম্বিমে অবসাদ। সেই অবসাদ ক্রমশ ছাড়িয়ে পড়ল তার উরুতে, তার পায়ে, তার পায়ের ঘোঁছে। গা দুটো তার কী মোটা হয়ে গেছে। লেপের তলায় ছাড়িয়ে রয়েছে। সাড়া নেই কোন পায়েই।

নিজেকে দেখতে লাগল মলিনা। বিছানা ছেড়ে সে উঠল। কোমরের কশি আট করল। ঠিকঠাক করে নিল তার আঁচল। বড় আয়লায় নিজেকে দেখে মুখ টিপে ছাসল। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। তারপর তুবতে পেল সিডিতে তার চাটি-পরা-পায়ের চটপট শব্দ।

এই প্রথম সে টের পেল পথবানু বছর ধরে সে হাটেনি। ঝীবনে আর কোনদিন সে হাটতে পারবে না!

দুটো হাত তার নিশপিশ করতে লাগল। কী আশ্চর্য—হাত দুটোর তার কী আশ্চর্য ক্ষমতা!

জানালা দিয়ে সে দেখল—মিলনের কুটারের পিছনের সিটে বসে তাকে সে সাপটে ধরেছে।

মিলনের গলা তার কালে এল, 'এত দেরি কেন ?'

নিজের স্বর সে তুবতে পেল, 'গিন্নি-মা মাথার বালিশটা সরাতে ডেকেছিলেন।'

ক্লাইম্যাঞ্জ বিভূতিভূষণ মুখ্যোপাধ্যায়

আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা থেকে গল্পটা ফেনেছি, উদ্দেশ্য, গল্পের ক্লাইম্যাঞ্জ জিনিসটা কি তাই বোঝানো। শ্রোতৃ বা শিশ্য আমার স্ত্রী এবং তার চতুর্দশবর্ষীয়া ভগী মীরা। প্রথমে সংজ্ঞটা সমন্বেই ধারণাটুকু পরিকার করে দিলাম : বললাম, ক্লাইম্যাঞ্জ হচ্ছে কোন রচনা বা রচনাখনের চরম পরিণতি— সে রচনা গল্প, উপন্যাস, কাব্য, মহাকাব্য যাই হোক। কোন একটা বিশিষ্ট ব্যাপক অনুভূতিকে ধাপে ধাপে তুলে নিয়ে গিয়ে একেবারে চূড়ান্ত পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হল ক্লাইম্যাঞ্জ। সেদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে যেমন সমস্য বইখানার শেষাংশে তার ক্লাইম্যাঞ্জ হতে পারে, তেমনি তার একটা অধ্যায় বা আরও খণ্ডিত অংশেও একটি বিশেষ অনুভূতি বা পরিস্থিতির ক্লাইম্যাঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে। এই ক্লাইম্যাঞ্জটিকে ঠিকমত ফুটিয়ে তোলাতেই রচনা বা রচনাখনের সাৰ্থকতা। ক্লাইম্যাঞ্জ জিনিসটা খুব পরিকার ক্লুপ নিয়ে ওঠে কোন তীব্র অনুভূতি নিয়ে রচনার মধ্যেই। তাতে পাঠক বা শ্রোতা তীব্র উৎকষ্টার মধ্যে এমন আকৃবিশৃঙ্খল হয়ে যেতে পারে যে একেবারে বাহ্যজ্ঞান হ্যারিয়ে বসতে পারে, কী বলছি, কী করছি, কোথায় আছি সে বিষয়ে কোন সন্ধিই থাকে না। এমন কি পরিণতিটা যতই খারাপ হোক, ইঠাং উল্টে গেলে একটা আশাভঙ্গের ধার্কা ও লাগে বুকে। মীরার দিকে চেয়ে বললাম—“এই সবের জন্যেই তোমার দিনি বই হাতে করে রান্নাঘরে চুকলে শুভ হয়ে যায় টিক, অবল হয়ে যায় তেতো, দুধ হয়ে যায় নোতা, ডাল হয়ে যায়....”

স্ত্রী বললেন, “গল্পটা বলবে তো বসি, ব্যাখ্যানা করতে হয় তো শুধু ওর কাছেই করো।”

“বসো।”—বলে আরম্ভ করে দিলাম।

“এক বার দিন সাতকের জন্যে আমি আমার বন্ধু বিকাশের ওখানে বেড়াতে যাই। ছিটো কিংবা তৃতীয় দিনের কথা, বিকাশ একটা বিশেষ দরকারে সকালেই বাইরে বেরিয়ে গেল, ফিরবে খানিকটা রাত করেই। সহস্র দিনটা বই পড়ে আর এদিক-ওদিক করে শক্তার একটু আগে মনে হল খানিকটা বাইরে ফাঁকা থেকে না হয় বেড়িয়ে আসি, বিকাশ এলেই তো আবার শহর দেখা, রাজবাড়ি দেখা, পাটি, ঝনাব এই সব আরম্ভ হবে। ট্রেনে আসবার সময় শহর থেকে আন্দাজ মাইল দূরের দূরে একটি জায়গা বড় ভাল লেগেছিল; একটি বেশ চওড়া নদী—তা কলকাতার গঙ্গার প্রায় আধা-আধি হবে সব নিয়ে—ওপরে একটা নেড়া পুল, তার ওপর দিয়েই গাড়িটা এল, দূরে দূরে পাহাড়; কাছেও, পাহাড় না হোক এখানে-ওখানে

কিছু টিলা ছড়ানো, কয়েকটা বেশ খানিকটা উঠেও গেছে। আমাদের গাড়িটা পাস করল ঠিক সূর্যাস্তের মুখে। পাহাড়ে নদী, মাঝখানে শুধু কয়েকটা জলের দেখা ছড়ানো রয়েছে, বাকি সমস্তটায় খু খু করছে বালি। সেই গেরয়া রঙের বালির পের প্রচণ্ড সুর্যের রাঙ্গা রশ্মি পড়েছে ছড়িয়ে, গাঁথিলের ছোটবড় বাঁক বাসায় কিরছে, জলের ধারে চতুর কাদাখৌচার গায়ে সোনালী রোদটা ঝিক-ঝিক করে উঠছে—সমস্তটুকু মনে গেঁথে গিয়েছিলে। জানতাম বিকাশকে বলতে যাওয়া বৃথা, কেননা যারা বইয়ের নেশায় ডুবে থাকে তাদের মতন, কবি বল, ঔপন্যাসিক বল, কোন লেখককেই ও বিশেষ পছন্দ করে না—অর্থাৎ তার এই অংশটাকে নেকনজরে দ্যাখে না....”

স্ত্রী একটু বক্স দৃষ্টিতে চেয়ে শুনছিলেন, ওকে কটাক্ষ করছি তেবে মন্তব্য করলেন, “কেউই দ্যাখে না নেকনজরে।”

বললাম, “আমি অবশ্য ঠিক সে জিনিসটি দেখতে পাব না। কেননা বাড়ি থেকে বেরাতেই সূর্যাস্ত হয়ে যাচ্ছে, পৌছুব ত্রোশ-খানেক পথ হৈটে। তবে শুক্রপক্ষের মাঝামাঝি যাচ্ছে, একটা অন্যরূপে দেখতে পাব, সে বোধ হয় আরও ভালই হবে।

“রেলের লাইন ধরে একটু পা ঢালিয়েই গেলাম। যখন পৌছলাম তখন সূর্য একেবারেই ডুবে গেছে, শুধু আকাশে এদিক-ওদিক ছড়ানো যে মেঘের টুকরোগুলো রয়েছে তাতে একটু একটু রঙের পৌঁছ লেগে রয়েছে; কোনটাতে হাকা, কোনটাতে একটু গাঢ়। আকাশের মাঝখানে চান্দা স্পষ্ট হয়ে আসছে। আমি পুলটা পেরিয়ে একেবারে ওপারে চলে গিয়ে লাইন থেকে লেংে পাশেই একটি ছোট টিলার ওপর গিয়ে বসলাম। বসলাম পশ্চিমমুখে হয়ে, সামনে হ্যাত-পাঁচেক পরেই নদীর তীরটা দেছে মেমে।

“দেখলাম, আগে বেরবার কথা যে মনে পড়ে নি, খুব ভালই হয়েছে। এমন একটি পরিপূর্ণ স্মৃতি আমি বহু দিনই পাই নি নিজেকে, এর আগে কখনও পেরেছি বলেই মনে পড়ছে না। চতুর জীবনের সব শব্দই গেছে থেমে, শুধু অনেক দূরে নদীটা একটা বাকের পর যেখানে জ্যোৎস্নার মধ্যে মিলিয়ে গেছে, খুব কীণ একটা পাখীর ডাক, খুব সন্তুষ্ট চখা-চৰ্বী, ওরা শুনেছি দূরে আলাদা আলাদা থেকে এইরকম করে ডাকতে থাকে পরম্পরাকে। বোধহয় তাবে এতে দাস্পত্য কলাহের সম্ভাবনাটা একেবারে দূর না হোক, কমে আসে। একেবারে কাছে জীবন্ত কোন শব্দই নেই, শুধু একটা টানা হাওয়া যেটাকে আমার কেমন করে যেন মনে হচ্ছিল, এই যে মুহূর্মু দিনটি পৃথিবীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিছে, তারই যেন দীর্ঘশ্বাস। এবকম অবস্থায় মনটা আপনিই কি করে এক হয়ে যায় এইরকম পরিস্থিতির সঙ্গে। আমার বয়সও তো প্রায় চান্দিশের কাছাকাছি; আমারও জীবনের সঙ্গ্য হয়ে আসছে, এইবার বিদায়ের পালা—এই মনে করে চোখের পাতা ভিজে হয়ে আসছে—একটা দীর্ঘশ্বাসও ঠেলে আসছে বুকে, এমন সময়...”

“মীরা, জিজ্ঞেস কর বাজে কথাই চলবে? তা হলে উঠি, আমার কাজ আছে তের। সাহিত্যিক নই।”

এবার অন্যরকম ভাব, বেশ কিছু শুরুতরই মনে হল। আমি স্বভাবদোষে পঞ্চ গিয়েছিলামই একটু ঘোরে, তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে আবার শুরু করে দিলাম, “দীর্ঘস্থায়া চেপে আসছে বুকে, এমন সময় যেন হৃশি ফিরে এল— নিজের মনেই বললাম—বা-বে! এইরকম যদি বাজে কালিতে পেয়ে বসে এখানে তা হলে তো সমস্ত রাত বসেই থাকতে হবে। তখন বেশ কিছুক্ষণ কেটেও গেছে সেখানে, ফিরতে অনেকটা পথও, তার ওপর নতুন জায়গা, ভাবলাম এইবার উঠে পড়া যাক। কিন্তু ভাবুকভাটুকু মন থেকে জোর করে ঠেলে সরিয়ে দিলেও, জায়গাটা নিজের একটা ঘোহ আছেই, মনে হল আর একটু বসে যাই, এ সুযোগ তো জীবনে বেশি আসে না। এইরকম ওঠবার কথা মনে হতেই আর একটু বাসে যাই করে করে অনেক বারই হয়ে গেল। কেমন যেন আস্তু মনে হল। কোন আঁচীয়া-কুটুম্বের বাড়ি গেলে—যেমন ধর, যখন তোমাদের বাড়ি যাই, একবার এর কথায় একবার শুরু কথায় আটকে যেতে হয়। এখানে জায়গাটাই যেন টেলে টেলে রাখছে। বেশ খানিকটা এইভাবে কাটবার পর হঠাতে এক সময় যেন আমার চমক ভাঙ্গল, যেন কোথায় বা কিসের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিলাম—হয়তো বা নিজের চেষ্টা সত্ত্বেও, এই আবার ভেসে উঠেছি। ভেসেও যে উঠলাম তাও একটা নতুন পরিস্থিতি মধ্যে। সমস্ত জায়গাটা একেবারে নিষ্কাশন, সেই যে দাওয়ার শনশনানিটুকু ছিল তাও আর নেই। তোমরা আবার চেটে যাবে, নইলে বলা যেতে হঠাতে যেন শাসকুন্দ হয়ে সেই দিনটার শুরু ঘটে গেছে কখন। আমাক নিজের অনুভূতিটাও গেছে বদলে একেবারে। সেই মুঠ আনন্দের ভাবটা যিয়ে গভীর রাতে এই রকম খোলা নিষ্কাশন জায়গায় নিটোল শিস্তকৃত আশায় সম্পূর্ণ অন্যভাবে অভিভূত করে ফেলছে আত্মে! গাটা হমছম করে আসছে, একটা অহেতুক ছেলেমালুয়ী ভয় বুকটাকে চেপে যেন সত্ত্বাই শাসকুন্দ করে করে আনতে লাগল। শনশনানিটুকু গেলেও দাওয়া একটু রয়েছেই, অত খোলা জায়গায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না, আমার মন শুধু যেন বগতে লাগল—‘একটু শব্দ দাও, পৃথিবীর প্রতটুকু শব্দও শোনাও আমায় কেউ।’

ঠিক এই সময় হঠাতে একটা শব্দ উঠল আকাশ-বাতাস চকিত করে। শব্দের সেরা শব্দই—রাম-নাম : কিন্তু বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। পেছন ফিরে দেখি লাইনের পাশ দিয়েই, প্রায় শ'খানেক গজ দূরে কতকগুলো লোকের একটা ছোট দল চালি করে একটা শব নিয়ে আসছে। জানো বোধ হয়, এইরকম উপলক্ষ্যে হিন্দুহানীরা ‘রাম নাম সত্যাম’ বলে পথ চলতে থাকে। ওরা এখানেই লাইনের বাঁধ থেকে নেমে গেল। আমি তা হলে একটা শাশানের কাছেই বসে আছি।

সেই ভয়টা যেমন বেড়ে গেল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সাহসও খানিকটা এল ফিরে। যোক শুশান, কিন্তু কাছাকাছি অনেকগুলি লোকের সঙ্গ তো পাওয়া গেল। একটু বসেও রইলাম, তার পর ফিরব, দাঁড়িয়েও উঠেছি, ওদের মধ্যে একটা যেন কি নিয়ে একটু চপ্পল আলোচনা উঠল। শুশানটা খানিকটা দূরেই, কিন্তু এই রকম ফাঁকা জায়গায় আওয়াজটা শ্পষ্ট হয়েই ভেসে আসে। একটু কাল পেতে থাকতেই বুবাতে পারলাম, শবদেহটা তীব্রের কোল থেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়ে এসে দাহ করবার কথা হচ্ছে, কারণটাও টের পেলাম— নদীতে জল নেমেছে।

পাহাড়ী নদীতে এই রকম হয়। এদিকে কিছুই নেই, দূরে পাহাড়-অঞ্চলে বৃষ্টি নেমে হঠাতে প্রবল তোড়ে দু-কুল চেপে জল নেমে আসে। তার সঙ্গে ছোটবড় গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার, অসাধারণ থাকলে মানুষও। কোটালের বানের চেয়েও নাকি তয়ানক। কখনও দেখি নি, ঠিক করলাম দেখে যেতে হবে।

শৌ-শৌ একটা শব্দ উঠেছে দূরে।

একটু দোমনা হয়ে গেছি, এপারে বসেই দেখে নোব, না, ওপারে গিয়ে নিষ্ঠিন্দি হয়ে দেখব ? ঠিক করলাম, পেরিয়েই যাই, নীচে স্রোত থাকলে একটু নার্তাস করে দিতে পারে। পা বাড়ালাম। কিন্তু এই সময় সেই শব্দই হঠাতে বেড়ে গেল। আবার বসে পড়লাম আমি, ভাবলাম, তোড়টা ঠিক এসে পড়ার মুখে পুল পেরুন্মে আরও বারাপ হবে।

এইখানে মন্ত বড় একটা ভুল হয়ে গেল। ঠিক যে জেলেওনে ভুল তা নয়, হিসেব বা আন্দাজ করতে ভুল। জলের তোড়টা সেই অনেক দূরের বাঁকটা ঘুরতে শব্দটা হঠাতে বেড়ে উঠেছিল, এসে পৌছতে যে সময়টা নিল, দেখলাম তাতে আমি অঙ্গনে পুলটা পার হয়ে গেতে পারতাম। এ যা প্রলয়কাণ্ড দেখছি—হ্যাজার উঠতেই হেক না কেন পুলটা, সম্পূর্ণ নিরাপদ, কিন্তু এই দশটা কামানের গর্জন কানে নিয়ে, আর এই তোড়ের ওপর দৃষ্টি রেখে—বাথতেই তো হবে—এখন পেছই কি করে ?.... অনেক ওপরে আমি, দেখছি এপার-ওপার নিয়ে বোধ হয় পাচ-ছ ফুট উঁচ একটা ফণা ভুলে নেমে এল স্রোতটা—কী গর্জন, ছোট বড় গাছপালা বুকে চেপে কি আপসানি! কী সে ওলট-পাঞ্জট থাওয়া! দেখতে দেখতে পুলের থামগুলোয় ধাক্কা খেয়ে যেন আরও ক্ষেপে উঠে হস্কার দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তার পর দেখতে দেখতেই নদীর জল এক ফুট দু ফুট করে বাঢ়তে বাঢ়তে তীব্রের কাছাকাছি পর্যন্ত উঠে এল।

“দেখা হল একটা জিনিস জীবনে, পথচার কল্পনা স্কুলটি-কুটিল আনন্দটা। কিছুক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন চিন্তা করবার ক্ষমতাই হারিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হল। সেই তখনকার মতনই গেছি তলিয়ে—তখন ছিলাম সৌন্দর্যের মধ্যে, এখন যেন প্রলয়ের বিভীষিকায়। তখনকার মতনই এক সময় ভেসেও উঠলাম সেই অভল থেকে ; চিন্তা হল—পেছই কি করে ?

“গোড়াতেই যেমনটা ছিল, শুকনো নদীর ওপর হঠাতে যেন সমুদ্রের চেউ ভেড়ে পড়া, এখন ঠিক ততটা না হলেও খুবই তীব্র তো। নেড়া পুলের এক ফুট অতর পাতা কাঠের মিলারের ওপর পা দিয়ে দিয়ে পেরুন্মে, একটু যদি মাঝা ঘুরে পা উলে গেল তা হলেই আর দেখতে নয়। তবেছি এসব স্রোত যেমন হঠাতে আসে তেমনি হঠাতে যায়, কিন্তু সে-হঠাতের তো কোন আন্দাজ নেই ; জলের পরিমাণ যেমন দেখছি, পাহাড়ে বৃষ্টি থেমে গিয়ে থাকলেও এ জল বেরিয়ে যেতে অন্তত সমস্ত রাত কেটে যাবে। বৃষ্টি হতে থাকলে তো কথাই নেই।

“কি করব ভাবতে ভাবতেই রাত অনেকটা এগিয়ে গেল। ঘড়িটা নিয়ে যাই নি, কিন্তু আকাশে চাদ যেমন উলে পড়েছে নীচে, প্রায় বোধ হয় দশটা হয়ে এল।

“ভাবতে ভাবতেই হঠাতে একটা কথা যানে হল; এক জন সঙ্গী পাওয়া গেলে

বোধ হয় সুবিধে হত, যদি নেমে গিয়ে ওদের বলি, এক জন কাউকে দেয়—তখু পুলটা পেরিয়ে দিয়ে আসতে....

‘আমার চিঞ্চিটাই যেন রূপ নিয়ে আমার পাশে এসে পৌছাল ; দেখি আমার পেছন দিয়ে কখন একটি লোক এসে রেলের বাঁধের ওপর উঠতে যাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, আমি গিয়েছিলাম পুজোর ছুটিতে, পুজো শেষ করে, বেশ একটু ঠাণ্ডার ভাব এসে গেছে তখন। লোকটার গায়ে আগাগোড়া একটা সাদা চাদর জড়ানো, মাথার ওপর দিয়েও ঘুরিয়ে আনা, এদিকে বেশ সরল বলে মনে হল। একেবারে তালের মাথায় পেটে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, ওই, যেন এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি, হঠাতই দেখতে পেয়ে দাঢ়িয়ে পড়ে আমার জিঞ্জেস করল, ‘বাবু, আপনি অসময়ে এখানে বসে যো’।

“হিন্দীতেই করল জিঞ্জেস। বললাম, ‘দেখো না, বেড়াতে এসেছিলাম, আচমকা নদীতে এই বান ডেকে এসে...’

“পেরতে ভয় হচ্ছে ?”—একটু অঙ্গুভাবে হাসল লোকটা, মনে হল তাতে যেমন ভরসা দেওয়ার চেষ্টা আছে, তেমনি একটু যেন ব্যঙ্গও রয়েছে মেশানো, বলল—‘আমন হয় পেরতে ভয়, ভয়স্তর নদীত তো। কিন্তু আসলে ভয়ের কিছুই নেই। এই তো আমিই যাচ্ছি, আসুন না, আসবেন ?... আসুন তা হলো, আমার আবার সময় নেই।’

“বলতে বলতেই পা বাঢ়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি নেমে এসে সঙ্গ নিলাম; ও আগে আগে, আমি ঠিক পেছনে। পুলের ওপর উঠে যেতে যেতে একটু কথা ও হল। আমি জিঞ্জেস করলাম, ‘তুমি এই ওদের দলের লোক ?... যেন ওদিক থেকেই উঠে এলে মনে হল।’

“বললে, ‘হ্যা।’

“কোথা থেকে আসছ তোমরা ?”

“কি একটা নাম বললে মনে নেই। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, লোকটার বেশ সহজ সিধা চাল দেখেই হোক, বা যে জনোই হোক, আমিও বেশ দ্বন্দ্বনেই স্লিপারের ওপর পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছি, ভয়ের ভাবটা একেবারেই নেই। সেই কথাই বললাম ওকে। বললাম, ‘এক জন সঙ্গী পেলে সত্ত্বাই বড় সুবিধে হয়। তোমার আবার দেখছি পা খুব শক্ত, একটুও এদিক-ওদিক হচ্ছে না।’

“আমার যে অব্যোস হয়ে গেছে। তবে হ্যা, একথা ঠিক বলেছেন যে এক জন সঙ্গী পেলে ভালই হয়। নৈলে এ অবস্থায় বড় যেন একলা আর অসহায় বোধ হয়, না ?”

“বললাম, ‘সত্ত্ব তাই, খুব পেয়ে গেলাম তোমায়, কপালের জ্বর বলতে হবে আমার।’

“আবার ঘুরে চেয়ে সেই বকম হেসে বলল—‘কপালের জ্বর কি আমারই নয় ? কেমন পথের মাঝেই পেয়ে গেলাম আপনাকে !.... যেন আমার জনো বসেছিলেন নয় কি ?’

“আমিও হেসেই বললাম, ‘তা ভিন্ন আর কি ? কিন্তু, হ্যা, ঠিক কথা, ভুলেই

যাচ্ছিলাম, তা তুমি সবাইকে ছেড়ে হঠাত এমন করে একলা যে নদী পেরতে যাচ্ছ ? যাচ্ছই বা কোথায় ?’

“এবার আর কথায় নয়। এ প্রশ্নের উত্তরটা একেবারে অন্যভাবে পাওয়া গেল ; দেখি কেউ নেই আর আমার সামনে !

“ঠিক পরের মৃহুর্তটা আমার কি হয়েছিল মনে নেই। খোলা ঠাণ্ডা হাওয়া থাকার জন্যে বা যে কারণেই হোক, সম্ভিটা ফিরে আসতে নিশ্চয় দেরি হয় নি। দেখি পুলের মাঝখানে একটি স্লিপার থাণ্পমে আৰুড়ে ধরে পড়ে আছি। বিপদটা খুব উচ্চ পোছের ইওয়ার জন্যেই বোধ হয় জ্বানটা বেশ তাড়াতাড়ি আর শ্পষ্ট হয়েই ফিরে এল, লোকটার... আর লোক বলিই বা কি করে— প্রত্যোকটি কথা তার আসল অর্থে ফুটে ফুটে উঠল আমার কাছে—বুঝতে বাকি রইল না কী দুর্বল হারা নদী পার হয়ে ওর কাছে এ নদী যে গোপনদমাত্র এখন! সত্ত্বাই কত যে অসহায় ও, কী যে একা!

“এই ‘একা’ কথাটা হঠাত আমার কাছে যেন অতিরিক্ত বিভীষিকাময় হয়ে উঠে ভয়ের ভোড়ের ওপর আর একটা ভোড় এনে ফেললে—একা, তাই কি অন্তর্পথের যাত্রী এই বিদেহী আজ্ঞা আমায় তার সঙ্গী করে নিতে এসেছিল ? নিজের প্রশ্নাতেই ভয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকৃষ্ট হক্কার শুনে সামনে চাইতেই দেখি জুন্ড দৃষ্টি নিয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে সামনে। এক মৃহুর্তের বিশ্রম, তার পরেই ব্যাপারটা বুবলাম, সামনের উচু টিলাটা ঘুরে একটা ট্রেন মন্ত গতিতে আসছে ছুটে, তার ইঞ্জিনের সার্চলাইট এসে পড়েছে আমার ওপর, দেখেছে ড্রাইভার, প্রাণপনে হইসিল দিতে দিতে সতর্ক করতে করতে ছুটে আসছে—কিন্তু ফল কি আর সতর্কতার? মৃত্যু আমার দু দিকেই—সামনে এই, নীচে এই বিচ্ছুর্ক প্রলয়-পয়োধি।

“তবু বাঁপিয়েই পড়ে লোকে এ-অবস্থায়, কিন্তু শরীরের সমস্ত শায় আমার তখন একেবারে শিথিল হয়ে গেছে। ওদিকে আর এইটুকু মনে আছে যে দুটোহাতে জোখ দুটো চেপে ধরে মাথাটা দিয়েছি নুয়ে।

“তার পরেই মনে পড়ছে একটা যেন বিকট অন্ধকার মৃতি, ঠিক হাত দুয়েক তফাতে দাঁড়িয়ে বঞ্চ-কঠোর হক্কার ছাড়ছে....

“ইঞ্জিনটা আর কি ড্রাইভার ব্রেক....”

“যাঃ ! বেঁচে গেলেন !”

মুখ থেকে কথাটা যেন হঠাত ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল মীরার, তীব্র উৎকৃষ্টায় হাত দুটো মুঠো করে বুকের ওপর চেপে ধরেছিল, আলগা হয়ে গেল।

স্তৰি ও ঠিক এ ধরনেরই কিন্তু বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন, সামনে নিয়ে ওর পিঠে একটা মন্দু চড় বসিয়ে দিয়ে বলল, “দুঃ, অমন করে বলে! হঁশ হারাস যে গল্প শুনে !....”

“উঃ! ভাগ্যিস !” বলে আবও খানিকটা সামনে নিলেন।

রহস্য সত্তীনাথ ভাদ্রাড়ী

বাড়ি চুকেই দোলগোবিন্দ চৌধুরীর মেজাজ গেল খারাপ হয়ে। ভেবেছিলেন এক কাপ চা খেয়েই বেঝবেন ফুটবল ম্যাচ দেখতে। এরকম ম্যাচ গ্রামে বড় একটা হয় না। ভট্টাচার্য বাড়িতে মেয়ের বিবে। বরষাত্তী এসেছে। তারাই ফুটবল খেলবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে।

দেখলেন বারান্দায় মেঝের উপর ঘড়ি দুর্যোগ। ঘড়ির মা ঘটিতে করে গেয়েন মাথায় জল ঢালছেন; আর এক হাতে পাখা। তাহলে এখনই মৃর্জা গিয়েছে; পাঁচ মিনিটও এখনও হয়েনি। মাথায় জল দিয়ে মিনিট পাঁচেক পাখা করলেই মেঝের জল ফিরে আসে; কিন্তু তারপর তার শরীর হয়ে যায় খুব দুর্বল; পুরো একদিন বিছানায় ওইয়ে রাখতে হয়; এই সময় গুরুত্বাত্ত্বে মেঝেটা তন্ত্রার ঘোরেও চমকে চমকে ওঠে; একজন কেউ তখন কাছে না বসে থাকলেই নয়। ... তাদের একমাত্র মেঝের বেয়ারামের গতিবিধির এইসব খুচিনাটি তাঁর মুখহ। থাকবাবাই কথা! জন্ম খেকেই মেঝের এই ব্যামো। আটমাসে হয়েছিল বলে এ মেঝে চিরকাল শ্রীগঙ্গারী। মধ্যে মধ্যে ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। কী দেখে যে ভয় পায় হোটবেলায় বোরা ষেত না। বড় হয়ে বখন কথা বলতে শিখল, তখন বোরা গেল। মাকড়সা। মাকড়সার ভয়েই মরে। কোথা থেকে যে এই মাকড়সার ভয় এল! দোলগোবিন্দবাবুর বিশ্বাস যে মেঝে এ জিনিস পেয়েছে মাঝের কাছ থেকে। ঘড়ি যখন পেটে তখন তার মাঝের নাকে আর উপরের চোটে খুব ঘা হয়। কবিরাজমশাই বলেছিলেন মাকড়সায় চেটেছে। এক রুকম নাকি মাকড়সা আছে যেগুলো রাত্রিতে ঘুমত মানুষের নাকের মধ্যে দোড়া চুকিয়ে রঞ্জ ওঁৎ থেকে আসে। এই কথা শুনবার পর থেকে কিছুকাল ঘড়ির মা রাতে ঘুমোতে পারতেন না মাকড়সার ভয়ে। মাঝের সেই তরাই মেঝেতে বর্তাল নাকি? কে জানে!...

দোলগোবিন্দ চৌধুরীর ফুটবল ম্যাচ দেখা মাথায় উঠল। শ্রীর হাত থেকে পাখাখালি নিয়ে তিনিও বসলেন মেঝের মাথার কাছে।

বাইরের ঘরের ঘড়িতে পাঁচটা বাজল ঢং ঢং করে। ভারী মিটি আওয়াজ ঘড়িটি—বিলাতের একটি বিখ্যাত গির্জার ঘট্টাধূনির নকল করা। বহুকালের পুরনো কোল সাহেবের যেন ছিল; ঠাকুরদা সদরে এক নিলামের ভাকে কিনেছিলেন। তখন চৌধুরী বাড়ির এতটা দৈন্যদশা ছিল না; এখন তো ঘটিবাটি

পর্যন্ত বাঁধা পড়েছে; কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যেও ঠাকুরদা শব্দের জিনিস বলে, এই দেয়ালঘড়িটিকে বিক্রি করেননি দোলগোবিন্দবাবু। পুরনো হলে কী হবে; এখনও পুরনো 'টাইম' দেয়। বিক্রি না করার আরও কারণ আছে। ওই ঘড়িটা অন্যস্থাকে নিয়ে যাবে শুলে তাদের একমাত্র মেয়ে কেনেকেটে অনর্থ বাঁধাবে। হোটবেলা থাকে তার ওই ঘড়িটার উপর টান। বাড়ির ভিতরে হয়তো খুব কানাকাটি করছে, বাইরের ঘরে নিয়ে এলেই সব কানা থেমে যেত; হাঁ করে তাকিয়ে থাকত দেয়ালঘড়ির নড়ত পেঞ্জুলামাটির দিকে। হাটতে শিখবার পর তো কথাই নাই। কাক পেলেই চলে আসত বৈষ্ণকবালায়। এসেই ঘড়ি দেখবার আনন্দে হেসে গুকেবারে কুটিপাটি। তখনও মেয়ের নাম ঘড়ি হয়েন। কথা বলতে শিখবার পর সে বলত যে ঘড়িটা তাকে খুব ভালবাসে; পোষাখাড়ি তাই সে কাছে গেলেই আছাদে জোরে জোরে শব্দ করে। আরও কত মজার মজার কথা বলত ঘড়িটার সময়ে তার ঠিক নেই।...

মেঝে হাতের মুঠো খুলেছে। মা বাবা বুঝলেন যে এতক্ষণে মেঝের জ্বাল ফিরে এল। 'ও ঘড়িমা, তব কী? এই তো আমরা রয়েছি। চোখ বোল।'

ঘড়ি চোখ খুলল। মুখ এখনও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে রয়েছে। মা বাবার এসব শা-সওয়া হয়ে গিয়েছে আজকাল... মেঝেটা সকাল থেকে বিদ্যোত্তি যাবার জন্ম নাচানাটি করছিল। আর যাওয়া হল না। আজকের দিনটাও এই বিদ্যুটে রোগ মেঝেটাকে রেহাই দিল না! দুঃখের কথা বই কি।

এ গল্প সে গল্প করে দেয়ের মন ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন বাবা।

ওদিকে কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হবার কিছুক্ষণ পরেই রেফারির খেয়াল হয় যে তাঁর রিচ্টওয়াচটি বক্ষ হয়ে গিয়েছে; তখন দরকার পড়ল আর একটি ঘড়ির। খোজ! খোজ! দেখা গেল দর্শকদের কারও কাছে হ্যাতঘড়ি নেই। রেফারি নিজেও বরষাত্তীদের লোক। বরষাত্তীদের মধ্যে যারা খেলতে এসেছে তারা ঘড়ি আমেনি মাঠে। শেষ পর্যন্ত কুলবোর্ডিং থেকে আনা এলার্মগুলা একটি টেবিলঘড়ি হাতে নিয়ে রেফারি কাজ চালিয়ে নিলেন। সেই সময় বরষাত্তীদের ঠাট্টার উভরে গ্রামের কে একজন যেন উত্তর দিয়েছিল 'ঘড়ির দরকার কি মশাই এ গ্রামে? এখানকার মেঝেরা পর্যন্ত বিনা ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক কটা বেজেছে বলে দিতে পারে।'

এই কথার থেকেই বাপারাটি আরও। রেফারি ছিলেন একজন সাহসুদিক। ওনেই তাঁর কান খাড়া হয়ে উঠেছিল। খেলা শেষ হলে তিনি নিজে থেকে কথাটা পেড়ে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন তার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে। তারপর ঘড়ি নামে সেই মেঝেটিকে দেখতে গিয়েছিলেন। কৌতুহল চাপতে পারেননি। অসুস্থ শরীরের উপরও মেঝেটি ঠিক ঠিক সময় বলে দিয়ে, সেদিন তাঁর কৌতুহল পূরণ করেছিল। দোলগোবিন্দবাবু খুব কথা বলতে ভালবাসেন। রেফারি শুধু জিজ্ঞাসা

করেছিলেন—‘এর নাম ঘড়ি রেখেছিলেন কবে থেকে?’ উপরে দোলগোবিন্দবাৰা একেবাবে বিৱাট পৰ্ব শুনিয়ে ছেড়েছিলেন।

.....তখন ও মেয়ে কত ছোট! ওৱা মা একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কৰে— দেখ তো কটা বাজল বাইৱের ঘড়িতে। মেয়ে খেলা কৰছিল ভাঙ্গাৰ মৰেৰ বারান্দায়। সেখান থেকে সেই জবাৰ দিল—একটা কাঁটা একেবাবে উপরে, আৰ একটা একেবাবে নিচে। আমৰা আবাক! সত্যিই বাইৱের ঘৰেৱ ঘড়িতে চং চং কৰে ছোটা বাজতে শোনা গেল। তবনও মেয়ে ঘড়ি দেখতে জানে না।—সেই থেকে ওৱা মা তকে ঘড়ি বলে ডাকতে আৱৰ্জ কৰে।... ঘড়িমাৰ আমাৰ সব ভাল; শধু শৰীৱটা চিৱকাল ওই একই রকম থেকে গেল। আমাদেৱ এই একটিমাত্ৰ সত্তান! তাৰও এই বাস্তু!.. ভেবেছিলাম বড় হয়ে সেৱে যাবে। কই আৱ সাবল। দশ বছৰ পূৰ্ব হয়ে যাবে তাৰ আসছে মাসে।’.... ৱেষারিসাহেবে পৱনিল সকালে আবাৰ এসে মেয়েটিৰ ফটো তুলে নিয়ে গেলেন। দিন কয়েক পৱই শ্ৰীমতী ঘড়িৰ ফটো ও তাৰ অলৌকিক ক্ষমতাৰ কথা খবৱেৱ কাগজে বাব হল। বিবৰণ বিতৃত।

ঘোমেৰ লোকে এতকাল ঘড়িৰ এই দৈৰ ক্ষমতায় বিশ্বেষ আমল দেয়নি।—পারে তো পারে; অমন কত কিছুই আছে দুনিয়াতে; চাঁদ সুৰ্য তাৰা দেখে সময় বলা, ওসৰ তো চিৱকালই আছে। কিন্তু খবৱেৱ কাগজে তাদেৱ গ্রামেৰ নাম এত বড় বড় অক্ষৰে বাব হবাৰ পৱ আৱ ব্যাপারটাকে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

উড়িয়ে দেবাৰ উপায় ছিল না! কেননা এৱ থেকে গলায় ক্যামেৰা বোলানো, একজন দুজল লোক প্ৰায়ই আসতে আৱৰ্জ কৱল প্ৰামে, ঘড়িকে দেখবাৰ জন্য। বহু রকমেৰ খবৱ বাব হতে লাগল বিভিন্ন খবৱেৱ কাগজে মেয়েটি সহকে।

পাড়ায় সবচেয়ে বেশি হইচই পড়ে গেল যেদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আৰ সিভিল সার্জনেৰ গাড়ি এসে লাগল দোলগোবিন্দ চৌধুৱীৰ বাড়িৰ দুয়াৰে। উপরওয়ালাৰ ছক্কুমে তাৰা এসেছিলেন।

ব্যাপার হয়েছিল কী—তখন কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজেৰ অধিবেশন হচ্ছে। একজন পৃথিবীবিখ্যাত আমেৰিকাৰ বৈজ্ঞানিক ওই সত্তায় নিয়ন্ত্ৰিত হয়ে এসেছিলেন। তিনি মানুষেৰ দুৰ্বোধ্য অলৌকিক ক্ষমতাগুলো নিয়ে ইন্দোনেশ গবেষণায় মেতেছিলেন। কুমাৰী ঘড়িৰ ইন্দ্ৰিয়াতীত ক্ষমতাৰ সংবাদ তাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। তিনি মেয়েটিকে দেখতে উৎসুক হয়ে বলেন যে, এৱ মধ্যে যদি কোনো বুজুকি না থাকে, তাহলে তিনি মেয়েটিকে আমেৰিকা নিৱে যেতে চান। সেখানে তাৰ মনোবিদ্যা গবেষণাগাবে একে কিছুকাল পৰীক্ষাধীন বাবতে হবে। মেয়েটিৰ মা বাবা সেখানে সঙ্গে যেতে পারেন। পড়াশোনা, থাকা কোনো বিষয়ে টাকা পয়সাৰ অভাৱ হবে না। ব্যাপারটিৰ মধ্যে কোনো রকম চালাকি আছে কি

ন। সেইটা এখানে আগে নিজে যাচাই কৰে নিতে চান তিনি।

এইজন্য সৱকাৱীভাৱে উপৰ থেকে আদেশ এসেছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটৰ আছে তাৰ বৈজ্ঞানিককে যথাসন্তু সাহায্য কৰতে এ বিষয়ে। সিভিল সার্জন আৱ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্ৰথমে এসে ঘড়িৰ অলৌকিক শক্তিৰ পৰীক্ষা নিয়ে নিজেৰা নিয়ন্ত্ৰণে হয়ে নিলেন। তাৰপৰ দোলগোবিন্দবাৰুকে আমেৰিকাৰ বৈজ্ঞানিকেৰ হাতে কথা জানালেন। আমেৰিকা যাৰা প্ৰত্বাবে তাৰা কিছুতেই রাজী নন। শেষ পৰ্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন এই ভেবে যে সেখানে গেলে মেয়েৰ পুৱনো ব্ৰোগটি পাবাৰ একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ঠিক হয়ে গেল যে ঘড়িৰ প্ৰাথমিক পৰীক্ষা নিতে আসবেন আমেৰিকাৰ বৈজ্ঞানিক জেলা সদৱে। ধামে ইলেক্ট্ৰিসিটি নাই; আৱ অনেক রকম অসুবিধা। সেইজন্য সিভিল সার্জন সদৱ হাসপাতালেৰ একটা দিক একেবাবে খালি কৰে দিলেন। সেইখানেই ঘড়িকে এনে রাখতে হবে দিন পনেৱ ধৰে, তাৰ মা বাবাৰ সঙ্গে। পুলিস পাহাৰা থাকবে চারিদিকে। ভিতৱে যে যাবে বা যে থাকবে তাদেৱ তন্ম তন্ম কৰে সার্চ কৰে তুকতে দেওয়া হবে। কালো পৰ্দা টাঙ্গিয়ে ধৰন্তুৱাৰ একেবাবে অনুকৰণ কৰে দেওয়া হল যাতে রোদ্বুৰ বা ছায়া দেখে বেলাৰ আন্দজ না পাওয়া যায়। পিচকাৰি দিয়ে মাকড়সা মারবাৰ ওবুধ ছিটালো হল যাতে মেয়েটি ভয় না পায়। বাইৱে থেকে পাথিৰ ভাকেৰ আওয়াজটি পৰ্যন্ত যাতে না পৌছয় তাৰ ব্যবস্থা কৰা হল। সব দিকে বৈজ্ঞানিকেৰ সজাগ দৃষ্টি; কোনো রকম ফাঁকিৰ সুযোগ যাতে না থাকতে পৰীক্ষায়।

আমেৰিকাৰ ব্যাপার। সাৱা পৃথিবীৰ কাগজে প্ৰচাৰ হয়ে গেল এ পৰীক্ষার কথা। দিন কয়েক আগে থেকেই এসে এই শহৰে ডেৱাড়াৰা গাড়লেন বহু কাগজেৰ প্ৰতিনিধি, আৱ ভজুগে লোকেৰ দল। সাধাৰণ লোকে এৱই মধ্যে ঘড়িমা বলে ভাকা আৱৰ্জ কৰেছে মেয়েটিকে; পুলিস পাহাৰা ঠেলে এসে প্ৰণাম কৰতে চায়। যে প্ৰাচীটিৰ নাম মেয়েটিৰ দৌলতে পৃথিবীৰ মানচিত্ৰে লেখা হয়ে যাচ্ছে সেখানকাৰ লোকেদেৱ আজ গৰ্বেৰ অস্ত নেই।

কেমনভাৱে কখন ঘড়িৰ পৰীক্ষা নেবেন সেকথা বৈজ্ঞানিক দিতীয় ব্যাপ্তিকে বৈজ্ঞানিক। ঠিক হল ঘড়িকে বেশিৰ ভাগ সময় শুল্ক থাকতে হবে বিছানায়; অস্ত অল্প কৰে যখন তখন কাওয়ানো হবে। খিদে পাওয়া বা ঘুম পাওয়া দেখে যাতে সে সময়েৰ আন্দজ না পায়। এই ব্যবস্থা চলল কয়েকদিন। পৰীক্ষার ফলাফল সহজে দোলগোবিন্দবাৰু, তাৰ স্তৰী, তাদেৱ গ্রামেৰ লোক, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বা সিভিল সার্জনেৰ কোলো সন্তোষ ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকদেৱ মধ্যে অধিকাংশেৰ ছিল। ফলাফলেৰ জন্য দিনকয়েক প্ৰতীক্ষা কৰে তাৰা অধৈৰ্য হয়ে উঠেছে। সেই সময় একদিন হঠাৎ ঘড়িৰ দুম ভাঙ্গিয়ে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা কৰলেন, ‘এখন কটা বেজেছে?’

ঘড়ির মা বাবাকে তিনি বিশ্বাস পাননি। তাই তারা মেয়ের কাছে বসে খালি সত্ত্বেও দোভাষীর কাজ করছিলেন সিভিল সার্জন। ঘড়ি কয়েক সেকেন্ড যোগ বুজে তাবতে চেষ্টা করল। তারপর দৃঢ়কষ্টে উত্তর দিল—'নটা বেজে দশ মিনিট।' বৈজ্ঞানিক ঘড়ির ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সিভিল সার্জনকে নিয়ে।..... এর মধ্যে মে বুজর্জকি আছে তা তিনি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন। এসব ধাষ্ঠাবাটি তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনে অনেক দেখেছেন।... কিন্তু একটা ভুল তিনি আশা করেননি। রাত দেউটার সময় বলছে সাড়ে নটা.... কিন্তু বৈজ্ঞানিকের কি এর তাড়াতাড়ি মত স্থির করে নেওয়া উচিত?.... তিনি আর একটা সুযোগ দেবেন মেয়েটিকে।.....

ঘড়ি কিন্তু বুবতে পারেনি যে সে ভুল বলেছে; তার মা বাবাও না। গো মিনিট পনের পর আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ঘন্টা তিনেক পর আবার বৈজ্ঞানিক সিভিল সার্জনকে সন্দেহ করে এসে, ঘড়ির মূল ভাঙালেন।

সময় জিজ্ঞাসা করাক ঘড়ি চোখ বুঝে একটু তাবতে চেষ্টা করে।.... মা বাবা একদৃষ্টি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে।... কিন্তু একি? মেয়ের কপালে রেশা পড়ল কেন?.... স্পষ্ট বোবা যাচ্ছে যে সে খুব ভাবছে! এত তো তাকে ভাবতে হয় না কথনো! দৃশ্যমানের রেখা ওগলো।

সাহেব মনে মনে হাসছেন এতটুকু মেয়ের এই নাটকে ভান করা দেখে।

এতক্ষণে ঘড়ি চোখ খুলেছে। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ!... তয় পেল নাকি?... কী যেন বলতে চায়। সে উঠে বসল। দোলগোবিন্দবাবুর অবাক!... এমন তো কখনও হয় না!.... হল কী?

তয় পেয়েছে কি না, জিজ্ঞাসা করতে চান মেয়ের মা। কিন্তু বামীর কটগাট চাউলি দেখে থেমে গেলেন—সাহেবের যে হকুম কেউ কথা বলা দূরে থাক, আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারবে না মেয়ে উত্তর দেবার আগে।... মা বাবার উপরই সাহেবটির সন্দেহ বেশি; পর্দার আড়ালে লোক মোতায়েন আছে, তাদের উপর নজর রাখবার জন্য।

ঘড়ি অতটুকু মেয়ে হলে কি হয়। আবহাও বুবছে যে তার অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষার সঙ্গে জড়ানো আছে তাদের পরিবারের প্রত্যেকের সততার সম্মানের প্রশ্ন।..... হতাশার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তার মুখে। 'আমাকে ছেড়ে দাও;—আমি চাই না বলতে।' তার চোখ ফেটে জল আসছে। বাপসা চোখে সে তাকাল তার মায়ের মুখের দিকে। মায়ের চাউলিতে আশ্বাস ভরা— বলতে চান 'যা পারিস তুই বল না।' মনের বাধা ঠেলে মরিয়া হয়ে ঘড়ি বলল—'এখন এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট।'

কথাটা কোনোরকমে বলেই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠে ঘড়ি। সময় ঠিক বলতে পারেনি তা সে জানে!... কেন আন্দাজ এমন হল।... এমন তো জীবনে

জনও হয়নি তার।

সাহেব নিজের ঘড়ি দেখলেন—চারটে বেজে ঘোল মিনিট—সকাল হবার আর বেশি দেরি নেই। বুধাই কয়েকদিন সময় নষ্ট হল—নিষ্পাপ মেয়েটাকে আর কতকগুলো মিথো কথা বলা শেখাচ্ছে। বাপমায়ের দিকে একটা কুচ গবজ্জার দৃষ্টি হেনে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাইরে প্রতীক্ষমান সাংবাদিকদের দিকে। তাঁর কাছে মাপ চাইবার ভাষা খুঁজে পান না সিভিল সার্জন আর নিকট। মোলাম্যাভিস্ট্রেট; খুব বোকা বালিয়েছিল বটে পরিবারটা এ' কদিন তাঁদের।

মা মেয়েকে কোলের মধ্যে টেনে নিগেন। দোলগোবিন্দবাবুর চেয়ে কেউ গোধ হয় বেশি অবাক হয়নি। ঘড়ি একটু শান্ত হলে তিনি তাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করতে আরম্ভ করেন। মেয়ের উত্তর থেকে তিনি মোটামুটি বুবালেন ব্যাপারটা।

সময় জিজ্ঞাসা করলেই ঘড়ি মুহূর্তের জন্য চোখ বুঝে ভেবে নিত। তখন সময় জিজ্ঞাসা করলেই ঘড়ি মুহূর্তের জন্য চোখ বুঝে ভেবে নিত। তখন ঘড়ি চোখের মাঝে ফুটে উঠত বৈঠকখানার দেয়ালঘড়ির ডায়ালটা! সেইটা তার দেখেই সে বলত ক'টা বেজেছে। একদিনের জন্যও এই রুকম ভাবে বলা তার উত্তর ভুল হয়নি। ঘড়ির অলৌকিক ক্ষমতায় কোনো ফাঁক ছিল না; শুধু সে যে উত্তর ভুল হয়নি। ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পায়, এই কথাটি মা বাবা কারও কাছে মানসচক্ষে ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পায়, এই কথাটি মা বাবা কারও কাছে বলতেন না। মেয়েকেও একথা কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আজ হল কী?

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে— 'প্রথমবার দেখলাম নটা' দশ। তারপর আবার বখন মূল ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, তখন দেখে ন'টা বেজে দশ মিনিট।... এ তো হতে পারে না।.... দুইবারই এক সময় কী করে হবে?... বুকে মিনিট।... এ তো হতে পারে না.... তখন ভুল জেনেও আন্দাজে একটা যা তা বলে নিলাম।....'

তার কান্না আর থামে না।

বাইরে তখন লোকে সোকারণ্য। ঠাণ্ডা বিন্দুপ গালাগালির স্নোত বইছে। তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পুলিশ পর্দাঘেরা গাড়িতে করে পরিবারটিকে ঘড়ি পৌছিয়ে দিয়ে এল। দোলগোবিন্দবাবু প্রথমেই ছুটে গেলেন বাইরের ঘরের ভিতর।

.... দেয়ালঘড়িটা নটা বেজে দশ মিনিটে বক হয়ে গিয়েছে।

.... বন্ধ হবার তো কথা নয়। এ ঘড়িতে যে পনের দিন পর পর দম দিতে হয়।.... তিনি যে যাবার আগে নিজ হাতে দম দিয়ে গিয়েছিলেন!

ঘড়িটা খুলে দেখলেন, মাকড়সায় জাল বুনেছে ভিতরে। তাই বক হয়ে গিয়েছে।.... একটা খুদে মাকড়সা লাফাতে পালিয়ে গেল।

পাতাল কন্যা অনোজ বসু

হরিপ্রসন্ন আমার বাল্যবন্ধু। দায়ে পড়ে তার চাকরি নিয়েছি। তবে সে গোকৃ
ভাল। আমি কর্মচারী, সে মনিব—বাইরের লোক আপনারা কোনক্রিমে বুঝতে
পারবেন না। যেন বদ্বুই আমি, খাতিরে তার কাজকর্ম করে দিই। মাসান্তে হঠাৎ
একদিন থানকয়েক নোট আমার পকেটে উঁজে দিয়ে চট করে সরে পড়ে। এই হল
মাইনে দেওয়ার প্রতিনিয়া।

সুন্দরবন অঞ্চলে হরিপ্রসন্নের অনেকগুলো চক। নতুন আইন পাশ হল, এবাবে
জমিদারি গুটিয়ে নেবার পালা। কতক ভাসি বিক্রি করে, কতক বা বেনামি করে,
আর কতকটা জায়গায় বাগান-পুরুর ইত্যাদি বানিয়ে তড়িঘড়ি যতদূর বের করে
নেওয়া যায়। এরই তোড়জোড়ে আজকাল বাদাবনে তার ঘনঘন ঘাতায়াত।

একবার আমায় বলল, যাবি?

অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিষ্টের প্রশ্ন নয়, যেতেই হবে। কুবিকে নিয়ে মুশকিল— কার
কাহে রেখে যাই? দুর্ভাগ্য মেয়ে, ছ মাস বয়সে মা হারিয়েছে, আমিই মা-বাপ দুই
হয়ে দেখাওনা করি। খুড়িয়া সম্পর্কের একজনকে অনেক বলে- কর্যে এবং নগদ
কুড়ি টাকা হাতে দিয়ে দশ দিনের কড়ারে মেয়েটাকে গাছিয়ে রওনা হলাম।

বৈশাখ মাস। যা গরম পড়েছে—গাতে খালে কয়েকটা দিন তোক হাওয়া
খেয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। এটা উপরি লাভ। সুন্দরবন শুনে ভাববেন না বনজঙ্গলই
গুরু। জঙ্গল তো বটেই—হঠাৎ তার মধ্যে দেখবেন, পজ্জের কাজ-করা প্রায়-অভ্যন্তর
পাকা কুঠুরি—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কোন অনুচর বানিয়েছিল। হয়তো রয়্যাল-
বেঙ্গল টাইগার ইদানীং মহানলে বিনা-ভাড়ায় তথায় সগোষ্ঠী বসতি করছে।
কথনো বা নজরে পড়বে অনেকটা ফাঁকা জায়গা—হাসিল হয়ে সেখানটা আবাদ
হচ্ছে। কিংবা নদী-খালের ধারে দেখতে পাবেন ছোটখাটো দিবি, একটা প্রায়।
কাছাকাছি বনকর-অফিস, তাকে ঘিরে মানুষ ঘরবাড়ি তুলছে। অথবা গ্রামের মতন
দেখেই সরকারি অফিস বসিয়েছে সেই জায়গায়। নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন
না—কচকে দেখে আসুন, কতটুকুই বা পথ আপনাদের জায়গা ধেকে!

প্রথম আমরা শিবনগর কাছাবিবাড়ি উঠলাম। নায়েবের সঙ্গে সেহা-কড়চা
রোকড়-খতিয়ার নিয়ে বিষম আয়োজনে হিসাবপত্র চলেছে। কিন্তু জানি তো
হরিপ্রসন্নকে। উচ্চফলে ব্রহ্মাবের মানুষ—দিন চারেক পরে বিরাট কড়চা-খাতা
সশাদে বক করে বলল, এদিকে তালই হচ্ছে নাহেবমশায়, হাঁসখালি চকের কী

গতিক একবার দেখে আসা দরকার। ভাতে-ভাত চাপিয়ে দিতে বলুন—এই ভাঁটায়
বেরিয়ে পড়ব।

এই হাঁসখালি যাওয়ার পথেই কাণ্টা ঘটল। কুক্কণের যাত্রা—বাপ-ঠাকুর্দার
পুরো প্রাণে বেঁচে এসেছি। কিংবা বলব, পরম লক্ষ্মী বেরিয়েছিলাম— ভাবতে
আজও রোমাঞ্চ লাগে। বলছি, বলছি—অত তাড়াবেন না। বলবার জন্মে তো
আসব সাজিয়ে বসলাম।

দুপুরবেলা আমাদের পানসি পাশখালি দিয়ে যাচ্ছে। গোটা দুই বাঁক পার হতে
পারলে বড়-গাঙ। হরিপ্রসন্ন থামতে ইশারা করল মাথিকে। হামেশাই জঙ্গলে
আসে, বানু শিকারি—আমরা চতুর্দিকে নিরুম মিঠসাড় দেখছি, সে তার মধ্যে জন্ম-
জানোয়ারের চলাচল টের পেয়েছে।

পানসি এক হেতাল-রোপের আড়ালে নিয়ে রাখল। পনের-বিশ মিনিট যায়,
বন্দুকে টোটা তরে হরিপ্রসন্ন জঙ্গলের দিকে তাক করে আছে। তার পরে দুড়ুম
দুড়ুম। হরিণ পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে-ও লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলে। এ রকম যাওয়া
চিক নয়—কিন্তু কৃতির চোটে বাদার নীতিনিয়ম ভুলে গেছে।

টানাটানি করে শিকার তো নৌকায় তুলেছে—বাঁকের মুখে এমন সময়
মোটরলঞ্চ। শিকারের লাইসেন্স নেওয়া নেই, তার উপরে মাদি-হরিণ
পড়েছে—হেন অবস্থায় বনকরের লধনের সামনে পড়া আর বাঘের মুখে পড়া একই
কথা। হরিপ্রসন্ন তা বলে ঘাবড়ায় না। যেন ওদেরই প্রতীক্ষায় ছিল। সোঁওয়াসে
চিংকার করে উঠল বড় বাঁচিয়ে দিলেন মশায়রা। নয়তো নৌকো নিয়ে বেগোন
ঠেলতে হত আপনাদের অফিস অবধি। ফিটি হবে— দাঢ়িওয়ালা সেই লোকটা
আছে তো, সেই যে আহা-মরি মাংস রাঁধে ! হরিণটা লক্ষে তুলে দাও হে—

হরিণ তোলবার আগে নিজেই উঠে পড়েছে। আমাদের হাঁক দিয়ে বলে, বড়-
গাঙে বেড়িয়ে বিষখালির মোহানার চাপান দিয়ে থাকগে। নিঃশ্বেস ফেল না,
তোমাদের ফিটি—রাঁধা-মাংস নিয়ে আসব। গুরু উনুনে চাটি ভাত চাপিয়ে রেখ,
বাস!

সে হল দুপুরবেলার কথা। এক পহুঁচ রাত হয়ে গেল, পেটের ভিতর বাপান্তি
করছে। দেখা নেই কারো—না হরিপ্রসন্ন, না তার আহা-মরি মাংস। সারাদিন বড়ভ
ধূকল গেছে, পাশখালিতে জল ছিল না—কানায় নেমে তিন-চার মাইল নৌকো
ঠেলেছি। মারিমাঙ্গারা সঙ্গে থেকে নাক-ভাকাচ্ছে। একা বসে বসে আমিও কখন
ওয়ে পড়েছি—একদম কিছু জানি নে।

পানসি হেসেছে দুলছে—ঘুমের মধ্যে এক সময় টের পেলাম। অর্থাৎ জোয়ার
এসে গেছে। বাক্তাকে দোলনায় চাপিয়ে মা যেমন দোলা দেন, ঠিক তেমনি। মন
লাগে না। খানিক এমনি গেল। হেঁড়া-হেঁড়া স্বপ্ন দেখছি—

হঠাৎ মাঝি চেচিয়ে উঠে : সর্বনাশ হয়েছে—নৌকো বানচাল !
লাফিয়ে উঠে বসে আতকে থরথর কঁপি। জোয়ারের টানে কাছি ছিঁড়ে নৌকো

তীব্রের মতন ছুটেছে। নোনা জলের তরঙ্গ অক্ষকালের মধ্যে সাদা দাঁত মোগে হাসছে খলখল শব্দে। যা অবস্থা, সবসুন্ধ এতক্ষণ জলতলে যাইনি—সেই তো আকর্ষ !

মাঝি হাল চেপে ধরে সামলাতে গেল তো মড়াৎ করে হাল দুই খণ্ড। চরমক্ষণের অল্পই আর বাকি। হাত-পা কোলে করে সময়টুকু কাটিয়ে দাও—কোন-কিছুই করার নেই। জলের কংলাত্মনি আমার রূপবিন কান্নার মতন লাগছে। করাল অক্ষকালের পার থেকে রূপিন কান্নাতরা ডাক শুনি যেন: বাবা গো, বাবা—

যদি অক্ষকালে কোন জায়গায় কী অবস্থার মধ্যে ছুটছি, বোকাবার জো নেই। পাগলা হাতির মতো মাথা নাড়তে নাড়তে নৌকো হঠাৎ গতি বক্ষ করে দাঁড়ান। পাড়ে লেগেছে, লতাপাতায় আঁচ্ছেপিটে জড়িয়ে কাছি বাঁধার মতো হয়েছে। এমন তো হয় না—বেঁচে গেলাম তবে নাকি ? টেমি জ্বেলে চৌথুপি-লস্টনের মধ্যে পুরে উঁচু করে ধরলাম। দুটো উদ্দেশ্য—কেখায় কি ভাবে আটকে আছি, তার কিন্তু হদিশ পাওয়া। আর জায়গাটা যদি গরম অর্থাৎ বাত্রসংকুল হয় আলো ধরে জানোয়ারসের ভয় দেখানো।

মাত্ত এক বাকের মাঝামাঝি কি গতিকে কিনারায় এসে পড়েছি। যে জোরে আসছিল, পাড়ে ধাক্কা দেয়ে পানসির কুচি-কুচি হয়ে যাবার কথা। কিন্তু বুনো-লতা জলের মতো আটকে ধরল। বিধাতাপুরুষ আমাদের বেমকা পরমায়ু দিয়েছে, এই থেকে বোঝা যাচ্ছে।

গাঞ্জের পাশাপাশি দীর্ঘ বিসর্পিল এক বক্ষ—বাঁধ বলে তো মনে হচ্ছে। আবে, মানুষ কথা বলছে। মানবেলায় এসে পড়েছি তবে তো !

স্ফূর্তিতে নেমে পড়লাম। বিত্তর গোলঝাড়—সেগুলো পার হয়েই বাঁধ। বড় বড় কেওড়াগাছ জায়গাটায় আঁধার জমিয়ে তুলেছে। বাঁধের ওধারটা একেবারে ফাঁকা। মেঠো-জমি ভেঙে হনহন করে কারা আসছে, ওন্তিতে পনের-বিশ জন। বিহের মুক্ত বাতাসে ওদেরাই কথাবার্তা কানে দিয়েছিল।

এসেই ধরক দিয়ে ওঠে আমার উপর : আজ্ঞা মানুষ! আঘাটায় নেমে পড়ে লস্টন দেখাচ্ছ। সকে থেকে আমরা হা-পিতোশে পথ তাকিয়ে আছি। এস, চলে এস—

কোথায় ?

পালোয়ান গোছের এক ব্যক্তি হংকার দিয়ে উঠল : কোথায় যেন জানেন না! আকাশ থেকে পড়লেন।

আকাশ থেকে পড়িনি, জোয়ারের টানে এসে পড়েছি। সত্ত্বই আমি কিছু জানি নে।

থাক, থাক। জাত-যাওয়া কাণ্ড—রাতদুপুরে উনি এখন রান্ধরস শুরু করলেন।

হাত ধরল। উঃ, উঃ— হাড় যেন ঘুঁড়ো হয়ে যায়। লোকটা হাত ছেড়ে দিয়ে

বাস্তুর সুরে বলে, নলীর পুতুল! শুটিগুটি অমন পা ফেললে চলবে না, জোর কদমে ঢেল। লগ্নের আর দেরি নেই।

পাকা-গোফ এক প্রবীণ মানুষ এগিয়ে এসে হাতের লাঠিটা আমার হাতে পেলেন। ভাল মানুষ তিনি, কোমল কষ্টে বললেন, তোমার লস্টনটা আমার হাতে দাও দাদাভাই। অজানা পথ—লাঠি ধরে সাবধান হয়ে আমাদের সঙ্গে এস।

চোখ রগড়ে পরখ করি, ঘুমের ঘোরে স্পন্দন দেখছি না তো ? সকাতেরে বললাম, স্পন্দন—কিসের লপ্ত ? বুবাতে পারছি নে, কেন যেতে হবে আপনাদের সঙ্গে।

হেসে উঠলেন সেই প্রবীণ মানুষটি : ও রামশরণ, শোন শোন— নাতজামাই কেন আমাদের সঙ্গে যাবে, বুবাতে পারছে না। দুনিয়ার এত মুরুক থাকতে শোলাদানায় কেন এসে পড়ে, তা-ও বোধ হয় জানে না।

হো-হো হা-হা বছ কষ্টে উচ্ছল হাসির ধৰনি। একজন বলল, মশালগুলো ধরিয়ে কেল হে। ভূতপ্রেতের মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ, বুব ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

আমার সেই লস্টন খুলে একে একে টেমিতে মশাল ধরিয়ে নিল। হ-হ করে হাওয়া দিয়ে, মশালের আলো কাঁপছে কালো কালো সৃতিগুলোর উপর।

প্রবীণ লোকটি বললেন, আগে পিছে মশাল ধৰ। মেঠো-পথ—হোচ্চট না থায়। নাতজামাই হাঁটিয়ে লিয়ে বাড়ি তুলতে হচ্ছে। তোমারই দোষ দাদাভাই। বোল-বেহারার পালকি ঘাটে বসে আছে এখনো। খবরাখবর করে তাদের নিয়ে আসবার সময় নেই। উঃ, যা কষ্টটা দিয়েছ! বসে বসে বিস্রান্ত হয়ে শেষটা ওৱা বলল, গাঞ্জের কিনারা ধরে এগিয়ে দেখা যাক। তাইতো তোমার পেয়ে গেলাম।

মাঠে নেমে পড়েছি এখন। খমকে দাঁড়িয়ে বললাম, নৌরোজ ওদের কিছু যে বলা হল না—

যা বলবার আমরা বলব। যেতে বলা হচ্ছে, তাই চল না তাড়াতাড়ি।

অধিক তর্ক করবার তাগত নেই। একটিবার হাত ধরেছিল, তার জুমুনি ধামেনি এখনো। রহস্যময় লোকগুলো আমায় দিয়ে চলল। কোথাও আনাখন্দ, কোথাও আল-পথ, কোথাও বা ধান কেটে-নেওয়া জমির উপর দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—দম-দেওয়া এক কলের-পুতুল হয়ে চলেছি।

অবশেষে পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। তেরাখা-পথের উপর তেক্তুলগাছ। আদুরে বাড়ির উঠানে সামিয়ান খাটানো, লিঙ্কর লোকের আনাগোনা অকুহলে পৌছে গেছি।

বর নিয়ে এসেছি—

অমনি তোল-কাঁসি-শানাই বেজে উঠল কোনদিক থেকে। উলু দিছে মেয়েরা, শাখ বাজাচ্ছে। মাঠের দিককার আকাশে শৌ-শৌ করে হাউই উঠে তারা কাটিছে।

কল্যাপক্ষ অবস্থাপন্ন। বিহের আসর খাসা সাজিয়েছে। কাচের হাড়ি ঝোলানো সারি সারি, বাতি জ্বেলে দিয়েছে। রংপো-বাধানো হুকোওলো লোকের হাতে দুরছে—হাকোদানের উপর বড় একটা বসতে পায় না। গোলাপজল ছিটোচ্ছে মন মন।

আ. পি. ভো. প.-৯

১২৯

পুরুত তৈরি হয়ে আছেন। উঠোনে গিয়ে দাঢ়াতে তিনি আর-এক দফা বকতে লাগলেন : ছি-ছি, বড় হেলেমান্থ! একটু যদি কাঞ্জান থাকে তোমাদের! জাত মারবার জো করছিলে। আর দেরি কোরো না, বরাসনে বসে পড়।

আঞ্চাভিমান হঠাত মাথা চাড়া দিয়ে গুঠে। রুবির মুখ ভেসে উঠল মনের উপর। মৃত্যুপথযাত্রী রুবির মার বাস্তা মেয়েটাকে সেই আমার কোলে তুলে দেওয়া।

শান্তন, কাটুন, যা ইচ্ছে করুন—কিছুতে আমি আসনে বসছি নে। গায়ের জোরে বিয়ে দেবেন নাকি?

এক-উঠোন লোকের মধ্যে কেউ চটে না। হাসে, যেন ভারি এক মজার ব্যাপার।

শোন, শোন—গায়ের জোরের বিয়ে নাকি! বর বলছে এই কথা।

আর একজন বলে উঠল, উপোস করে আছে। তার উপর এ-ঘাট ও-ঘাট করে মাথা বিষ্টড়ে গেছে। আসনে বসিয়ে হাওয়া কর, ঠিক হয়ে যাবে।

সেই নিশিরাত্রে বনের প্রাণ্তে বাতির অনুজ্জ্বল আলোয় বিচ্ছিন্ন—জন-সমাবেশের মধ্যে আমি যেন আর এক মানুষ হয়ে যাচ্ছি। অতীত ধূয়ে মুছে আয় নিশ্চিহ্ন। শহরের পিচচালা রাস্তা, পাঁচতলা-সাততলা বাড়ি, সিলেমা-থিয়েটার, ট্রামগাড়ি, মোটরগাড়ি—সমস্ত বুঝি মনের আজগুবি কল্পনা! স্বপ্ন দেবছিলাম নাকি এতক্ষণ—স্বপ্নের ঘোরে এক জহুমায় যেন জীবনের তিরিশটা বছর অতিক্রম হয়েছে। এখন বিষম হাসি পাছে কলকাতা-শহর ইত্যাদি হাস্যকর অনাস্তর কতকগুলো জ্যোগায় কথা মনে ভেবে।

শুভদৃষ্টি। চৌকির উপর দাঢ়িয়েছি টোপরে চাদর ঢাকা দিয়ে। পিড়ির উপর কলে বসিয়ে সাত পাক ঘোরাচ্ছে। চোখ নিচু হয়ে আছে আমার। চোখ মেলে বউ দেখব, এর চেয়ে বেহায়াপনা আর কী হতে পারে! বুকের মধ্যে চিবিব করছে। দেখন-সরা জুলিয়ে দিয়েছে। সরার মধ্যে নানা রুকম বাজির মশলা, জুলিয়ে দিলে চারিদিকে যেন দিনমান হয়ে যায়। শুভদৃষ্টির সময় জুলে এইগুলো। সরা জুলিয়ে পাশ থেকে বলছে, চোখ মেল—চোখ মেল গো! শুভক্ষণে চার চোখের মিলন হবে, তবেই তো আয়োদ-আঙ্গাদে কাটিবে সারাজীবন।

মুদিত পদ্মকলির মতন দু'টি ডাগর চোখ আমার দৃষ্টির সামনে। থরথর কাঁপছে চোখের পাতা—ভোর-রাত্রে পদ্মকলি এমনি করেই বুঝি পাপড়ি মেলে। সরার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, দুই চোখে দীঘির মতো কালো গভীরতা। জল উচ্ছলে পড়ল সেই দীঘি ছাপিয়ে চোখের প্রান্ত বেয়ে। কী তোমার মনোব্যাধি ওগো কল্যা? ইচ্ছে করে, আদর করে চোখ মুছিয়ে দিই। কিন্তু চারিদিকে এত মানুষ—সজ্জায় ঘাড় তুলতে পারিনে, তা হাত দিয়ে চোখ মোছাব!

বাসরঘরে এক শয়ায় আমরা দু'জনে। কত রাত্রি হয়েছে, বলতে পারব না। মাটির দেয়ালের কুলুঙ্গিতে পিলসুজের উপর প্রদীপ জুলচ্ছে। মেঝে-বউগুলো

ঠাণ্ডাতামাসায় অনেক জুলাতন করেছে, জানলার বাইরে এখনো পাতান দিয়ে আছে কি না জানি নে। থাকে থাকুক। ঠেটিই নড়ছে আমাদের, ঠোটে ঠোটে সামান্য বাবধান—কথাবার্তা কারো আর উন্তে হবে না।

মন্ত্র পড়ার সময় নামটা পেয়েছি-গুদ্ধ। সেই নিঃশব্দ কঠে বললাম, পদ্ম, তুমি কেনেছিলে তখন—

না তো!

তা হলে বলছ, কানা তোমার বর? পদ্ম চুপ করে থাকে।

আমায় পছন্দ হয়নি বোধহয়?

পদ্ম বলল, অমন বললে আমার কত কষ্ট হয় জান! সকলে বলছিল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তুমি রাগ করতে লাগলে, বিয়েয় কিছুতে বসবে না। আগে একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল তোমার—একটা মেয়ে আছে। শুনে আমার ভয় করতে লাগল। আচ্ছা, শ সব কি সত্যি?

গোটা কলকাতা শহর যাক বপ্প হয়ে—কিন্তু আমার রুবি! বিষম সন্দেহের দোলায় দুলছি। গুটিসুটি হয়ে রুবি আমার কোলের মধ্যে শুমোয় আজ পাঁচ-পাঁচটা বছর। দরজার ধারে দাঢ়িয়ে থাকে ফিরতে একটু দেরি হলে। ও বাবা, তোমার বিছানা করে রেখেছি এই দেখ। এটুকু মেয়ের কাজ দেখলে তাজব হয়ে যাবেন।.... আর, এইখানেই বিয়ে হয়ে গেল খানিক আগে—পাশে নববধূ—উপোস করে ছিলাম এই লিঙের জন্য—গথ ভুগ করে—দেরি হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ি পৌছতে, সেজন্য এরা খুব উদ্বিগ্ন হয়েছিল— এতজনের কাছে শুনে শুনে মনে হচ্ছে, এটাই সত্য। যে-জীবন এতখানি বয়স ধরে কাটিয়ে এসেছি, সমস্ত ক্ষেমন ধোয়া হয়ে আছে। ভয় হচ্ছে, রুবিও শেষটা ধোয়া হয়ে মিলিয়ে না যায়।

এই দেখ, আবার তুমি মুখ অক্ষকার করালে। হাসে—হাসতে হয় গো আজকের দিনে। তোমার মুখে সব সময় যাতে হাসি থাকে জীবন দিয়ে আমি তাই করব।

আমিও সেটা মনে-প্রাণে মেলে নিছি। হিথা-সন্দেহ-ভয় অনেক ছিল, সমস্ত মুছে গেছে এইটুকু সময় পছন্দ সঙ্গে কাটিয়ে। বললাম, পাড়াগায়ের ব্যাপার—কাল বোধহয় বাসিবিয়ে-তিয়ে—কাল আর যাওয়া হচ্ছে না, যাব আমরা পরত সকালবেলা। গিয়েই তুমি রুবিকে কোলে তুলে নিও সকলের আগে। রুবির মা হোয়ো। আমার মেয়ে যদি হাসে—দেখো, কত হাসি হাসব তখন আমি।

পদ্ম বলল, এরা যদি যেতে না দেয়?

সে কি!

ধর, যদি মরজামাইয়ের মতো এখানে থাকতে হয় চিরকাল। কোন কিছুর অভ্যাস-অন্টন রইল না। তুমি মনিব হলে, কর্তা হলে—আমি তো দাসীবাঁদী আছিই, সকলে তোমার হকুমদার হয়ে কাজকর্ম করবে।

না, না, কুবি তবে ভেদে যাবে নাকিঃ

শুয়ে ছিল পদ্ম, উঠে বসল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে রূপির কথা খানিকক্ষণ। তারপর শুম হয়ে থেকে আস্তে দুরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

সামনে রোঝাক। রোঝাক পার হয়ে কোম দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। টিপ উঠেছে, খোলা দুরজায় এক ফালি জোঞ্জা ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। জোঞ্জা ফিলিক ফুটছে, দিনমানের মতো পরিকার।

পদ্ম ফিরে এল এক অঁচল স্বর্ণচাপা নিয়ে। সুগন্ধে ঘর ভরে গেছে। বলে, নিম্ন ডালে অনেক ফুটে ছিল। তোমার জন্মে তুলে নিয়ে গেলাম। নাও।

দু-হাত পেতে নিলাম। অঞ্জলি ভরে গেল। ফৌস করে এক দীর্ঘস্থান ফেলে পদ্ম—আমার বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে। বললাম, তুমি বড় ভাল পদ্ম—তোমার জন্য সমস্ত ছাড়তে পারি। কেবল সেই আমার মা-হারা যেয়ে—কেও নেই তাকে দেবানন্দ করবার। পাঁচ-দুরোরে ঠেলা থেয়ে মরবে। আসবার সময় দু-হাতে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল, হাত ছাড়িয়ে দিয়ে চলে এলাম।

আবার বলি, রাগ করলে পদ্ম?

জবাব দিতে গিয়ে পদ্মের কথা ফোটে না। জ্যোঞ্জার আলোয় মুখথানা উঠ করে তুলে ধরি। বললাম, কী ভাবছ তুমি বল—

চল, কথা বলতে বলতে যাই।

কোথায়?

এস না। এদের কথায় এন্দুর আসতে পারলে, আমার কথায় যাবে না কেন?

বিয়েবাড়ি এখন শান্তিতে বেছশ হয়ে সুমুছে, একটি মানুষ জেগে নেই। তেমাথার তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে দুই চোর আমরা তিপিটিপি চলেছি। আরও খানিক এগিয়ে পদ্মের এবার গলা ফুটল। আহা, গানের সুরও এমন মিঠা হয় না। বলে, রংবির কথা ভাবছি। মা না থাকার কষ্ট আমি জানি। আমারও মা নেই—ছিয়াভুরে যমন্ত্রে মারা গেলেন। তখন আমি একেবারে ছেট, বাপসা-বাপসা মনে পড়ে। বাবা আর গায়ের মানুষরা ঘুরতে ঘুরতে শেষটা এই দক্ষিণ দেশে ধান-চালের আবাদে এসে নতুন করে ঘৰাবাড়ি তুললেন।

আমি বললাম, ছিয়াভুরে নয়—পঞ্চাশের মৰ্মন্ত্র। তোমার তুল হচ্ছে।

এই তো সেদিনের কথা—তুল হবার কী আছে। পলাশিতে সিরাজসৌলার নবাবি গেল, তার কিছু পরেই তো।

পদ্ম পাগল নাকি তবে? এতক্ষণের এত কথাবার্তায় টের পাই নি। চলার ধরনেও মনে হচ্ছে পাগল বটে! হাত ধরে যেন ডিঙ্গে নিয়ে চলেছে আমায়।

আমি বলি, আস্তে, আস্তে—

পদ্ম আকাশের দিকে তাকায়। শুকতারা উঠে গেছে। আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠে, পতিবেগ আরও বাঢ়ায়। বলে, সকাল হয়ে গেলে আর তুমি যেতে পারবে না। কেনদিন যাওয়া হবে না। এস, এস—বাঁধে উঠতে হবে তোর হবার আগে।

পায়ে কত কাঁটা ফুটল, নখ ছিঁড়ে গেল উচু-নিচু মাটিতে আঘাত লেগে, শামুকে পা কাটিল জলের মধ্য দিয়ে যেতে। সে যে কত পথ চললাম, তার হিসেব নাই। অবশ্যে বাঁধ দেখতে পাইছি—বাঁধের উপরের সেই গাছগুলো।

বাঁধের নিচে এসে পদ্ম হাত ছেড়ে দিল। বলে, দাঁড়াও একটু।

দুই পায়ে মাথা উঁজে সে প্রণাম করল। অনেকক্ষণ ধরে করছে, ওঠে না।

সম্মেহে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে বলি, আবার দেখা হবে পদ্ম। আমি আসব।

গাছে চড়ার মতন দু-হাত ধরে উচু বাঁধে উঠাই। বোনা নদী বিকশিক করছে গোলবাড়ির ওদিকে। গা শিরশিরি করে ওঠে—বজ্জ্ব শীত।

পদ্ম, জ্বর আসার মতন মনে হচ্ছে। কাঁপুনি লেগেছে।

কোথায় পদ্ম! তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বাঁধের আড়ালে পালিয়ে চৌক করছে বুবি!

পদ্ম, পদ্মরাধী—

মুক্ত আকাশ-তলে গাঙ্গের কিনারে শীতে কাঁপতে কাঁপতে কত ডাকলাম! পদ্ম যেন বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

সকাল হল। দিনের আলোয় মাঠের দিকে তাকিয়ে অবাক, মাঠ কোথা, বিশাল জলাভূমি। কিন্তু আমি যে এই কেওড়াগাছতলা থেকে ডাইনে নেমেই বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। তুল হবে কেমন করে? তোকর থেয়ে জান-পায়ের একটা নখ উল্টে গেছে। আর জ্যামার পকেট ভর্তি পদ্মের দেওয়া স্বর্ণচাপ। জলের মধ্যে, আর যাই হোক, স্বর্ণচাপ ফুটবাব কথা নয়।

কপাল ভাল—বিকেলবেলাই নৌকো পেয়ে গেলাম। গোলপাতা কাটিতে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছে। নৌকো না পেলে রাত্রিবেলা জলজঙ্গলের মধ্যে বাঁধের পেটে না-ও যদি যাই—অস্ত্রাত অভুক্ত অবস্থায় কার্তিকমাসের নতুন হিমে কেওড়াতলায় নিষ্ঠয় মরে পড়ে থাকতাম। আরও এক তাজব—কাল সবে এসেছি, একদিনের মধ্যে বোশেখ থেকে কার্তিকমাসে পৌছাই কি করে!

দুকড়ি মাবি মাতলায় থাকে। এ ক'দিন অনেকের সঙ্গে এই গল্প করেছি। নৌকো থেকে ভাঙ্গায় পা দিয়েই দুকড়ির কাছে গেলাম। বাদামনের সকল শুলুকসজ্জান তার নখদর্পণে। এখন শক্তিসামর্থ্য নেই, আর বাদায় যেতে পারে না, দু-হাতের মধ্যে মুখ উঁজে বসে বসে তামাক টালে। লোকজন কাউকে পেলে বাদামনের গল্প শোনায়।

দুকড়ি বলে, জায়গাটা চিনলাম—শোলাদানার বাঁওড়। শোলাদানা বলে জমজমা এক গী ছিল—ভূমিকল্পে বলে গিয়ে বাঁওড় হল সেখানে। পুরো গ্রামই আছে জলের তলে, দায়ে-দুরকারে কথনে সখনে ভেদে ওঠে। শোলাদানায় গিয়ে তুমি যে আবার ফিরে এলে—এমন কথনো হয় না। জোর কপাল বটে তোমার।

লাল চুল

অনোজ বসু

ছ'মাস ধরিয়া বিয়ের দিন সামন্ত হয় না। তারপর দিন ঠিক হইল তো গোল বাধিল জায়গা লইয়া। মোটে তখন দিন পনেরো বাকি, হঠাৎ নীলমাধবের চিঠি আসিল—কাজিডাঙা অবধি যাওয়া কিছুতেই হইতে পারে না, তাহারা বড়জোর খুলনায় আসিয়া শুভকর্ম করিয়া যাইতে পারেন।

বিয়ের ঘটক শীতলচন্দ্র বিশ্বাস ; চিঠি লইয়া সে-ই আসিয়াছিল। ভিড় সরিয়া গেলে আসল কারণটা সে শেষকালে ব্যক্ত করিল। প্রতিপক্ষ চৌধুরীদের সীমানা কাজিডাঙার ক্ষেত্র তিনেকের মধ্যে। বলা তো যায় না, তিন ক্ষেত্র দূর হইতে কয়েক শত লাঠিও যদি আচমকা বিয়ের নিমজ্ঞনে চলিয়া আসে! তাহারা বরাসন হইতে বর তুলিয়া রাত্রির অঙ্ককারে গাঞ্জ পাড়ি দিয়া বসিলে অজ পাড়াগায়ে জলজঙ্গলের মধ্যে কেবল নিজেদের হাত কামড়ান ছাড়া আর কিছু থাকিবে না।

পাত্র জমিদারের ছেলে : জমিদারের ছেলে ওই একটি মাত্র। অতএব এই ছ'মাস ধরিয়া যে জমিদার-বাড়িতে শুভকর্মের শুরুতর আয়োজন চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই আয়োজনের সত্যকার চেহারটা সহসা উপলক্ষ করিয়া আনন্দে মেঝের বাপের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। অথচ মিনুর মা আড় হইয়া পড়িলেন।— ওই তেইশে মেঝের বিয়ে আয়ি দেবই—বারবার এইরকম গোহগাছ করে শেষকালে যে—না হয় তুমি সেই বি-এ ফেল ছেলের সঙ্গে সন্দেহ ঠিক করে ফেল....

www.banglابookpdf.blogspot.com

কিন্তু অতবড় ঘর ও বরের লোভ ছাড়া সোজা কথা নয়। শেষ পর্যন্ত আবশ্যিকও হইল না। শহরের প্রান্ত সীমায় তৈরব নদীর ধারে সেরেন্টাদারবাবুর এক নৃতন বাড়ি তুলিতেছিলেন। বাড়িটা তিনি করেকদিনের জন্যে ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। সামনের ফাঁকা জমির ইট কাঠ সরাইয়া সেখানে সামিয়ানা খাটাইয়া বরবাত্রি বসিবার জায়গা হইল। পিছলে খাওয়ার জায়গা। যদি দৈবাং বৃষ্টি চাপিয়া পড়ে তাহা হইলে দোতলার দরদালানে সন্তু-আশিজ্ঞ করিয়া বসাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ও আছে।

বিকালে পাঁচখানা গুরুর গাড়ি বোঝাই আরও অনেক আঞ্চলিক কুটুম্ব আসিয়া পড়িল। লগু সাড়ে আটটায়।

রানী বলিল, মাসিমা, হিরণ্যের বিয়ের বেলায় আপনি বড় অন্যায় করেছিলেন। সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি যে জামাই নিয়ে খাওয়াতে বসবেন—সে হবে না কিন্তু—

মিনুর মা হাসিলেন।

না, সে হবে না, মাসিমা। আমরা শমন্ত রাত বাসর জাগব, কোন কথা শুনব না, বলে দিচ্ছি। নয় তো বলুন, এক্ষুনি কের গাড়িতে গিয়ে উঠে বসি।

রসুই ঘরের দিকে হঠাৎ তুমুল গওগোল। বেড়ার ওপর কে জুলন্ত কাঠ ঢেক দিয়া রাখিয়াছিল, একটা অগ্নিকাণ্ড হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস, কাজটা বামুন ঠাকুরের ; তাই রাগ করিয়া কে তার গাঁজার কলিকা ভাঙিয়া দিয়াছে। পৈতা হাতে বারবার ব্রাহ্মণ সন্তান দিব্য করিতেছিল—বিনা অপরাধে তাহার শুরুদণ্ড হইয়া গেল, অগ্নিকাণ্ডে কলিকা দোষ নাই। তিনদিনের মধ্যে সে কলিকা একেবারে হাতে লয় নাই।

বেলা ডুবিয়া যাইতে শীতল ঘটক আসিয়া উঠালে দাঢ়াইল, খবর কি ? খবর কি ?

www.banglابookpdf.blogspot.com

শীতল কহিল, খবর ভাল। বর, বরবাত্রী সব ওদের বাসাবাড়ি পৌছে গেছেন। অজবাবুর বড় মোটর এনে সাজান হচ্ছে। মন্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়বেন।

তারপর হাসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিতে লাগিল, একশ' বরকন্দাজ গাঙ্গের ঘাট আগলাচ্ছে। কি জানি, কিছু বলা যাব না। আমাদের কর্তাবু একবিন্দু খুত খেখে কাজ করেন না।

মোটরের আওয়াজ উঠিতেই ধূপধাপ করিয়া আটদশটা মেয়ে ছুটিল তেতলার ছাতে। সকলের পিছন হইতে নিন্ম বলিল, যাওয়া ভাই, অনর্থক। ছাত থেকে কিছু দেখা যাবে না। তার চেয়ে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে—

কৌতুহল চোখমুখ দিয়া যেন ছিটকাইয়া পড়িতেছে ; ঠাট্টাতামাশা—ছুটাছুটি—মাবো মাবো হাসির তরঙ্গ ; তার মধ্যে যুক্তি বিবেচনার কথা কে শুনিবে ?

রানী সকলের আগেভাগে ঝুকিয়া পড়িয়া হাপাইতে হাপাইতে আঙুল দিয়া দেখাইল, ওই, ওই—বর—দেখ—

মরবি যে এক্ষুনি পড়ে—ছাতের এখনে আলসে হয়নি দেখেছিস ? বলিয়া আর একটি মেয়ে রানীকে পিছে তেলিয়া নিজে আগে আসিল। যেন সে মোটেই পড়িতে পারে না। জিজ্ঞাসা করিল, কই ? ও রানী, বর দেখলি কোন দিকে।

গলায় কুলের মালা—ওই যে। দেখতে পাও না—তুমি যেন কি ব্রকম সেজদি।

সেজদি বলিল—মালা না তোর মুক্তি। ও যে এক বুড়ো—সাদা চাদর কাঁধে। থুথুরে মাগো, তিন কালের বুড়ো—ও বরের ঠাকুরদাদা। বর এতক্ষণে কোনকালে আসলে গিয়ে বসেছে—

ছাতের উপর হইতে বরাসন নজর চলে না, দেখা যায় কেবল সামিয়ানা। নিন্ম বলিল, বলেছি তো অনর্থক। তার চেয়ে নিচে গোলকুঠুরির জানলা দিয়ে দেখিগে চল।

চল, চল—

অবকাশে নদী মন্দুত্য গানের সুর তুলিয়া বহিয়া যাইতেছে। ওপারেও যেন কিসের উৎসব—অনেকগুলো আলো, ঢাকের বাজনা....। সহসা এক বালক স্বিঞ্চ বাতাস উহাদের রঙিন শাড়ি, কেশ-বেশের সুগন্ধ উচ্ছল কলহাস্যের টুকরাওলি

ডড়াইয়া হড়াইয়া বহিয়া গেল।

ঘূমিয়ে কে রে ? মিনু ? ওমা মাগো, যার বিয়ে তার মনে নেই ; পালিয়ে এসে চিলেকোঠায় ঘুমোনো হচ্ছে!

রানী হাত ধরিয়া নাড়া দিতে মিনু একবার চাহিয়া চোখ বুজিল।

নিরুৎ বলিল, আহা, সারাদিন না খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ঘুমোক না একটু—আমরা নিচে যাই—

সেজিসি কক্ষার দিয়া উঠিল, পিঙ্গীপলা রাখ দিকি। আমরাও না খেয়ে ছিলাম একদিন। ঘুমোনোর দফা শেষ আজকের দিন থেকে। কি বলিস রে রানী !

বিশেষ করিয়া রানীকেই জিঞ্জাসা করিবার একটা অর্থ আছে। কথাটা গোপনীয়, কেবল সোজনি আড়ি দিতে গিয়া দৈবাং জানিয়া ফেলিয়াছিল। রানী মুখ টিপিয়া হাসিল। দুই হাতে ঘৃমন্ত মিনুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুমো খাইয়া বলিতে লাগিল, মিনু ভাই, জাগো—আজকে ঘুমোতে আছেও উঠে বর দেখবে এস। তারপর মিনুর এলো চুলে হাত পড়িতে যেন শিহরিয়া উঠিল, দেখেছে? সন্ধ্যাবেলায় আবার লেয়ে মরেছে হতভাসী। কৈয়ে তারে চুল শুকলো হচ্ছে। ভিজে চুল নিয়ে এখন উপায় ? এই রাশ বাঁধতে কি সময় লাগবে কয় ? নিচে উলুক্কনি উঠিল। পিসিমা, নন্দরানী, শুভা শুদের সবার গলা।

চল—চল—

চুল বাঁধতে হবে—ওঠে মিনু, শিগগির উঠে আয়।—বলিয়া এলোচুল ধরিয়া জোরে একটান দিয়া রানী ছুটিয়া দলে মিশিল। সিডিতে আবার সমবেত পদক্ষেপনি।

ধড়মড় করিয়া মিনু উঠিয়া বসিল। তখন রানীরা নামিয়া গিয়াছে, ছাতে কেহ নাই। ঘুমচোখে ভাবিল এটা যেন তাদের কাজিডাঙ্গার বাড়ির দক্ষিণের চাতাল। আকাশ ভরিয়া তারা উঠিয়াছে ; ছাতে বাপসা বাপসা আলো, ওদিকে ভয়ানক গওগোল উঠিতেছে।... সব কথা মিনুর মনে পড়িল—আজ তার বিবে, সে ঘূমাইয়া পড়িয়াছিল, সকলে ডাকাডাকি লাগাইয়াছে....। হঠাত নিচের দিকে কোথায় দশ করিয়া সুতীক্ষ্ণ আলো জ্বলিয়া অনেকখানি রশ্মি আসিয়া পড়িল ছাতের উপর। তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া সিডি ভাবিয়া যেই সে পা নামাইয়া দিয়াছে—

চারিদিকে তুমুল হৈ হৈ পড়িয়া গেল। আসর ভাঙ্গিয়া সকলে ছুটিল। হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান চলিতেছিল, পায়ের আঘাতে আঘাতে সেটা যে কোথায় চলিয়া গেল তার ঠিকানা রহিল না। একেবারে একতলার বারান্দায় পড়িয়া মিনু নিশ্চেতন।—জল, জল..., মোটর আলো, ভিড় করবেন না যশাই, সরুন ফাঁক করে দিন...আহা-হা কি কর, মোটরে তোল শিগগির। গামছা কাঁধে কোন দিকে হইতে কল্পার বাপ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আছাড় বাইয়া পড়িলেন।

জঙ্গবাবুর সেই মোটরে চড়িয়া মিনু হাসপাতালে চলিল। বড় রান্তায় বশি দুই পথ গিয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, আর যাইতে হইল না।

বসুন-চৌকি থামিয়া গিয়াছে। দরজার পুবদিকে ছোট লাল চাপরের নিচে সরিটা কলগাছ পুতিয়া বিয়ের জায়গা হইয়াছিল। সেইখানে শব নামাইয়া রাখা হইল। কাচা হলুদের মত গাঢ়ের রঙ, তার উপর নৃতন গহনা পরিয়া যেন রাজরাজেশ্বরী হইয়া শুইয়া আছে। কলে-চন্দন আঁকা ওপ্র কপাল ফাটিয়া চাপ চাপ আমা রক্ত লেপিয়া রহিয়াছে, নাক ও গালের পাশে রক্ত গড়াইয়াছে— মেঘের মত গোলা চুলের রাশি এখানে সেখানে রক্তের ছোপে ডগমগে লাল।

তিতরে-বাহিরে নিদারণ স্তৰতা—বাড়িতে যেন একটা সোক নাই। শবের রাথার উপরে একটি খরজোতি গ্যাস ঝুলিতেছে। বাড়ির মধ্যে স্তৰতা চিরিয়া হঠাত একবার আর্তনাদ আসিল—ওমা, ও মাগো আমার— ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজরানী মা—

নীলমাধব সকলের দিকে চাহিয়া ধূমক দিয়া উঠিলেন, হাত পা ও চিয়ে বসে আছ যে—

বরশয়ার প্রকাও মেহাপ্পি-পালিশ খাট কজনে তানিয়া নামাইয়া আনিল।

এতক্ষণ বেণুধরকে লক্ষ হয় নাই। এইবার ভিড় ছেলিয়া আসিয়া শবের পায়ের কাছে খাটের বাজুতে ভর দিয়া সে তক্ক হইয়া দাঁড়াইল। হাতের মধ্যে কাজলজতা তেমনি ধরা আছে। কাচের মত স্বচ্ছ অচুরল আধ-নিমীলিত দুটি দৃষ্টি, মতার সেই স্থিমিত চোখ দুটির দিকে নিষ্পলক ভাবে চাহিয়া বেণুধর দাঁড়াইয়া রহিল।

বাপ ঝুকিয়া পড়িয়া পাগলের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, একবার ভাল করে চা দিকি.... চোখ তুলে চা—ও ঝুকী....

নীলমাধব ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনি থামিলেন না, সজল চোখে বারবার বলিতে লাগিলেন, ও বেয়াই, বিনি দোষে মাকে আমার কত গালমন্দ দিয়েছি—কোন সবক এন্ততে চায় না, তার সমস্ত অপরাধ নিদর্শন ম্যাং ঘাড় পেতে নিয়েছে, একবার মুখ তুলে একটা কথাও কয়নি। ও ঝুকী, আর বকব না—চোখ তুলে চা' একবার—

ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নীলমাধব ত্রুট্বকষ্টে চিংকার করিয়া উঠিলেন, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে তোমরা ? আটটা বেজে গেছে, রওনা হও।

সাড়ে আটটায় লগু ছিল—বেণুধরের বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল, যেন ক্ষেত্রে তাহাদের শুভদৃষ্টি হইতেছে, লজ্জান্ত বালিকা চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিতেছে না, বাপ তাই মেয়েকে সাহস দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়েন।... ফুল ও দেবদারু-পাতা দিয়া গেট হইয়াছিল, সমস্ত ফুল ছিঁড়িয়া আনিয়া সকলে শবের উপর চালিয়া দিল। বেণুধর গলার মালা ছিঁড়িয়া সেই ফুলের গাদায় ছুটিয়া দ্রুতবেগে ভিড়ের মধ্য দিয়া পালাইয়া গেল।

ছুটিতে ছুটিতে রাস্তা অবধি আসিল : সর্বাঙ্গ দিয়া ঘাবের ধারা বহিতেছে ; পা টলিতেছে, নিশাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। মোটরের মধ্যে বাঁপাইয়া পড়িয়া উন্মানের মত সে বলিয়া উঠিল—চালাও এফুনি—

গাড়ি চলিতে লাগিলে হঁশ হইল, তখনে আগাগোড়া তাহার বরের সাথা, একবোৱা কেট কারিজ, তার উপর সৌখীন ফুলকাটা চাদর—বিয়ের উপলক্ষে পছন্দ করিয়া সমস্ত কেন। একটা একটা করিয়া খুলিয়া পাশে সমস্ত সূপ্লাকার করিতে লাগিল। তবু কি অসহ্য গরম। বেণুর মনে হইল, সর্বদেহ ফুলিয়া ফাটিয়া এবার বুঝি ধামের বদলে রক্ত বাহির হইবে। ক্রমাগত বলিতে লাগিল, চালাও—থুব জোরে চালাও গাড়ি—

সোফাৰ জিঞ্জুসা কৰিল, কোথায় ?

যেখানে থুশি। ফাঁকায়—গ্রামের দিকে—

তীর বেগে গাড়ি ছুটিল। চোখ বুজিয়া চেতনাহীনের মত বেণুধর পড়িয়া রহিল।

সুমুখ-আঁধার রাজি, তার উপর যেঁ করিয়া আরও আঁধার জমিয়াছে। জনবিবৃল পথের উপর মিটমিটে কেরোসিনের আলো যেন প্রেতপুরীর পাহারাদার। একবার চোখ চাইয়া বাহিরের দিকে ভাকাইয়া বেণুধর শিহরিয়া উঠিল, এমন নিবিড় অঙ্ককার সে জীবনে দেখে নাই। দুর্ধারের বাড়িগুলির দরজা-জানলা বড়, ছোট শহর ইতিমধ্যেই নিউতি হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে আম কাঁঠালের বড় বড় বাগিচা।.... সহসা কোথায় কোন দিয়া উচ্ছল হ্যাসির শব্দ ভাসিয়া আসিল, অতি শুরু অস্পষ্ট কোতুক-চঞ্চল অনেকগুলো কঢ়িবর—বড় দেখিয়ে যাও, বড় দেখিয়ে যাও গো—

আশপাশের সারি সারি ঘূর্ণন্ত বাড়িগুলির ছাদের উপর, আমবাপিচার এখানে সেখানে, জ্যাম্পপোক্টের আবহায়ে নানা বয়সের কত মেয়ে কৌতুহল-ভরা চোখে ভিড় করিয়া বড় দেখিতে দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর গাড়ির মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া এক পলকে যেন তাহার গায়ে কাটা দিয়া উঠিল। বধু তাহার পাশে রহিয়াছে, সত্যই একটা বড় মানুষ ঘোমটার মধ্যে জড়সড় হইয়া মাথা লোয়াইয়া একেবারে খদির সঙ্গে মিশিয়া বসিয়া আছে, পায়ে ছেঁয়া লাগিলে যেন সে লজ্জায় মরিয়া যাইবে। তারপর খেয়াল হইল, সে তার পরিত্যক্ত জামা-চাদরের বোৰা, মানবী নয়। এই গাড়িতেই মেয়েটিকে হাসপাতালে লইয়া চলিয়াছিল; সে বসিয়া নাই, তার দেহের দু-এক ফোটা রক্ত হয়তো গাড়ির গদিতে লাগিয়া থাকিতে পারে।

শহর ছাড়িয়া নদীৰ ধারে ধারে গাড়ি ক্রমে মধ্যে আসিল। হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে; চারিদিকে নিশ্চক্ষণে পিষিয়া ভাঙ্গিয়া ছুরিয়া খোয়া-তোলা রাস্তার উপর চাকার পেষণে কর্কশ সুকরূপ আর্তনাদ উঠিতেছে। একটি পল্লীকিশোরীর এইদিনকার সকল সাধ-বাসনা বেণুধরের বুকের মধ্যে কাদিয়া বেড়াইতে লাগিল। চাকার সামনে সে যেন বুক পাতিয়া দিয়াছে। বাহিরে ঘন তিমিরাছন রাত্রি—জনশূন্য মাঠ—কেনদিকে আলোৰ কণিকা নাই। সৃষ্টিৰ আদি মুগের অঙ্ককারলিণ্ণ নীহারিকা-বুলীৰ মধ্য দিয়া বেণুধর যেন বিদ্যুতের গতিতে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, আৰ পাশে পাশে পাড়া দিয়া ছুটিয়া মরিতেছে নিশ্চদচারিণী

মৃতকপা তার বধু। লাল বেনারসীতে ঝুপের বাশি মুড়িয়া লজ্জায় ভাঙ্গিয়া শতখান হইয়া এখানে এক কোণে তার বসিবার স্থান ছিল, কিন্তু একটি মুহূর্তের ঘটনার পরে এখন তার স্থান হইয়াছে সীমাহীন আশ্রয়হীন বিপুল শূন্যতায়—ৱাত্রিন অঙ্ককার মথিত করিয়া বাতাসের বেগে ফরফর শব্দে তার পরনের কালো কাপড় উড়ে, পায়ের আঘাতে জোনাকি ছিটকাইয়া যায়, গতিৰ বেগে সামনে বুকিয়া-পড়া দুল চুল ভরা মাথাটি—মাথার চারিপাশ দিয়া রক্ষেৰ ধারা গড়াইয়া গড়াইয়া বৃষ্টি বহিয়া যায়, এলো চুল উড়ে—দিগন্তব্যাপী ডগমগে লাল চুল।

দুই হাতে মাথা দিপিয়া চোখ বুজিয়া বেণুধর পড়িয়া রহিল। গাড়ি চলিতে লাগিল। যানিক পরে পথের ধারে এক বটতলায় থামিয়া হাটুৰে চালার মধ্যে বাশের সাচার অনেকক্ষণ মুখ গুজিয়া পড়িয়া থাকিয়া অবশ্যে মন কিন্তু শান্ত হইলে বাসাৰাড়িতে ফিরিয়া আসিল।

নীলমাধব প্রভৃতি অনেকক্ষণ আসিয়াছেন। বৰষাত্রীৰ অনেকে মেল টেল ধরিতে সোজা টেশনে গিয়াছে। কেবল কয়েকজন মাঝ—যাহারা খুব নিকট আৰুয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে বালিশ কাঁথা পুটুলি বই যা হয় একটা কিছু মাথায় দিয়া যে যার মত শুইয়া পড়িয়াছেন। অনেক রাত্ৰি। হেৱকেনেৰ আলো মিটমিট করিয়া জুলিতেছে। আলোৰ সামনে ঠিক মুখোমুখি নিৰ্বাক নিষ্ঠুৰ গঞ্জীৰ মুখে বসিয়া নীলমাধব ও শীতল ঘটক।

বেণুকে দেখিয়া নীলমাধব উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন, কাউকে কিন্তু না বলে বেরিয়ে পড়লে—মোটৱ লিয়ে গিয়েছ তনে ভাবলাম, বাসাতেই এসেছ। এখানে এসে দেখি তাও নয়। ভাবি ব্যস্ত হয়েছিলাম। জজ বাবুৰ বাড়িতে বিজয় জিয়ে বসে আছে এখনো।

বেণুধর বলিল, বড় মাথা ধৰল, ফাঁকায় তাই খানিকটে ঘুৰে এলাম—
বলে যাওয়া উচিত ছিল—। বলিয়া নীলমাধব চুপ কৰিলেন।

ছেলে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া পুনৰায় বলিলেন, তোমার খাওয়া হয়নি। দক্ষিণের কোঠায় বাবাৰ-চাকা আছে, বিছানা কৱা আছে, খেয়ে দেয়ে তরে পড়—যাত জাগৰার দৱকার নেই।

ঘৰে গিয়া নীলমাধবেৰ ভৱে চাকা খুলিয়া খাৰার খানিকটা সে নাড়াচাড়া কৰিল; মুখে তুলিতে পাৱিল না।

দালানেৰ পিছনে কোথায় কি ফুল ফুটিয়াছে, একটা উগ্র মিষ্টগঙ্কেৰ আমেজ। মিটমিটে আলোয় রহস্যাছন্ন আধ-অঙ্ককারে চারিদিক চাইয়া চাইয়া মনে হইল, ঘৰ ভৱিয়া কে একজন বসিয়া আছে, তাহাকে ধৰিবৰ জো নাই—অথচ তাহার মিঞ্চ লাবণ্য বন্যাৰ মত ঘৰ ছাপাইয়া যাইতেছে; কোণেৰ দিকে দলিল-পত্ৰ ভৱা সেকেলে বড় ছাপবাৰেৰ আবড়ালে নিবিড় কালো বড় বড় চোখদুটি অভুত খাৰারেৰ দিকে বেদনাহতভাৱে চাইয়া নীৱৰ দৃষ্টিতে তাহাকে সাধাসাধি কৰিতেছে। আলো নিভাইতেই সেই দেহাতীত ইন্দ্ৰিয়াতীত সৌন্দৰ্য অক্ষয় বেণুধরকে কঠিনভাৱে বেঞ্চল কৰিয়া ধৰিল।.....

বাহিরের বৈষ্টকখনায় কথাবার্তা আরম্ভ হইল। শীতল ঘটক নিষ্ঠাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, পোড়াকপালী আজ কার মুখ দেবে উঠেছিল।

তারপর চূপ। অনেকক্ষণ আর কথা নাই।

শীতল আবার বলিতে লাগিল, বুদ্ধি শ্রী ছিল মেয়েটার। মনে আছে কর্তৃবাদু সেই পাকা দেখা দেখতে গিয়ে আগনি বলিলেন, আমার মা নেই, একজন মাকে খুজতে এসেছি। আগনার কথা শুনে মেয়েটি কেমন হেসে ঘাড় নিচু করে রইল—

নীলমাধব গঙ্গীর কচ্ছে বলিয়া উঠিলেন, পামো শীতল।

একেবারেই কথা বন্ধ হইল, দুঃখে চুপচাপ। আলো জলিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে বেণুধরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; জীবনকালের মধ্যে কেবলদিন যাহাকে দেখে নাই, মৃত্যুপথবর্তী সেই কিশোরী মেয়ের ছোট ছোট আশা আকাঙ্ক্ষাগুলি হঠাৎ যেন মাঠ বাড়ি বাগিচা ও এত রাস্তা পার হইয়া জানলা গলিয়া অক্ষকার রখানির মধ্যে তাহার পদতলে মাথা খুড়িয়া মরিতে লাগিল।

তারপর কখন বেণু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; জানলা খোলা, শেষবাটে পূর্বদিগতে চাঁদ উঠিয়া ঘর জ্যোৎস্নায় প্রাবিত করিয়া দিয়াছে, দিগন্তবিসারী তৈরির শান্ত জ্যোৎস্নার সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। হঠাৎ তাহার ঘূম ভাঙ্গিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কি একটা ভাবি অন্যায় হইয়া যাইতেছে....হঠাৎ বড় ঘূম আসিয়া পড়িয়াছিল....কে আসিয়া কতবার ডাকাডাকি করিয়া বেড়াইতেছে। ঘূমের আলসা তখনও বেণুধরের সর্বাঙ্গে ঝড়িয়া আছে; তাহার তন্ত্র-বিকাশ মনের কল্পনা ভাসিয়া চলিল—

ঠক-ঠক-ঠক

খিল-আটা কাঠের কপাটের ওপাশে দাঢ়াইয়া চুপি চুপি এখনো যে ক্ষীণ আঘাত করিতেছে বেণুধর তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পায়।

হাতের চুড়িতলি গোছার দিকে টানিয়া আনা, চুড়ি বাজিতেছে না। শেষ প্রহর অবধি জাগিয়া জাগিয়া তাহার শ্রান্ত দেহ আর বশ মানে না। চোখের কোণে কানু জমিয়াছে। একটু আবদারের কথা কহিল, একবার নাম ধরিয়া ডাকিলে এখনি কানিয়া ভাসাইয়া দিবে। ফিসফিস করিয়া বন্ধ বলিতেছে, দুয়ার খুলে দাও গো, পায়ে পড়ি—

উঠিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনার দরকার; কিন্তু মনে যতই তাড়া, দেহ আর উঠিয়া গিয়া কিছুতেই কঠটুকু স্বীকার করিতে রাজী নয়। বেণুধর দেখিতে লাগিল, বাতাস লাগিয়া গাছের উপরের সত্তা যেমন পড়িয়া যায়, বুপ করিয়া তেমনি দোর গোড়ার বন্ধ পড়িয়া গেল। সমস্ত পিঠ ঢাকিয়া পা অবধি তাহার নিবিড় তিমিরাবৃত চুলের রাশি এগাইয়া পড়িতেছে—বেণুধর দেখিতে লাগিল।

ক্রমে ফর্সা হইয়া আসে। আম বাগানের ডালে ডালে সদ্য ঘূম ভাঙ্গ পাখির কল্পর.... ও ঘর হইতে কে কাশিয়া কাশিয়া উঠিতেছে....। দিনের আলোর সঙ্গে মানুষের গতিবিধি স্পষ্ট ও প্রথর হইতে লাগিল। বেণুধর উঠিয়া পড়িল।

সকালের দিকে সুবিধা মত একটা ট্রেন আছে। অথচ নীলমাধব নিষ্ঠিতে পরম

গঞ্জিবভাবে গড়গড়া টানিতেছিলেন।

বেণু গিরা কহিল, সাতটা বাজে—

বিনাবাকে নীলমাধব দুটা টাকা বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, চা-টা তোমরা দোকান থেকে খেবে নাও—

বাড়ি যাওয়া হবে না?

না—। বলিয়া তিনি গড়গড়ার নল রাখিয়া কি কাজে বাহিরে যাইবার উদ্যোগে উঠিয়া দাঢ়াইলেন।

বেণুধর ব্যাকুল কঢ়ে পিছু হইতে প্রশ্ন করিল, কবে যাওয়া হবে? এখানে কতদিন থাকতে হবে আমাদের?

মুখ কিরাইয়া নীলমাধব ছেলের মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে কি ছিল, তিনিই জানেন—ক্ষণকাল মুখ দিয়া তাঁহার কথা সরিল না। শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, শীতল ঘটক ফিরে না এলে সে তো বলা যাচ্ছে না।

অন্তি পরেই বৃত্তান্ত জানিতে বাকি রহিল না। শীতল ঘটক গিয়াছে তাহিরপুরে। গামটা নদীর আর পারে ক্ষেত্র থানেকের মধ্যেই। ওখানে কিছুদিন একটা কথাবার্তা চলিয়াছিল। যুব বনিয়াদী গৃহস্থ ঘরের মোয়ে; কিন্তু ইদানীং কোলিনাটুকু ছাড়া সে পক্ষের বিশেষ কিছু সম্ভল নাই। অতএব নীলমাধব নিজেই পিছাইয়া আসিয়াছিলেন।

বিজয়কে আড়ালে ডাকিয়া সকল আক্রেশ বেণু তাহারই উপর ঘিটাইল। কহিল, কশাই তোমরা সব!

অথচ সে একেবারেই নিরপরাধ। কিন্তু সে-তর্ক না করিয়া বিজয় সাত্ত্বনা দিয়া কহিল, ভয় নেই ভাই, ও কিছু হবে না। তুঁ ছুঁড়ি তোর বিষে, সে কি হয় কখনো? কাকার ঘেমন কাণ্ড—

তবু বিজয় বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, পাকাপাকি করে এলে কি রকম? এই ঘন্টা দুই তিন আগে বেরুল্লে—কোন খবরাখবর দেওয়া নেই। এর মধ্যে ঠিক হবে গেল?

শীতল সগর্বে নিজের অঙ্গসার বুকের উপর একটি থানা মারিয়া কহিল, এর নাম শীতল ঘটক, বুঝালেন বিজয়বাবু, চান্দিশ বছরের পেশা এই আমার। কিছুতেই রাজী হয় না—হেলো তেলো কত কি আপনি। ফুসফুসে সমস্ত জল করে দিয়ে এলাম।—বলিয়া শুন্য মুখ তুলিয়া ফুর্কার দিয়া মন্ত্রটার স্বরূপ বুবাইয়া দিল।

বেণুধর কহিল, আমি বিষে করব না।

শীতল অবাক হইয়া গেল। সে কেবল অপর দিকের কথাটাই ভাবিয়া রাখিয়াছিল। একবার ভাবিল, বেণুধর শুরিহাস করিতেছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া এদিক ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সন্দিপ্ত সুরে বলিতে লাগিল, তাই

কখনো হয় ছোটবাবু, লক্ষ্মী ঠাকুরদের মত শেয়ে—ছবি নিয়ে এসেছি, মিলিয়ে
দেখুন—কালকের ও মেয়ে এর দাসী বাঁদির ঘুণ্ডি ছিল না।

বেণুধর কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি যা বলার বলে দিয়েছি শীতল,
তুমি বাবাকে আমার হয়ে বলো—

বলিয়া আর উভয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ফুলপরে তাহার ডাক পড়িল।

নীলমাধব বলিলেন, শুনলাম, বিয়েতে তুমি অনিচ্ছুক?
বেণু মাথা হেঁটি করিয়া দাঢ়াইয়া রহিল।

নীলমাধব বলিতে লাগিলেন, তাহলে আমায় আঝাহত্যা করতে বল?

কোন প্রকারে মরিয়া হইয়া বেণুধর বলিয়া উঠিল, কালকের সর্বমৌশে কাজে
আমার মন কিরকম হয়ে গেছে বাবা, আমি পাগল হয়ে যাব। আগ কিছু দিন সময়
দিন আমায়—। বলিতে বলিতে তাহার স্বর কাপিতে লাগিল। একমুহূর্তে
সামলাইয়া লাইয়া বলিল, মরা মানুষ আমার পিছু নিয়েছে—

জ্ঞ বাকাইয়া নীলমাধব হেঁঠের দিকে চাহিলেন। একটুখালি নরম হইয়া বলিতে
লাগিলেন, আর এদিকের সর্বনাশটা ভাব একবার। বাড়িসুন্দর কুটুম্ব গিসগিস
করছে, সতের গ্রাম লেমন্টন। বউ দেখবে বলে সব হাঁ করে বলে আছে। যেমন
তেমন ব্যাপার নয়, এত বড় জেনাজেনীর বিয়ে—আর চৌধুরীদের সেজকর্তা
আসবেন—

অপমানের ছবিগুলি চকিতে নীলমাধবের মনের মধ্যে খেলিয়া গেল।
চৌধুরীদের সেজকর্তা অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি, তিলার্ধ দেরি না করিয়া জপের মালা
হাতে লাইয়াই খড়ম খটখট করিতে করিতে সমবেদননা জানাইতে
আসিবেন—আসিয়া নিতান্ত শিরীহ মুখে উচ্চ কঢ়ে এক হাট লোকের মধ্যে বৃন্দ
অতি গোপনে জিজ্ঞাসা করিবেন, বলি ও নীলমাধব, আসল কথাটা বল দিকি,
বিয়ে এবারও ভাঙল—মেঝে কি তারা অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে?.....

ভাবিতে ভাবিতে নীলমাধব কিণ্ঠ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, না বেণুধর, বউ
না নিয়ে বাড়ি ফেরা হবে না। পরশুর আগে দিন নেই। তুমি সময় চাচ্ছিলে—বেশ
তো, মাঝে এই দুটো দিন থাকল। এর মধ্যে নিশ্চয় মন ভাল হয়ে যাবে।.....

বারোয়ারির মাটে যাত্রা বসিয়াছে। বিকাল হইতে গাঁওনা শুরু। বেণুধর
সমবয়সী জন দুই তিলকে পাকড়াইয়া বলিল, চল, যাই।

বিজয় বলিল, আমার যাওয়া হবে না তো। বিস্তর জিনিসপন্থের বাধাহাঁদা
করতে হবে। রাজ্ঞি কিরে যাচ্ছি।

কেন?

গ্রামে গিয়ে খবর দিতে হবে বউভাতের তারিখ দুটোদিন পিছিয়ে গেল। কাকা
বলালেন, তুমি যাও বিজয়।

গাঢ়ি সেই কোন-রাতে—আমরা থাকব বড়জোর এক ঘন্টা কি দেড়
ঘন্টা—চল, চল—। বেণুধর ছাড়িল না। সকলকে ধরিয়া লাইয়া গেল।

পথের মধ্যে বিজয়কে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে পরত দিন ঠিক হল?
হ্যাঁ—

পরত রাজ্ঞি?

তাছাড়া কি—

চূপ করিয়া খালিক কি ভাবিয়া বেণুধর করুণভাবে হাসিয়া উঠিল। বলিল,
রাখি আসছে, আর আমার ভয় হচ্ছে। তুমি বিশ্বাস করবে না বিজয়, অপঘাতে
মরা গোয়েটা কাল সমস্ত রাত আমায় জুলাতে করেছে—

আবার একটু স্তুর থাকিয়া উচুসিত কঢ়ে সে বলিতে লাগিল, মরা বাপারটা
আর আমি বিশ্বাস করছিনে—এত সাধ আহুদ ভালবাসা পলক ফেলতে না
কেবলে উড়িয়ে পুড়িয়ে চলে যাবে—সে কি হতে পারে? মিছে কথা। এ আমার
অনুমানের কথা নয় বিজয়, কাল থেকে স্পষ্ট করে জেনেছি।

বিজয় ব্যাকুল হইয়া বলিল, তুমি এসব কথা আর বলো না ভাই, আমাদেরও
শুনলে ভয় করে।

ভয় করে? তবে বলো না।—বলিয়া বেণু টিপি টিপি হাসিতে লাগিল।
বলিল, কিন্তু যাই বল, এই শহরে পড়ে থাকা আমাদের উচিত হয়নি—দূরে
পালানো উচিত ছিল। এই আধত্রোশের মধ্যেই কাওটা ঘটল।

যাত্রা দেখিয়া বেণু অভিগৃহ রকম খুশি হইল। ফিরিবার পথে কথায় কথায়
এমন হাসি রহস্য—যেন সে মাটি দিয়া পথ চলিতেছে না। তখন সঙ্গ্য গড়াইয়া
ধিয়াছে। পথের উপর অজস্র কাখিনী ফুল ফুটিয়াছে। ডালপালাসুক তাহার অনেক
ডাল ভাঙিয়া লাইল। বলিল, খাসা গন্ধ! বিছানায় ছাড়িয়ে দেব।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, ফুলশয়ার দেরি আছে হে—

কোথায়?—বলিয়া বেণু গুচুর হাসিতে লাগিল। বলিল, এ পক্ষের দিন রায়েছে
তো কাল। আর তাহিরপুরেরটার—ও বিজয়, তোমাদের নতুন সংস্কৰে
ফুলশয়ার দিন করেছে কবে?

বিজয় বীতিমত রাগিয়া উঠিল, ক্ষেত্র ওই কথায় এ পক্ষ—ও পক্ষ—বিয়ে
তোমার কটা হয়েছে শুনি?

আপাতত একটা: কাল যেটা হয়ে গেল—আর একটার আশায় আছি।
বিজয়ের কাঁধ ধরিয়া বাঁকি দিয়া বেণু বলিতে লাগিল, ও বিজয়, ভয় পেলে নাকি
ও ভয় নেই, আজ সে আসবে না। আজকে কালবাতি—বউয়ের দেখা করবার
নিয়ম নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর বেশ প্রফুল্লভাবে বেণুধর হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম আসে
না। আলো নিভাইয়া দিল; কিছুতে ঘুম আসে না। পাশে কোন বাড়িতে ঘন্টার
পর ঘন্টা ঘড়ি বাজিয়া যাইতেছে। চারিদিকে নিশ্চিৎ। অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুমের

সাধনা করিয়া কাহার উপর বড় রাগ হইতে লাগিল। রাগ করিয়া গায়ের কথা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কাহাকে শুনাইয়া জোরে পারচারি করিতে লাগিল। খণ্টাদ
ক্রমশ আম বাগানের মাথায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।... আবার সে ঘরে চূক্ষণ।
বিছানার পাশে গিয়া মনে হইল, কোন করিয়া নিষ্কাস ফেলিয়া কে যেন কোথাও
পালাইয়া গেল। বাতাসে বাগিচার গাছপালা খসখস করিতেছে। বেণুধর ভাবিতে
লাগিল, মনুন কোরা কাপড় পরিয়া খসখস করিতে করিতে এক অদৃশ্যচারিণী
বনপথে বাতাসে দ্রুতবেগে মিলাইয়া গেল।

পরদিন তাহিরপুরের পাত্রীপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। হাসিমুদ্দিন
আংটি সে হাত পাতিয়া লইল। মনে মনে বাপের বহুশিক্ষার কথা ভাবিল।
নীলমাধব সত্যাই বলিয়াছিলেন, এই দুটোদিন সময়ের মধ্যেই তাহার মধ্যে
আশ্চর্যরকম ভাল হইয়া উঠিয়াছে। চুরি করিয়া এক ফাঁকে বাপের ঘর হইতে
পাত্রীর ছবিটা দেখিয়া আসিল। মেয়ে সুন্দরী বটে। প্রতিমার মত নিখুঁত নিটোল
গড়ন।

সেদিন একখানা বই পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শিয়ালে
তেপায়ার উপর ভাবী বধূর ছবিখানি। মান দীপালোকিত চুনকাম-খসা উচু দেয়াল,
গুরুজের মত খিলান করা সেকেলে ছাত, তাহারই মধ্যে মিলনোৎকৃষ্ট নায়ক-
নায়িকার সুখ-দুঃখের সহগানী হইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে বই পড়িতে লাগিল...
একবার কি রকমে মুখ ফিরাইয়া বেণুধর ত্রুটি হইয়া গেল, স্পষ্ট দেখিতে পাইল,
একেবারে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ—তাহার মধ্যে দিয়া হাত গলাইয়া চাপার কলির মত
পাঁচটি আঙুল লীলায়িত ভঙ্গিতে হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিতেছে। ভাল করিয়া
তাকাইতেই বাহিরের নিকষ কালো অঙ্কারে হাত ডুবিয়া গেল। সে উঠিয়া
জানালায় আসিল। আব কিছুই নাই, নৈশ বাতাসে লতাপাতা দুলিতেছে। সঙ্গে
সে জানালার খিল আটিয়া দিল।

আলোর জ্বার বাড়াইয়া দিয়া বেণুধর পাশ ফিরিয়া শুইল। চটা-ওটা দেয়ালের
ওপর কালোর দেবতা কত কি নয়া আঁকিয়া গিয়াছে। উল্টা-করা তালের
গাছ... একটা মুখের আধখানা ঝুঁটিওয়ালা অনুত্ত আকারের জানোয়ার আব
একটা কিসের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া আছে.... ঝুল কালি ও মাকড়সা জালের
বন্ধীশালায় কালো কালো শিকের আড়ালে কত লোক আটক হইয়া রহিয়াছে....

চোখ বুজিয়া দেখিতে লাগিল—

অনেক দূরে মাঠের ওপারে কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া সারি সারি মানুষ
চলিয়াছে—গিগড়ার মত মানুষের অনন্ত শ্রেণী। লোকালয়ের সীমানায় আসিয়া
কে-একজন হাত উচু করিয়া কি বলিল। মুহূর্তকাল সব স্থির। আবার কি সংকেত
হইল। অমনি দল ভাঙিয়া নানাজনে নানাদিকে পথ-বিপথ ঝোপ জঙ্গল আনাচ
কানাচ না মানিয়া ছুটিতে ছুটিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই রাত্রে আঙ্গিলার খুলায় কোথায় এক পরম দুর্ঘটনী এলাইয়া এলাইয়া

পড়িয়া থাকিয়া থাকিয়া দাপাদাপি করিতেছে—

ওমা—মাগো আমার—ও আমার লক্ষ্মীমানিক রাজগ্রানী মা—

অঙ্ককারের আবহাসে ছোট ছোট ঘুলঘুলির পাশে তরী কিশোরীটি নিষ্কাস বন্ধ
করিয়া আড়ি পাতিয়া বসিয়া আছে। শিয়ালে নৃত্য বধূ চূপটি করিয়া বাসর জাগে।
বর বুকি ঘুমাইল।...

বেণুধর উঠিয়া বসিয়া পরম সেহে শিয়ালে তেপায়ার উপরের
ভবিখানির নিকে তাকাইল। কাল সারা রাত্রি তাহারা জাগিয়া কাটাইবে।

রুক্ষ জানালায় সহসা শূন্য শূন্য করাঘাত শুনিয়া বেণুধর চমকিয়া উঠিল।
শুনিতে পাইল, ভয়াত্ত চাপা গলায় ডাকিয়া ডাকিয়া কে যেন কি বলিতেছে। একটি
অসহায় প্রীতিমতী বালিকা বাপ-মা ও চেনা-জানা সকল আস্তীয় পরিজন ছাড়িয়া
আসিয়া ওট জানালার বাহিরে পাগল হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আজ বেণুধর
তিলার্ধ দেরি করিল না ; দুয়ার খুলিয়া দেখে, ইতিমধ্যে বাতাস বাড়িয়া বড়
বহিতে শুরু হইয়াছে। সন সন করিয়া ঝড় দালানের গায়ে পাক থাইয়া
যাইতেছে।

এসো—

উহ—

এসো—

না।

বাতাসে দড়াম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া গেল। বেণুধর নিনিরীক্ষে অঙ্ককারের
মধ্যে অদৃশ্য পলায়নপরার পিছনে পিছনে ছুটিল। বোঝো হাওয়ায় কথা না
কুটিতে কথা উড়াইয়া লইয়া যায় ; তবু সে যুক্ত কারে বারবার এক অভিমানিনীর
উদ্দেশে কহিতে লাগিল, মিছে কথা, আমি বিয়ে করব না ; আমি যাব না কাল।
তুমি এসো—ফিরে এসো—

নিশ্চী রাত্রি। মেঘতরা আকাশে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। তৈরবের বুকেও যেন
প্রবায়ের জোয়ার সাগিয়াছে। ডাক ছাড়িয়া কুল ছাপাইয়া জল ছুটিয়াছে। বেণুধর
নদীর কূলে কূলে ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। মৃত্যু ও জীবনের সীমারেখা এই
পরম মুহূর্তে প্রলয়-তরঙ্গ লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। পৃথিবীতে এই ক্ষণ প্রতিদিন
আসিয়া থাকে। দিনের অবসানে সন্ধ্যা—তারপর রাত্রি—। পলে পলে রাত্রির
বন্ধুস্পন্দন বাড়ে—তারপর অনেক—অনেকক্ষণ পরে মধ্য আকাশ হইতে একটি
মঙ্গল বিদ্যুৎগতিতে খসিয়া পড়ে, বন্ধান করিয়া মৃত্যুপুরীর সিংহবাহর খুলিয়া যায়,
পৃথিবীর মানুষের শিয়ালে ওপারের লোক দলে দলে আসিয়া বসে, ভালবাসে,
আদর করে, অপের মধ্য দিয়া কত কথা কহিয়া যায়—

আজ স্বপ্নলোকের মধ্যে নয়, জগত দুই চক্র দিয়া মৃত্যুলোক-বাসিনীকে সে
দেখিতে পাইয়াছে। দুটি হাত লিবিড় করিয়া ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবে।
দিগন্তবাপী মেঘবরণ চুলের উপর ডগমগে লাল কয়েকটি রক্তবিন্দু প্রায়াঙ্গকারের
মধ্যে আলোয়ার মত বেণুধরকে দূরে দূরে ঝুটাইয়া লইয়া চলিল।

আ. প্রি. ভৌ. গ.-১০

১৪৫

হলুদপোড়া

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সে-বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিল দিন আগে-পরে গায়ে দু-দুটো খুন হয়ে গেল। একজন মাঝামাঝি জোয়ান মচ্ছ পুরুষ এবং যোল-সতের বছরের একটি রোগী ভীরু মেয়ে।

গায়ের দক্ষিণে ঘোবেদের মজা পুরুরের খারে একটা মৰা গজারি গাছ বহুকাল থেকে দাঢ়িয়ে আছে। স্থানটি ফৌকা, বনজঙ্গলের আবরণ নেই। কাছাকাছি শুধু কয়েকটা কলাগাছ। ওই গজারি গাছটার নিচে একদিন বলাই চক্রবর্তীকে মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মাথাটা আটচির হয়ে ফেটে গেছে, খুব সম্ভব অনেকগুলি লাঠির আঘাতে।

চারিদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল বটে কিন্তু লোকে খুব বিশ্বিত হলো না। বলাই চক্রবর্তীর এইরকম অপমৃতাই আশেপাশের দশটা গায়ের লোক প্রত্যাশা করেছিল, অনেকে কামনা করেছিল। অন্যপক্ষে ত্রুটি মেয়েটির খুন হয়ে দিয়ে হৈ-চৈ হলো কম কিন্তু মানুষের বিশ্বাস ও কৌতুহলের সীমা রইল না। গেরুত্বপূর্বের সাধারণ ঘোয়া মেয়ে, গায়ের লোকের চোখের সামনে আর দশটি মেয়ের মতো বড় হয়েছে, বিয়ের পর খন্ডরবাড়ি গেছে এবং মাসখানেক আগে যথারীতি বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে ছেলে বিয়োবার জন্য। পাশের বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত কোনোদিন কল্পনা করার ছুতো পায়নি যে মেয়েটার জীবনে খাপছাড়া কিছু লুকানো হিল, এমন ভয়াবহ পরিণামের নাটকীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল! গায়ে সব শেষের সাথের বাতিটি বোধ হয় যখন সবে জুলা হয়েছে, তখন বাড়ির পিছনে ডোবার ঘাটে শুভার মতো মেয়েকে কে-বা কারা যে কেন গলা টিপে মেরে রেখে যাবে ভেবে উঠতে না পেরে গাঁসুন্দ লোক যেন অগ্রসূত হয়ে রইল।

বছর দেড়েক মেয়েটা খন্ডরবাড়ি ছিল, গায়ের লোকের চোখের আড়ালে। সেখানে কি এই ভয়ানক অঘটনের ভূমিকা গড়ে উঠেছিল?

দুটো খুনের মধ্যে কি কোনো যোগাযোগ আছে? বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে গায়ের কেউ তেমনভাবে জখম পর্যন্ত হয়নি, যখন হলো পর পর একেবারে খুন হয়ে গেল দুটো। তার একটি পুরুষ, অপরটি যুবতী মারী। দুটি খুনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিঙ্কার করার জন্য প্রাণ সকলের ছাটফট করে। কিন্তু বলাই চক্রবর্তী শুণাকে করে শুধু চোখের দেখা দেখেছিল তাও গায়ের কেউ মনে করতে পারে না। একটুখানি বাস্তব সত্ত্বের খাদের আভাবে নানাজনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজর হয়ে উঠতে উঠতে ঝুঝড়ে যায়।

বলাই চক্রবর্তীর সম্পত্তি পেল তার ভাইপো নবীন। চতুর্থ টাকার চাকরি

হেডে শহর থেকে সপ্রিবারে গায়ে এসে ক্রমাগত কোচার খুটে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে সে পাড়ার লোককে বলতে লাগল, ‘পঞ্চাশ টাকা লিওয়ার্ড ঘোষণা করছি। কাকাকে যারা অমন মার মেরেছে তাদের যদি ফাসিকাটে বুলোতে না পারি—’

চশমার কাঁচের বদলে মাঝে কোচার খুটে সে নিজের চোখও মুছতে লাগল।

ঠিক একুশ দিন গায়ে বাস করার পর নবীনের শ্রী দামিনী সক্ষ্যাবেলা লস্টন থাতে বান্ধায়র থেকে উঠান পার হয়ে শোবার ঘরে যাচ্ছে, কোথা থেকে অতি ম্বু একটু দমকা বাতাস বাড়ির পুর কোণের তেতুল গাছের পাতাকে নাড়া দিয়ে তার গায়ে এসে লাগল। দামিনীর হাতের লস্টন ছিটকে গিয়ে পড়ল দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায়, উঠানে আছড়ে পড়ে হাত-পা ছুড়তে দামিনীর দাঁতে দাঁত লেগে গেল। দালানের আনাচে-কানাচে বড়ো হাত্তো যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম।

শুধুর দাদা ধীরেন স্থানীয় স্কুলে মাটারি করে। গায়ে সে-ই একমাত্র ভাঙ্গার পাস-না-করা। ক্ষিজিত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি., পাস করে সাত বছর গায়ের স্কুলে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছে। প্রথম দিকে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে সাতচলিশবানা বই নিয়ে লাইব্রেরি, সাতজন ছেলেকে নিয়ে তরুণ সমিতি, বই পড়ে পড়ে সাধারণ রোগে লিনামূলো ভাঙ্গারি, এইসব আরম্ভ করেছিল। গেরো একটি মেয়েকে বিয়ে করে দু-বছরে চারটি ছেলেমেয়ের জন্য হওয়ায় এখন অনেকটা বিমিয়ে গেছে। লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা তিনশ'তে উঠে থেমে গেছে, তার নিজের সম্পত্তি হিসাবে বইয়ের আলমারি তার বাড়িতেই তালাবক্ষ হয়ে থাকে, টাঁদা কেউ দেয় না, তবে দু-চারজন পড়া-বই আর একবার পড়ার জন্য মাঝে মাঝে চেয়ে নিয়ে যায়। বছরে দু-তিনবার তরুণ সমিতির মিটিং হয়। চার-আনা আট-আনা ফি নিয়ে এখন সে ভাঙ্গারি করে, ওষুধও বিক্রি করে।

ধীরেনকে যখন ডেকে আনা হলো, কলসী কলসী জল ঢেলে দামিনীর মৃঢ়া ভাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু সে তাকাচ্ছে অথবান দৃষ্টিতে, আপনামনে হাসছে আর কাঁদছে এবং যারা তাকে ধরে বেঞ্চেছিল তাদের আঁচড়ে কামড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ধীরেন গঞ্জির চিত্তিত মুখে বলল, ‘শা’পুরের কৈলাস ভাঙ্গারকে একবার ভাকা দরকার। আমি চিকিৎসা করতে পারি, তবে কি জানেন, আমি তো পাস করা ভাঙ্গার নই, দায়িত্ব নিতে ভরসা হচ্ছে না।’

বুড়ো পন্ডজ ঘোষাল বলাই চক্রবর্তীর অনুগ্রহে বহুকাল সপ্রিবারে পরিপুষ্ট হয়েছিলেন, তিনি বললেন, ‘ভাঙ্গার? ভাঙ্গার কি হবে? তুমি আমার কথা শোনো বাবা নবীন, কুঞ্জকে অবিলম্বে ডেকে পাঠাও।’

গায়ের যারা ভিড় করেছিল তারা প্রায় সকলেই বুড়ো ঘোষালের কথায় সাময় দিল।

নবীন জিজ্ঞেস করল, ‘কুঞ্জ কত নেয়?’

ধীরেন বলল, ‘ছি, ওসব দুর্বুদ্ধি কোরো না নবীন। আমি বলছি তোমায়, এটা অসুখ, অন্য কিছু নয়। লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তুমিও কি বলে কৃজ্ঞকে চিকিৎসার জন্য ডেকে পাঠাবে?’

নীবন আমতা-আমতা করে বলল, ‘এসব খাগছাড়া অসুখে ওদের চিকিৎসাই ভালো ফল দেয় ভাই।’

বয়সে নবীন তিন-চার বছরের বড় কিন্তু এককালে দু-জনে একসঙ্গে ফুলে একই ক্লাসে পাশাপাশি বসে লেখাপড়া করত। বোধহয় সেই থাতিরেই কৈলাস ভাঙ্গার ও কৃষ্ণ মাঝি দু-জনকে আনতেই নবীন লোক পাঠিয়ে দিল।

কৃষ্ণই আগে এল। লোক পৌছবার আগেই সে খবর পেয়েছিল চতুর্বর্তীদের বৌকে অঙ্ককারের অশৱীরী শক্তি আয়োজন করেছে। কৃষ্ণ নামকরা গুণী। তার উপর দেখবার লোভে আরও অনেকে এসে ভিড় বাড়িয়ে দিল।

‘তুরস্বীৰে ভৱ করেছেন, সহজে ছাড়বেন না।’

ওই কালে সকলকে ভয় দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার অভয় দিয়ে কৃষ্ণ বলল, ‘তবে ছাড়তেই হবে শেষতক। কৃষ্ণ মাঝির সাথে তো চালাকি চলবে না।’

ঘরের দাওয়া থেকে সকলকে উঠানে নামিয়ে দেওয়া হলো। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে কৃষ্ণ দাওয়ায় জল ছিটিয়ে দিল। দামিনীর এলোচুল শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হলো দাওয়ার একটা খুঁটির সঙ্গে, দামিনীর না রইল বসবার উপায়, না রইল পালাবার ক্ষমতা। তাকে আর কারো ধরে রাখবার প্রয়োজন রইল না। নড়তে শিয়ে চুলে ঢান লাগায় দামিনী আর্তনাদ করে উঠতে লাগল।

কৃষ্ণ টিচকারি দিয়ে দিয়ে বলতে জাগল, ‘রও, বাছাধন রও! এখনি হয়েছে কি! মজাটি টের পাওয়াছি তোমায়।’

বীজেন প্রথম দিকে চূপ করে ছিল। বাধা দিয়ে লাভ নেই। গায়ের লোক কথা শোনে না, বিগত হয়। এবার সে আর দৈর্ঘ্য ধরতে পারল না।

‘তুমি কি পাগল হয়ে গেছ, নবীন?’

‘তুমি চূপ করো, ভাই।’

উঠানে ত্রিশ-পাঁয়ত্রিশ জন পুরুষ ও নারী এবং গোটা পাঁচেক লক্ষ্ম জড়ে হয়েছে। মেঘেদের সংস্কা খুব কম, যারা এসেছে বয়সও তাদের বেশি। কমবয়সী মেঘেরা আসতে সাহস পায় নি, অনুমতি ও পায়নি। যদি হোয়াচ লাগে, নজর লাগে, অপরাধ হয়! মন্ত্রমুঞ্চের মতো এতগুলি মেঘেপুরুষ দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেবাঘেষি করে দাঁড়িয়ে থাকে, এই দুর্লভ রোমাঞ্চ হেকে তাদের বক্ষিত করার ক্ষমতা নবীনের নেই। দাওয়াটি যেন টেজ, সেখানে যেন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অতীত রহস্যকে সহজবোধ্য নাটকের কাপ দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে, ঘরের দুয়ারে কৃষ্ণ যেন আমদানি করেছে জীবনের শেষ সীমানার ওপারের ম্যাজিক। এমন ঘরোয়া, এমন বাস্তব হয়ে উঠেছে দামিনীর মধ্যে আদৃষ্টি ভয়হকরের এই ঘনিষ্ঠ আবির্ভাব। তব সকলে ভুলে গেছে। শুধু আছে তীব্র উত্তেজনা এবং কৌতুহল-ভরা পরম উপভোগ্য শিহরণ।

এক পা সামনে এগিয়ে, পাশে সরে, পিছু হটে, সামনে পিছনে দূলে দূলে কৃষ্ণ দুর্বোধ্য মন্ত্র আওড়াতে থাকে। মানসাতে আগুন করে তাতে সে একটি-দুটি শুকনো পাতা আর শিকড় পুড়তে দেয়, চামড়া পোড়ার মতো একটা উৎকট গঙ্গে চারিদিক তরে থায়। দামিনীর আর্তনাদ ও ছটফটানি ধীরে ধীরে কমে আসছিল, একসময়ে খুঁটিতে পিঠ ঠেকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে বোজা-বোজা চোখে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে নিশ্চন্দ হয়ে রইল।

তখন একটা কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে কৃষ্ণ তার নাকের কাছে ধরল। দামিনীর চুলচুলু চোখ ধীরে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। সর্বাঙ্গে ঘন ঘন শিহরণ বয়ে যেতে লাগল।

‘কে তুই? বল, তুই কে?’

‘আমি তুম্বা গো, তুম্বা। আমায় মেরো না।’

চাটুয়োবাড়ির তুম্বা? যে খুন হয়েছে?’

‘হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমায় মেরো না।’

নবীন দাওয়ার একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, তার দিকে মুখ ফিরিয়ে কৃষ্ণ বলল, ‘ব্যাপার বুঝলেন কর্তা?’

উঠান থেকে চাপা গলায় বুড়ো ঘোঘালের নির্দেশ এল, ‘কে খুন করেছিল, অধোও না কৃষ্ণ? ওহে কৃষ্ণ, তনছো? কে তুম্বাকে খুন করেছিল অধিয়ে নাও চট্ট করে!’

কৃজ্ঞকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হলো না, দামিনী নিজে থেকেই ফিসফিস করে জানিয়ে দিল, ‘বলাই খুড়ো আমায় খুন করেছে।’

নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অনেকবার তাকে প্রশ্ন করা হলো কিন্তু দামিনীর মুখ দিয়ে এ ছাড়া আর কোনো জবাব বার হলো না যে সে তুম্বা এবং বলাই তাকে খুন করেছে। তারপর একসময় তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নাকে হলুদপোড়া ধরেও আর তাকে কথা বলানো গেল না। কৃষ্ণ অন্য একটি প্রতিয়ার আয়োজন করছিল কিন্তু কৈলাস ভাঙ্গার-এসে পড়ায় আর সুযোগ পেল না। কৈলাসের চেহারাটি জমকালো, প্রকাও শরীর, একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মোটা ভুক আর মুখময় খোঁচা গোফদাঢ়ি। এসে দাঁড়িয়েই ঘাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে সে সকলকে গালগালি দিতে আরজি করল, কৃষ্ণের আগুনের মালসা তার দিকেই লাখি মেরে হুঁড়ে দিয়ে বলল, ‘দাঁড়া হারামজাদা, তোকে ফাঁসিকাটে বুলোছি! শুধু দিয়ে বৌমাকে আজ মেরে ফেলে থানায় তোর নামে রিপোর্ট দেব, তুই খুন করেছিস।’

কৈলাস খুঁটিতে বাঁধা চুল খুলে দামিনীকে ঘরে নিয়ে বলাই-এর দাদামশায়ের আমলের প্রকাও থাটের বিছানায় শুইয়ে দিল। প্যাট করে তার বাহতে হুচ খুঁটিয়ে গায়ে মুকিয়ে দিল ঘুমের ওষুধ।

দামিনী কাতরভাবে বলল, ‘আমায় মেরো না গো, মেরো না। আমি তুম্বা। চাটুয়োবাড়ির তুম্বা।’

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে শুমিয়ে পড়ল।

দামিনীর মুখ দিয়ে শুন্ডি বলাই চক্রবর্তীর নাম করায় অনেক বিশ্বাসীর মনে থেকে ধার্ঘার সৃষ্টি হয়েছিল, বুড়ো ঘোষালের ব্যাখ্যা শুন সেটা কেটে গেল। শুন্ডির তিনি দিন আগে বলাই চক্রবর্তী মরে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু শুধু জ্যান্ত মানুষ কি মানুষের গলা টিপে মারে? আর কিছু মারে না। শাশানে-শাশানে দিনক্ষণ প্রতিব যোগাযোগ ঘটলে পথভোগ পথিকের ঘাড় তবে মাঝে মাঝে মটকে দেয় কিসে!

ব্যাখ্যাটা দেওয়া উচিত ছিল কুণ্ঠ শুণীর। বুড়ো ঘোষাল আগেই সকলকে শনিয়ে দেওয়াতে জোর গলায় তাকে সমর্পণ করেই নিজের মর্যাদা বাঁচানো ছাড়া তার উপায় রইল না। তবে কথাটিকে সে মুরিয়ে দিল একটু অন্যভাবে, যার ফলে অবিশ্বাসীর মনে পর্যন্ত খটকা বাঁধা সংস্কর হয়ে উঠল। বলাই চক্রবর্তীই শুন করেছে বটে কিন্তু সোজাসুজি নিজে নয়। কারণ মরার এক বছরের মধ্যে সেটা কেউ পারে না, ওই সময়ের মধ্যে শ্রান্তিশাস্তি না হলে তবেই সোজাসুজি মানুষের শক্তি করার ক্ষমতা জন্মায়। বলাই চক্রবর্তী একজনকে ভর করে তার মধ্যস্থতায় শুন্ডিকে খুল করেছে, তার বক্তুমাংসের হাত দিয়ে।

না, যাকে সে ভর করেছিল তার কিছু মনে নেই। মনে কি থাকে?

এক রাত্রে অনেক কান ঘুরে পরদিন সকালে এই বিধান্তি ধীরেনের কানে গেল। অগ্রহায়ণের উজ্জ্বল মিঠে রোদ তখন চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, বর্ষার পরিপূর্ণ গাছে আর আগ্রহায় জঙ্গলে যেন পার্থিব জীবনের ছড়াছড়ি। বাড়ির পিছনে ডোবাটি কচুরিপানায় আচ্ছন্ন, গাঢ়-সবুজ অসংখ্য বসালো পাতা, বর্ণনাতীত কোমল রঙের অপরূপ ফল। তালগাছের গুঁড়ির ঘাটটি কার্তিক মাসেও প্রায় জলে ঝুঁকে ছিল, এখন জল কমে অর্দেকের বেশি ভেসে উঠেছে। টুকরো বসিয়ে ধাপগুলি এবার ধীরেন বিশেষ করে শুন্ডির জন্য বানিয়ে দিয়েছিল, সাত মাসের গর্ত নিয়ে ঘাটে উঠতে-নামতে সে যাতে পা পিছলে আছাড় না থায়। পাড়ার মানুষ বাড়ি বয়ে গায়ের গুজব শনিয়ে গেল, আবেষ্টনীর প্রভাবে উন্ন্যট কথাগুলি সঙ্গে ধীরেনের মন থেকে বাতিল হয়ে গেল। সুকল হৃষির অবসরও সে গেল না। ডোবার কোলদিক থেকে কিভাবে কে সেদিন সক্ষ্যায় ঘাটে এসেছিল, কেন এসেছিল, এই পুরাণে ভাবনা সে ভাবিল অনেকক্ষণ থেকে। তাই সে ভাবতে লাগল। একমাত্র এই ভাবনা তাকে অন্যমনক করে দেয়। স্নোভ ও বিদাদের তার এত প্রাচুর্য এখন যে মাঝে মাঝে কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনক হতে না পারলে তার অসহ্য কষ্ট হয়। অন্য কোনো বিষয়ে তার মন বসে না।

ভাবের থালা সামনে ধরে দিয়ে শাস্তি বলল, ‘আমার কিছু মনে হয় তাই হবে। নইলে—’

কটমট করে তাকিয়ে ধীরেন ধরক দিয়ে বলল, ‘চুপ! যা খুশি মনে হোক তোমার, আমায় কিছু বলবে না। খপ্রদার!

কুলে যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হলো, মুখে তারা কিছু বলল না কিন্তু তাদের তাকানোর ভঙ্গি যেন আরও স্পষ্ট জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল ও কথাটা তুমি কি ভাবে নিয়েছ শুনি? পুরুত্থাকুর তাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে দোম

মোচনের জন্য দরকারী ক্রিয়াকর্মের বিষয় আলোচনা করলেন, উপদেশ দিলেন, বিশেষ করে বলে দিলেন যে কুল থেকে ক্রিবার সময় তাঁর বাড়ি থেকে সে যেন তাঁর নিজের ও বাড়ির সকলের ধারণের জন্য মাদুলি নিয়ে থায়। কুলে পা দেওয়ার পর থেকে ধীরেনের মনে হতে লাগল, সে যেন বাইরের কোনো বিশিষ্ট অভ্যাগত, কুল পরিদর্শন করতে এসেছে, তাঁর সাত বছরের অভ্যন্তর অস্তিত্বে আজ এক মুহূর্তের জন্য কেউ ভুলতে পারছে না।

প্রথম ঘন্টাতেই ক্লাস ছিল। অর্ধেক ছেলে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, বাকি অর্ধেক নিজেদের মধ্যে গুজপাজ ফিসফিস করছে। নিজেকে জীবন্ত ব্যক্তের মতো মনে হচ্ছিল। বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ধীরেন পড়াতে লাগল। চোখ তুলে ছেলেদের দিকে তাকাতে পারল না।

ঘন্টা কাবার হতেই হেডমাটার ডেকে পাঠালেন।

‘তুমি একমাসের ছুটি নাও ধীরেন।

‘এক মাসের ছুটি?’

মথুরবাবু এইমাত্র বলে গোলেন। আজ থেকেই ছুটি পাবে, আজ আর তোমার পাড়িয়ে কাজ নেই।

মথুরবাবু কুলের সেত্রেটারি। মাইল থানেক পথ হাঁটলেই তাঁর বাড়ি পাওয়া যায়। চলতে চলতে মাঝপথে ধীরেনের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল। কুল থেকে হাঁট চেতনায় বাঁকি লেগে মাথাটা তার এইরকম ঘুরে উঠে। চিন্তা ও অনুভূতির আকস্মিক পরিবর্তনের সঙ্গে এই বাঁকি লাগে। অথবা এমনি বাঁকি লেগে তার চিন্তা ও অনুভূতি বদলে যায়।

গাছতলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। মথুরবাবু এখন হয়তো বেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন, এখন তাঁকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি, এক মাসের ছুটি দেওয়া হয়েছে। একমাসের মধ্যে মথুরবাবুর সঙ্গে দেখা করার অনেক সময় সে পাবে। আজ গিয়ে হাঁটে-পায়ে না ধরাই ভালো। মথুরবাবুর যদি দয়া হয়, যদি তিনি বুঝতে পারেন যে তার বোন-শুল হয়েছে বলে, দামিনীর ঘোষণার ফলে তার বোনের কাঙ্গনিক কেলেক্ষার নিয়ে চারিদিকে হৈ-চৈ হচ্ছে বলে তাকে দোষী করা উচিত নয়, তাহলে মুশ্কিল হতে পারে। ছুটি বাতিল করে কাল থেকে কাজে যাবার অনুমতি হয়তো তিনি দিয়ে বসবেন। এতক্ষণ বেয়াল হয়নি, এখন সে বুঝতে পেরেছে, নিয়মিতভাবে প্রতিদিন সুলে ছেলেদের পড়ানোর ক্ষমতা তার নেই। মথুরবাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে লজ্জা হচ্ছে। চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয়ে সে মাঝের পথ ধরে বাড়ি চলেছে। বাড়ি গিয়ে ঘরের মধ্যে শুকোতে হবে। দুর্বল শরীর বিহানায় লুটিয়ে দিয়ে তারী মাথাটা বালিশে রাখতে হবে।

সারা দুপুর ঘরের মধ্যে তায়ে বসে হটফট করে কাটিয়ে শোষবেলায় ধীরেন উঠানে বেরিয়ে এল। মাজা বাসন হাতে নিয়ে শাস্তি ঘাউ থেকে উঠে আসছিল, জেবার ধারে প্রকাও বাশবাড়িটার ছায়ায় মানুষের মতো কি যেন একটা নড়াচড়া

করছে।

ধীরেন আর্টনাদ করে উঠল, 'কে খালে ? কে ?'

শান্তির হাতের বাসন ঘানঘন শব্দে গড়ে গেল। উঠিপড়ি করে কাছে ছুটে এসে ভয়াত্ত কষ্টে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় কে ? কোনখানে ?'

বাশবাড়ি থেকে চেনা গলার আওয়াজ এল।—'আমি, মাট্টারবাবু! বাশ কাটছি।'

'কে তোকে বাশ কাটতে বলেছে ?'

শান্তি বলল, 'আমি বলেছি। ক্ষেত্রপিসি বলল, নৃতন একটা বাশ কেটে আগা মাথা একটু পুড়িয়ে ঘাটের পথে আড়াআড়ি ফেলে রাখতে। ভোরে উঠে সরিয়ে দেব, সকের আগে পেতে রাখব। তুমি যেন আবার ভুল করে বাশটা ডিঙিয়ে যেও না।'

সন্ধ্যার আগেই শান্তি আজকাল রাধাবাড়ি আর ধরকন্দুর সব কাজ শেষ করে রাখে। অঙ্ককার ঘনিয়ে আসার পর ধীরেনকে সঙ্গে না নিয়ে বড় ঘরের চৌকাঠ পার হয় না। ছেলেমেয়েদেরও ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। সন্ধ্যা থেকে ঘরে বন্দী হয়ে ধীরেন আকাশপাতাল ভাবে আর মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে ছেলেমেয়েদের আলাপ শোনে।

'ছোটপিসি ভূত হয়েছে।'

'ভূত নয়, পেঁচু। বাটাছেলে ভূত হয়।'

ঘরের মধ্যে কারণে অকারণে শান্তি ভয় পেয়ে আতঙ্কে ওঠে। কাল প্রথম রাতে একটা পাঁচার ভাক শুনে ধীরেনকে আকড়ে ঘরে গোজাতে গুমি করে ফেলেছিল।

বড় ঘরের দাওয়ার পুর প্রাতে বসে তামাক ঢানতে ঢানতে দিশের আলো ঝাল হয়ে এল। এখানে বসে ডোবার ঘাট আর দু-ধারের বাশবাড়ি ও জঙ্গল দেখা যায়। জঙ্গলের পর সেনেদের কলাবাগান। সেনেদের কাছাকাছি ঘরের পাশ দিয়ে দূরে বোসেদের মজা পুরুরের তীরে ঘরা গজার গাছটার ডগা চোখে পড়ে। অঙ্ককার হাবার আগেই কুঁয়াশায় প্রথমে গাছটা, তারপর সেনেদের বাড়ি আবছা হয়ে ঢাকা পড়ে গেল।

'তুমি কি আর ঘাটের দিকে যাবে ?' শান্তি জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'তবে বাশটা পেতে দাও।'

'বাশ পাততে হবে না।'

শান্তি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'তোমার চোখ লাল হয়েছে। টকটকে লাল।'

'হোক।'

শোবার ঘর আর রান্নাঘরের ভিত্তির সঙ্গে দুটি প্রাত টেবিলে নিজেই বাশটা পেতে দিল। কাঁচা নাশের দু-প্রাতের খানিকটা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অশ্বীরী কোনোকিছু এ বাশ ডিঙ্গোতে পারবে না। ঘাট থেকে উত্তা ঘদি নাড়ির উঠানে

আসতে চায়, এই বাশ পর্যন্ত এসে ঠেকে যাবে।

আলো ঝালার আগেই ছেলেমেয়েদের খাওয়া শেষ হলো। সন্ধ্যাদীপ না ঝুলে শান্তির নিজের খাওয়ার উপায় নেই, ভালো করে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে আড়াতাড়ি দীপ ঝুলে ঘরে ঘরে দেখিয়ে শাখে ফুঁ দিল। দশ মিনিটের মধ্যে নিজে থেয়ে ধীরেনের ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রেবে, রান্নাঘরে তালা দিয়ে, কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে চুকল। বিকালে আজকাল সে মাছ রান্না করে না, এটোকাটা নাকি অশ্বীরী আঘাতে আকর্ষণ করে। খাওয়ার হাস্তামা খুব সংক্ষেপে, সহজে এবং অন্ত সময়ে সম্পন্ন হয়ে যায়।

'ঘরে আসবে না ?'

'না।'

তখনো আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাস্টুকু মুছে যায়নি। দু-তিনটি ভারা দেখা দিয়েছে, আরও কয়েকটি দেখা দিতে দিতে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। আর এক মিনিট কি দু-মিনিটের মধ্যে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে। জীবিতের সঙ্গে মৃতের সংযোগ স্থাপনের সবচেয়ে প্রশংসনীয় সময় সন্ধ্যা। ভরসন্ধ্যাবেলা উত্তা দামিনীকে আশ্রয় করেছিল। আজ সন্ধ্যা পার হলে রাত্রি আরম্ভ হয়ে গেলে চেষ্টা করেও উত্তা হয়তো তার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। আর দেরি না করে এবুনি উত্তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত।

চোরের মতো ভিটে থেকে নেমে বাশ ডিঙ্গো ধীরেন পা টিপে টিপে ডোবার মাঠের দিকে এগিয়ে গেল।

অন্ত বিকৃত গলার ভাক শুনে শান্তি লালন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাশের ওপারে দাঁড়িয়ে হিণ্স চাপা গর্জনের মতো গঞ্জীর আওয়াজে ধীরেন তাঁর নিজের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। গেঞ্জি আর কাপড়ে কাদা ও রক্ত মাখ। ঠোঁট থেকে চিরুক বেঞ্জে ফেঁটা ফেঁটা রক্ত পড়িয়ে পড়ছে।

'বাশটা সরিয়ে দাও।'

'ডিঙ্গো এসো! বাশ ডিঙ্গো চলে এসো! কি হয়েছে ? পড়ে গেছ নাকি ?'

'ডিঙ্গোতে পারছি না। বাশ সরিয়ে দাও।'

বাশ ডিঙ্গোতে পারছে না! মাটিতে শোয়ানো বাশ! শান্তির আব এতটুকু সন্দেহ রইল না। আকাশ-চেরা তীক্ষ্ণ গলায় সে আর্টনাদের পর আর্টনাদ শুরু করে দিল।

তারপর প্রতিবেশী এল, পাড়ার লোক এল, পায়ের লোক এল। কুঞ্জও এল। তিন-চার কলস জল ঢেলে ধীরেনকে ঝান করিয়ে দাওয়ার খুটির সঙ্গে তাকে বেঁধে ফেলা হল। মন্ত্র পড়ে, জল ছিটিয়ে, মালসার আগুনে পাতা ও শিকড় পুড়িয়ে ঘন্টাখালেকের চেষ্টায় ধীরেনকে কুঞ্জ নিমুম করে ফেলল।

তারপর মালসার আগুনে কাঢ়া হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ঘরে বাঞ্ছকষ্টে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুই ? বল তুই কে ?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী। উত্তা করেছি।'

অবর্তমান বন্দুক

সমস্তটা দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে একটা চখার পিছনে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যারা কথনও এ কার্য করেন নি তারা বুবতে পারবেন না হয়তো যে, ব্যাপারটা ঠিক কি জাতীয়। ধু-ধু করছে বিরাট বালির চৰ, মাঝে মাঝে ঝাউগাছের রোপ, এক ধার দিয়ে শীতের শীর্ষ গঙ্গা বইছে। চারদিকে জনবানদের চিহ্ন নেই। হ-হ ক'রে তীক্ষ্ণ হাওয়া বইছে একটা। কহলগায়ের খেয়াঘাটে গঙ্গা পেরিয়ে প্রায় ক্রোশ দুই বালির চড়া ভেঙে আমি এই পাবিপার্কিকের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম সকালবেলা। সমস্ত দিন বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বালির চড়া ভেঙে ভেঙে কতখানি যে হেঁটেছি, খেয়াঘাট থেকে কতদূরেই বা চ'লে এসেছি, তা খেয়াল ছিল না। তবে মনে হচ্ছিল, সারাজীবন ধরে যেন হাটছিই, অবিশ্রান্ত হেঁটে চলেছি, চতুর চখাটা কিছুতেই আমার বন্দুকের মধ্যে আসছে না, ক্রমাগত এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে পালাচ্ছে।

আমি এ অঞ্চলে আগত্তুক। এসেছি ছুটিতে বন্দুর বাড়িতে বেড়াতে। আমি নেশাখোর লোক। একটি-আধিটি নয়, তিনটি নেশা আছে আমার— ভৰণ, সঙ্গীত এবং শিকার। এখানে এসে যেই শৰলাম খেয়াঘাট পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই গঙ্গায় পাখি পাওয়া যাবে, লোভ সামলাতে পারলাম না, বন্দুক কাঁধে করে পেরিয়ে পড়লাম। লোভ শৰে মনে করবেন না যে, আমি মাংস খাবার লোভেই পাখি মারতে পেরিয়েছি। তা নয়। আমি নিরামিষ্যাশী। আলুভাতে ভাত পেলেই আমি সত্ত্ব।

খেয়াঘাট পেরিয়ে সকালে চলে এসে প্রথম বখন পৌছলাম, তখন হতাশ হয়ে পড়তে হ'ল আমাকে। কোথায় পারি! ধু-ধু করছে বালির চড়া, আমি কোথাও কিছু নেই। গঙ্গার বুকে দু-একটা উড়ন্ত মাছরাঙ্গা ছাড়া পারি কোথায়। বন্দুক কাঁধে ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় কাঁআঁ শব্দটা কানে এল। কয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার আর অয়ে চন্দ্রবিন্দু আকার দিয়ে যে শব্দটা হয়, চখার শব্দটা ঠিক সে রকম নয়, তবে অনেকটা কাছাকাছি বটে। কাঁআঁ শব্দেই বুরালুম চখা আছে, কোথাও কাছে-পিটে। একটু এগিয়ে গিয়েই দেখি, হ্যাঁ ঠিক, চখাই বটে! কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম মাত্র একটি দেখে। চখারা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় থাকে। বুরালুম, দম্পত্তির একটিকে কোন শিকারী আগেই শেষ ক'রে গেছেন! এটির ভব-যন্ত্রণা আমাকেই ঘোঢ়াতে হবে। সারধানে এগুলো লাগলাম।

কাঁআঁ—

চখা উড়ে গেল। উড়বে জানতাম। চখা মারা সহজ নয়। দাঁড়িয়ে রইলাম খালিকক্ষণ। বেশ খানিকক্ষণ ঘুরপাক খেয়ে আবার সাবধানে এগুলো লাগলাম। কাছাকাছি এসেছি, বন্দুকটি বাগিয়ে বসতে যাব, আর অমনি— কাঁআঁ—

উড়ে গেল। বিরজ হ'লে চলবে না, চখা শিকার করতে হ'লে দৈর্ঘ্য চাই। এবার চখাটা একটু কাছেই বসল। অমিত বসলাম। উপর্যুপরি তাড়া করা ঠিক নয়— একটু বসুক। একটু পরেই উঠলাম আবার। আবার থীরে থীরে এগুলো লাগলাম, কিন্তু উল্টো দিকে। পাখিটা মনে করুক যে, আমি তার আশা হেড়ে দিয়েই চালে যাচ্ছি যেন। কিছুদূর গিয়ে ও-ধার দিয়ে ঘুরে তারপর বিপরীত দিক দিয়ে কাছে আসা যাবে। বেশ কিছুদূর ঘুরতে হ'ল— প্রায় মাইলখানেক। উড়ি মেরে মেরে খুব কাছেও এসে পড়লাম। কিন্তু তাগ ক'রে ঘোড়াটি যেই টিপতে যাব, আর অমনি—কাঁআঁ।

ফের উড়ল। উড়তেই লাগল অনেকক্ষণ ধ'রে। কিছুতেই আর বসে না। অনেকক্ষণ পরে বসল যদি, কিন্তু এমন একটা বেশাপ্লা জায়গায় বসল যে, সেখানে যাওয়া মুশকিল। যাওয়া যায়, কিন্তু গেলেই দেখতে পাবে। আমার কেমন রোক চড়ে গেল, মারতেই হবে পাখিটাকে। সোজা এগিয়ে চললাম। আমি ভেবেছিলাম, একটু এগুলেই উড়বে, কিন্তু উড়লো না। যতক্ষণ না কাছাকাছি হলাম, ঠায় ব'সে রইল। মনে হ'ল, অসম্ভব বুদ্ধি সম্পর্ক হয়; কিন্তু যে-ই বন্দুকটি তুলেছি আর অমনি—কাঁআঁ।

এবারেও এমন জায়গায় বসল যাব কাছে-পিটে কেবল আড়াপ-আবড়াল। নেই— চতুর্দিকেই ফাঁকা। কিছুতেই বন্দুকের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। বাধ্য হয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিতে হ'ল। এবার গিয়ে বেশ ভাল জায়গায় বসল। একটা ঝাউবনের আড়ালে আড়ালে গিয়ে খুব কাছাকাছি ও আসতে পারলাম— এত কাছাকাছি যে তার পালকগুলো পর্যন্ত দেখা যেতে লাগল— ফায়ার করলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

www.banglabookpdf.blogspot.com

লাগল না, খোপে— খোপে যা দু-একটা ছোট পাখি ছিল তারাও উড়ল, মাছরাঙ্গাগুলোও চেচাতে শুরু করে দিলে। সমস্ত ব্যাপারটা হিতুতে আধ ঘণ্টারও ওপর লাগল। নদীর ঠিক বাকের মুখটাতেই বসল আবার চখাটা গিয়ে।

আমি বসেছিলাম একটা বালির চিপির উপর, মুশকিল হ'ল— উঠে দাঁড়ালেই দেখতে পাবে। উঠলাম না। ওয়ে পড়ে গিরগিটির মতো বুকে হেঁটে হেঁটে এগুলো লাগলাম। কিন্তু কিছুদূর গেছি, আর অমনি কাঁআঁ—

আমার মাথাটাই দেখা গেল, না বালির তর দিয়ে কেবল রকম স্পন্দনই গিয়ে। পৌছল তার কাছে, তা বলতে পারি না। উঠে দাঁড়ালাম। রোক আরও চড়ল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সূর্য অন্ত যাচ্ছে। নদীর জল রাঙ্গ-রাঙ্গ। পাখিটা ও-পারের

চরে গিয়ে বসেছে। সমস্ত দিন আমিও ওকে বিশ্রাম দিই নি—ও-ও আমাকে দেয় নি। এখন দুজনে দু'পারে। চুপ ক'রে রইলাম।

সূর্য ভুবে গেল। অস্তমান সূর্য-কিরণে গঙ্গার জলটা যত ভুলত্ত লাগে দেখাইছিল, সূর্য ভুবে খাওয়াতে ততটা আর রইল না। আসন্ন সন্ধ্যার অন্তকালে প্রিয় হয়ে উঠল চতুর্দিক। সমস্ত অস্তরেও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বৈরাগ্য জোগে উঠতে লাগল দীরে দীরে। পূরবী রাগিণী যেন মৃত্য হয়ে উঠল আকাশে, বাতাসে, নদীতরাসে। হঠাত মনে পড়ল—বাড়ি ফিরতে হবে।

কত রাত হয়েছে জানি না।

ঘুরে ঘুরে বেড়াছি গঙ্গার চরে চরে। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি। মধ্যাগামে পূর্ণিমার চাঁদ—চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে শেষে বসলাম একটা উঁচু জায়গা দেখে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসেই রইলাম। এমন একা জীবনে আর কখনও পড়িনি। প্রথম প্রথম একটু তর করছিল যদিও, কিন্তু খালিকপুর পরে ভয়ের বদলে মোহ এসে আমার সমস্ত প্রাণ মান সন্তা অধিকাব ক'রে বসল। আমি মুঝ হয়ে বসে রইলাম। মুঝ হয়ে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। মনে হ'ল, কত জায়গায় কতভাবে ঘুরোছি, প্রকৃতির এমন রূপ তো আর কখনও চোখে পড়ে নি। রূপ নিশ্চয়ই ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। নিজেকে কেমন যেন নথিত মনে হতে লাগল। তারপর সহসা মনে হ'ল, আজীবন সব দিক দিয়েই আমি নথিত। জীবনের কোনও সাধারণ কি পুরোপুরি পূর্ণ হয়েছে? জীবনের তিনটি শখ ছিল—স্বর্গ, সঙ্গীত, শিকার। স্বর্গ করেছি বটে—ছেনে ঢীঘারে চেপে এখানে ওখানে গেছি কিছু তাকে কি স্বর্গ বলে? হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায়, সাহারার দিগন্তগ্রাসারিত অনিচ্ছিতায়, বাণিজ্যক সম্বন্ধের তরঙ্গে, হিমশীতল মেরুপ্রদেশের ভাসমান তৃষ্ণার-পর্বতশৈলে যদি না ভৱণ করতে পারলাম, তা হ'লো আর কি হ'ল। সঙ্গীতেও ব্যর্থকাম হয়েছি। সা রে গা মা সেধেছি বটে; কিন্তু সঙ্গীতের আসল রূপটি আলেয়ার মতো চিরকাল এড়িয়ে এড়িয়ে গেছে আমাকে। সেদিন অত চেষ্টা ক'রেও বাগেশ্বীর করুণগঙ্গীর রূপটি কিছুতেই ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না সেতারে।

ঠিক ঘাটে ঠিক ভাবেই আঙুল পড়ছিল; কিন্তু সেই সুরাটি ফুটল না, যাতে আস্তসম্মানী গঞ্জীর ব্যক্তির নির্জন-রোদনের অবাঞ্ছন্য বেদন মৃত্য হয়। শিকারই বা কি এমন করেছি জীবনে? সিংহ হাতি বাখ গুণ্ডার কিছুই মারি নি। মেরেছি পাখি আর হরিণ। আজ তো সামান্য একটা চখার কাছেই হার মানতে হ'ল।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

চমকে উঠলাম। ঠিক মাথার উপরে চখাটা চক্রকান্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখিরা সাধারণত রাখে তো ওড়ে না—হ্যাতো তব পেয়েছে কোনরকমে। উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—

আরও খানিকটা নেবে এল।

হঠাতে বন্দুকটা তুলে ফায়ার ক'রে দিলাম।

কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—কাঁআঁ—

লেগেছে ঠিক। পাখিটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ল মাঝগঙ্গায়। উদ্বেজিত হয়ে উঠে দাঢ়ালাম—দেখলাম, ভেসে যাচ্ছে।

যাক। জীবনে যা বরাবর হয়েছে, এবাবণ তাই হ'ল। পেয়েও পেপাম না। সাজা, জীবনে কখনই কিছু পাই নি, নামালের মধ্যে এসেও সব ফসকে গেছে।

চুপ ক'রে বসে ছিলাম।

চতুর্দিকে শু-ধু করছে বালি, গঙ্গার কুলুক্কনি অস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নায় ফিলিক ফুটছে। শিকার, চখা, বন্দুক, সমস্ত দিনের শুন্তি কোন কিছুর কথাই মনে হচ্ছিল না তখন, একটা নীরব সুরের সামনে দীরে দীরে ভেসে চালেছিলাম। হঠাতে চমকে উঠলাম। দীর্ঘকাল ব্যজুদেহ এক ব্যক্তি নদী থেকে উঠে ঠিক আমার সামনে দাঁড়িয়ে সংকৃত মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে গামছা দিয়ে গা মুছতে লাগলেন। অবাক হয়ে গেলাম। কোথা থেকে এলেন ইনি, কখন বা নদীতে নাবলেন, কিছুই দেখতে পাই নি।

একটু ইত্তেবের পর জিজাসা করলাম, আপনি কে?

লোকটি গ্রস্ত আমাকে লক্ষ্যে করেন নি।

আমার কথায় মন্ত্রোচ্চারণ থেমে গেল; ফিরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন কলকাতা—তারপর বললেন, আমি এখানেই থাকি। আপনিই আগন্তুক, আপনিই পরিচয় দিন।

পরিচয় দিলাম।

ও, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছেন আপনি! আসুন আমার সঙ্গে, কাছেই আমার আস্তানা।

দীর্ঘকাল ব্যজুদেহ পুরুষটি অগ্রগামী হলেন, আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। একটু দূর গিয়েই দেখি, একটি ছেষ কুটির। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছি, এটা চোখে পড়ে নি আমার। ছেষ কুটিরটি যেন ছবিন মাতল, সামনে পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ, চতুর্দিকে রজনীগঢ়ার গাছ, অজস্র ফুল। অনাবিল জ্যোৎস্নায় ধরণীর অন্তরের আনন্দ সহসা যেন পুন্ডায়িত হয়ে উঠেছে উচ্চ উচ্চ রজনীগঢ়ার উর্ধ্বগুরু বিকাশে। মন্দ সৌরভে চতুর্দিক আছেন। আমিও আছেন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি এসেই ঘরের ভিতরে চুকেছিলেন। একটু পরেই বেরিয়ে এলেন এবং শতরঞ্জি-গোছের কি একটা পাততে লাগলেন।

বসুন।

বসে দেখলাম শতরঞ্জি নয়—গালিচা। খুব দাঁচী নরম গালিচা। তিনিও এক প্রান্তে এসে বললেন। বলা বাঢ়ল্য, আমার কৌতুহল ক্রমশই বাঢ়ছিল। তবে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম, তিনিও চুপ ক'রে রইলেন। শেষে আমাকেই কথা

বলতে হ'ল।

সমস্ত দিন এ অঞ্চলে ঘুরেছি, কিন্তু আপনার দেখা পাই নি কেন ভেনে আশা লাগছে।

সব সময় সব জিনিস কি দেখা যায়?

মুখের দিকে চেয়ে ভয় হ'ল, চোখ দুটো জুলছে—মানুষের নয়, যেন গাঢ়ো চোখ।

একটা গাছ উনুন তা হ'লে। রাজা রামপ্রতাপ রায়ের নাম ওলেছেন? না।

শোনবার কথাও নয়। দুজন রামপ্রতাপ ছিল, দুজনেই জমিদার, একজন সুদুর খোর আর একজন সুর-খোর।

সুর-খোর?

হ্যা, ও-রকম সুর-পাগল লোক ও-অঞ্চলে আর ছিল না। যত বিখ্যাত ওস্তাদদের আড়ত ছিল তাঁর বাড়িতে। আমার অবশ্য এসব শোনা কথা। আমার পাঞ্জাবে জন্ম, পাঞ্জাবী ওস্তাদের কাছেই গান-বাজনা শিখেছিলুম। বাংলা দেশে এসে শুনলুম, রামপ্রতাপ নামে নাকি একজন শুণী জমিদার আছেন, যিনি সুরের প্রকৃত সমর্পনার। প্রকৃত শুণীকে কখনও ব্যর্থমনোরথ হতে হয় নি তাঁর কাছে, গাড়িতে একজনের মুখে কথায় কথায় শুনলুম। তখনই যদি তাঁকে ঠিকানাটাও জিজ্ঞেস করি, তা হ'লে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়, কিন্তু তা না ক'রে আমি সঙ্গাহিত্বাকে পরে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, রাজা রামপ্রতাপ রায় কোথায় থাকেন? তিনি ব'লে দিলেন সুদুরখোর রামপ্রতাপের ঠিকানা। ডানকুনি টেশনে নেবে দশ ক্রেশ হাঁটলে তবে নাকি তাঁর নাগাল পাওয়া যাবে। একদিন বেরিয়ে পড়লাম তাঁর উদ্দেশে। ডানকুনি টেশনে যখন নাবলাম, তখন বেশ ব্যাত হয়েছে। দেনিনও পূর্ণিমা। টেশনে আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম। সুদুরের রামপ্রতাপ ও-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লোক, সবাই চেনে। যাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে, সোজা চ'লে যান। চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলেছিলাম তা ঠিক বলতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে দেখলাম একটা বিরাট প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি, চারদিকে কেবল মাঠ আর মাঠ, কোথাও কিছি নেই। মনে হ'ল যেন শেষও নেই।

কিছুদুরে গিয়েই হঠাৎ সামনে প্রকাও রাজবাড়ী দেখা গেল, যেন মন্তবলে আবির্ভূত হ'ল—সাদা ধৰ্মধর করছে, মনে হ'ল যেন ধৰ্মের পাথর দিয়ে তৈরী। মিনার, মিনারের গমুজ, সিংহদ্বার সমস্ত দেখা গেল ক্রমশ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ, তারপর এগিয়ে গেলাম। প্রকাও সিংহদ্বারের দু'পাশে দেখি দু'জন বিরাটকায় দারোয়ান ব'লে আছে, দুজনেই নিবিষ্টচিত্তে গৌফ পাকাচ্ছে ব'সে। ভিতরে চুকব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কোন উভরই দিল না, গৌফই পাকাতে লাগল। একটু ইতস্তত করে শেষে চুকে পড়লাম, তারা বাধা দিলো না।

ঠিকনে চুকে দেখি বিরাট ব্যাপার, বিশাল জমিদারবাড়ি জমজম করছে; প্রকাও কাঞ্চির-বাড়িতে ব'সে আছে সারি সারি গোমস্তারা। কেউ লিখছে, কেউ টাকা লমছে, কেউ কেউ কানে কলম শুঁজে খাতার দিকে চেয়ে আছে, সবারই গঁষীর মুখ। সামনে চতুরে বসে আছে অসংখ্য প্রজা সারি সারি। সবাই কিন্তু চুপচাপ, কাবও মুখে টু শব্দটি নেই। আমি তানপুরা ঘাড়ে ক'রে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, কেউ আমার দিকে ফিরেও চাইলে না, আমারও সাহস হ'ল না কাউকে কেন কথা জিজ্ঞাসা করতে, আমি ঘুরেই বেড়াতে লাগলাম। আমার মনের ইচ্ছা রাজা রামপ্রতাপকে গান শোনাব, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম, কিছুদুরে হোট একটা বাগান র'য়েছে, বাগানের মধ্যে ধৰ্মধরে সাদা মার্বেল পাথরের উচু চৌতারা, আর সেই চৌতারার উপরে কে একজন ধৰ্মধরে সাদা তাকিয়া ঠেস দিয়ে প্রকাও একটা গড়গড়ায় তামাকে থাছেন। গড়গড়ার কুণ্ডলী—পাকানো নলের জরিণুলো জ্যোত্ত্বায় চকমক করছে। বাগানে হোট একটি গেট, গেটের দু'ধারে উদী-চাপরাস-পরা দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক যেন পাথরের প্রতিমূর্তি। কেমন ক'রে জানি না, আমার দৃঢ় ধারণা হল, ইনিই রাজা রামপ্রতাপ। এগিয়ে গেলাম। দারোয়ান দু'জন নিষ্পন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, বাধা দিলো না। রাজা রামপ্রতাপের কাছাকাছি এসে বুকে প্রণাম করলাম একবার।

তিনি গঁষীরভাবে মাথাটি নাড়লেন একবার শুধু। আন্তে আন্তে বললাম, হঞ্জরকে গান শোনাব ব'লে এসেছি, যদি দ্রুকুম করেন—

তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন, হাতের ইঙ্গিতে আমাকেও বসতে বললেন। তারপর কখন যে আমি দরবারী কানাড়ার আলাপ শুরু করেছি আর কতক্ষণ ধরে যে সে আলাপ চলেছে, তা আমার কিছুই মনে নেই। যখন হঁশ হল তখন দেখি, একছড়া মুক্তের মালা তিনি আমার গলার পরিয়ে দিজ্জেন। মালাটা দেখবেন? কুটিরের ভিতর চুকে গেলেন তিনি, পরম্পুরুতেই তিনি বেরিয়ে এলেন একছড়া মুক্তের মালা নিয়ে। অমন সুন্দর এবং অত বড় বড় মুক্তে আমি আর দেখি নি কখনও।

তারপর?

আমাকে মালা পরিয়ে দিয়ে তিনি আন্তে আন্তে উঠে গেলেন। আমি চুপ করে বসেই রইলাম। তারপর কখন মুমিয়ে পড়েছি, কিছু মনে নেই। সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি, রাজবাড়ির কাছারি-চৌতারা লোকজন—কোথাও কিছু নেই, ফাঁকা মাঠের মাঝখানে আমি একা শুরে মুশুজ্জি!

একা! কি রকম?—সবিশ্বয়ে পশু করলাম।

হ্যা। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে একা—কেউ নেই। পরে খোজ নিয়ে জানলাম, ওণী রাজা রামপ্রতাপ অলেকদিন হ'ল মারা গেছেন। বেচে আছে সেই সুদুরের ব্যাটা। তার বাড়ির পথ সবাই আমাকে ব'লে দিয়েছিল। কিন্তু আমার মনের

একান্ত ইজেছ ছিল গুণী রামপ্রতাপকে গান শোনাবার, তাই তিনি মাঠের মাঝখান
আমাকে দেখা দিয়ে আমার গান শুনে বকশিশ দিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ দূরেই চুপ করে রইলাম। কতক্ষণ তা মনে নেই।

হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, গান শুনবেন?

যদি আপনার অসুবিধে না হয়—

অসুবিধে আবার কি? শুরের সাথনা করবার জন্মেই আমি এই নির্জনবাস
করছি—

আবার উঠে গেলেন। কৃটিরের ভিতর থেকে বিগাট এক তানপুরা বার ক'রে
বললেন, বাগেশ্বী আলাপ করি শুনুন।

শুরু হয়ে গেল বাগেশ্বী। ওরকম বাগেশ্বীর আলাপ আমি কখনও শনি নি। যা
নিজে আমি কখনও আয়ত করতে পারি নি কিন্তু আয়ত করতে চেয়েছিলাম তাহ
যেন শুনলাম আজ। কতক্ষণ শুনেছিলাম মনে নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম
তাও জানি না। ঘুম ভাঙল যখন তখন দেখি, আমি সেই খু-খু বালির চড়ায় একা
ওয়ে আছি, কোথাও কেউ নেই। উঠে বসলাম। উঠতেই নজরে পড়ল চৰাটা
চ'রে বেড়াচ্ছে, ঘরে নি।

আমরা তিনজনেই সবিস্ময়ে ভদ্রলোকের গঢ়টা কৃষ্ণাসে শুনিতেছিলাম।
শিকার উপলক্ষ্যেই আমরা এ অঞ্চলে আসিয়া সক্ষাবেলা এই ডাকবাংলায় আশ্রয়
লইয়াছি। পাশের ঘরেই ভদ্রলোক ছিলেন। আলাপ হইলে আমরা শিকারী শুনিয়া
তিনি নিজের এই অসুস্থ অভিজ্ঞতার গঢ়টা আমাদের বলিলেন। অসুস্থ অভিজ্ঞতাই
বটে! জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর?

তারপর আর কিছু নেই। রাত হয়েছে, এবাট শুতে যান, আপনাদের তো
আবার খুব ভোরেই উঠতে হবে। আমারও ঘুম পাছে—

এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়ে করিলেন। আমরা
কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রইলাম। তাহার পর হঠাৎ আমার কৌতুহল হইল,
কোন অঞ্চলের গঙ্গার চৰে এই কাও ঘটিয়াছিল জানিতে পারিলো আমরাও একবার
জায়গাটা দেখিয়া আসিতাম। জিজ্ঞাসা করিবার জন্য পাশের ঘরে চুকিয়া দেখ,
ঘরে কেহ নাই। চতুর্দিক দেখিলাম, কেহ নাই।

ডাকবাংলার চাপরাসীকে জাগাইয়া গ্রন্থ করিলাম, পাশের ঘরে যে ভদ্রলোক
ছিলেন, তিনি কোথাকাম লোক? চাপরাসী উত্তর দিল, পাশের ঘরে তো কোন
লোক নাই, গত দুই সপ্তাহের মধ্যে এখানে আর কেহ আসে নাই। এ ডাকবাংলায়
কেহ বড় একটা আসিতে চায় না।—বলিয়া সে অসুস্থ একটা হাসি হাসিল।

দেহান্তর

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বরদা বলিল, ‘যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস করে না তাদের জোর করে বিশ্বাস
করাতে যাওয়া উচিত নয়, আমি কখনো সে চেষ্টা করি না। কেবল একবার—’

নিদায়কাল সমুপস্থিত। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন, এই সময় সূর্য প্রচণ্ড
হয় এবং চন্দ্র হয় স্পৃহনীয়। সূর্যের প্রচণ্ডতা পর্যাক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হয়
না; পরতু চন্দ্রের স্পৃহনীয়তা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে আমরা ক্লাবের করেকচন
সভ্য সক্ষ্যাত পর ক্লাবের বিশ্বার্তা অঙ্গনে শতরঞ্জিৎ পাতিয়া বসিয়াছিলাম। পূর্বাকাশে
বেশ একটি নধর চাঁদ গাছপালা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে; তাহার আলোয়
পরম্পর মুখ দেখিতে কষ্ট হয় না। অধিকাংশ সভ্যাই উর্ধ্বদেহিক আবরণ মোচন
করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

ক্লাবের ভৃত্যকে ভাঙ্গের সরবৎ তৈয়ার করিবার ফরমাশ দেওয়া হইয়াছিল।
চন্দ্র যতই স্পৃহনীয় হোক, সেই সঙ্গে বরফ-শীতল সরবৎ পেটে পড়িলে শরীর
আরও সহজে স্থিত হয়। আমরা সত্ত্বাভাবে সরবতের প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম।

এইরূপ পরিবেশের মধ্যে বরদা যখন বলিল, ‘যারা প্রেতযোনিতে বিশ্বাস
করে না—’ ইত্যাদি, তখন আমরা শক্তি হইয়া উঠিলাম। ছুঁচের মত সূক্ষ্ম এই
প্রত্যবন্ধাটি যে অচিরাত ফাল হইয়া গঞ্জের আকারে দেখা দিবে, তাহাতে কারও
সন্দেহ রহিল না। ভৃতের গঢ় শোনার পক্ষে পীছের টাদিনী রাত্রি অনুকূল নয়,
এজন্য শীতের সন্ধ্যা কিংবা বর্ষার রাত্রি প্রশংস্ত। কিন্তু বরদা যখন ভণিতা
করিয়াছেন, তখন আর নিষ্ঠার নাই।

ভাগ্যক্রমে এই সময় সরবৎ আসিয়া পড়িল। আমরা প্রত্যেকে কাট্টিতে
একটি করিয়া ঠাণ্ডা গেলাস তুলিয়া লইলাম। পৃথী গেলাসের কানায় একটি শুদ্ধ
চুমুক দিয়া বলিল, ‘আঃ! দুলিয়াটা যদি মন্তব্যে এই সরবতের মত ঠাণ্ডা হয়ে
যেত—’

বরদা বলিল, ‘দুলিয়া বলতে তুমি কি বোঝ? এই ভারতবর্ষেই এমন জায়গা
আছে, যেখানে এখন বরফ পড়ছে। গত বছর এই সময় আমি পাহাড়ে বেড়াতে
গিয়েছিলুম, দেখলুম দিব্য শীত—’

প্রশ্ন করিলাম, ‘পাহাড়ে? কোন পাহাড়ে?’

বরদা বলিল, ‘মনে কর মনুরী কিংবা নৈনিতাল। নাম বলব না, তবে সৌখ্যে
হাওয়া বদলানোর জায়গা নয়। আমার বড় কুটুব সেখানে বদলি হয়েছেন, তাঁর
আ. পি. ভৌ. প. -১১ ১৬১

নিম্নলিখিত মাসস্থানেক গিয়ে হলুম। সেখানে একটা ঘটনা ঘটেছিল—'

অমৃল্য সন্দিক্ষণভাবে বলিল, 'ঘটনা না হয় ঘটেছিল, কিন্তু পাহাড়ের মাঝে বলতে লজ্জা কিসের ?'

বরদা বলিল, 'লজ্জা নেই। যে গল্প তোমাদের শোনাতে যাচ্ছি তার পাঠগাউচি সবাই জীবিত, তাই একটু চাকাচুকি দিয়ে বলতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন উৎকৃষ্ট ব্যাপার ঘটে যায়—যা হোক, গল্পটা বলি শোন।'

হিল টেশনে যারা বাস করেন তাদের চাগচলন একটু বিলিতি দেখা হয়ে পড়ে। পুরুষেরা সচরাচর কোট-প্যান্ট পরেন। মেয়েরা অবশ্য শাড়ি ছাড়েননি, কিন্তু হাবভাব ঠিক দিশী বলা চলে না। টেবিলে বসে স্ত্রী-পুরুষের এক সঙ্গে খাওয়া, ডিনারের পর দু'এক পেগ হইকি বা পোর্ট—এসব সামাজিক ব্যবহারের অন্ত হয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না—শীতের রাজ্যে শীতের নিয়ম মেনে চলাই ভাল।

শ্যালকের চিঠি পেয়ে আমি তো গিয়ে পৌছলুম। দু'চার দিন থাকতে না থাকতেই গায়ে বেশ গন্তি লাগল। আমার শ্যালকটি দারুণ মাংসাণী, বাড়িতে রোজ মুর্গি মাটিনের শাঙ্ক চলেছে। তার ওপর পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো। ঘন্টায় ছিদ্রে পায়। জায়গাটা সত্যই চমৎকার; যেমন জল-হাওয়া, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য।

কয়েকটি নতুন বন্ধু জুটে গেল। এখানে দশ-বারো ঘর বাঙালী আছেন, সকলেই ভাবি মিস্টিক, নতুন লোক পেলে খুব খুশি হন। একটি ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম প্রমথ রায়। বয়স পঁচিশ হারিশ, যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি নরম স্বভাব। ভাল সরকারী ঢাকারি করে; মনটা অতি আধুনিক হলেও উঁচু নয়। প্রায় রোজই বিকেলবেলা টেনিস খেলে ফেরবার পথে আমাদের বাসায় দু' মারত। ছোকরা অবিবাহিত; একলা থাকে। তাই আমাদের সঙ্গে খানিক গল্পজব করে দু' এক পেয়ালা চা কিংবা ককটেল সেবন করে সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরত।

একদিন কথায় আমার শ্যালক প্রেতযোনির কথা তুললেন; বললেন, 'ওহে প্রমথ, তোমরা তো ভূতপ্রেত কিছুই মানো না। আমাদের বরদা একজন পাকা ভূতজ্ঞনী ব্যক্তি। ভূতের প্রমাণ যদি চাও, ওর কাছে পাবে।'

প্রমথ হেসে উঠল; বলল, 'আপনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হয়ে এইসব বিশ্বাস করেন ?'

কথাটা সে হালকাভাবে বললেও গায়ে লাগল, বললুম, 'শিক্ষিত লোকেরা এমন অনেক জিনিস বিশ্বাস করেন যা বিশ্বাস করতে অশিক্ষিত লোক লজ্জা পাবে।'

'যথা ?'

'যথা—ফ্রেডিয়ান সাইকো আনালিসিস কিংবা প্যাব্লভের বিহেভিয়া—

বিজ্ঞাম।'

প্রমথ হাসতে লাগল। সে বুঝিমান হেলে তাই ঝেড়ে তর্ক করল না। ভূতের কথা ওইখানেই চাঁপা পড়ল।

আমার পাহাড়ে আসার পর দু'হংস কেটে গেল। দিবি আরামে আছি; ওজন বেড়ে যাচ্ছে। মনে চিন্তা নেই, গায়ে ঘাম নেই, বিছানায় ছারপোকা নেই; খাওয়া ঘুমোনো আর ঘুরে বেড়ানো এই তিন কাজে দিবারাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যায় বুনতে পারি না। জীবনে এরকম সুসময় কুচিৎ এসে পড়ে; কিন্তু বেশি দিন থাকে না।

প্রমথ একদিন আমাদের চায়ের নিম্নলিখিত করল। আমি আর শ্যালক যথাসময়ে তার বাসায় উপস্থিত হলুম। আর কেউ নিম্নলিখিত হয়নি জানতুম; কিন্তু গিয়ে দেখি একটি তরঙ্গী রয়েছেন। একে আগে কখনো দেখিনি। সুন্দরী তরঙ্গী দীর্ঘাসী, মুখে একটু বিষাদের ছায়া। সাজসজ্জার প্রসাধনে বর্ণবাঞ্ছলা নেই, কিন্তু যত্ন আছে। চেহারা দেখে ব্যাস কুড়ি একক মনে হয়, হয়তো দু'এক বছর বেশি হতে পারে।

শ্যালক খুব আগ্রহের সঙ্গে তাকে সন্ধান করলেন, 'এই যে, মিসেস দাস, কি সৌভাগ্য! আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, উনি ধরে নিয়ে এলেন।'

প্রমথ তখন মহিলাটির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। ইশারায় বুঝলুম, মিসেস দাস বিধবা। শহর থেকে মাইল তিনিক দূরে 'হর-জটা' নামে একটি উচ্চ গিরিশিখর আছে; খুব ছোট জায়গা, মাত্র দশ-বারোটি বাংলো আছে। সেইখানে মিসেস দাস থাকেন। হর-জটা থেকে শহরের পথ সুগম নয়, মাঝে একটা উপত্যকা পড়ে; তাই সেখানে যারা থাকেন তারা মাঝে মাঝে শহরে এসে আবশ্যিক মত কেনাকাটা করে নিয়ে যান।

চা-কেক সহযোগে গল্প চলতে লাগল। লক্ষ্য করলুম মিসেস দাস একদিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা অনাদিকে তেমনি শান্ত আর সংযত। তার সুন্দর চেহারার একটা প্রবল আকর্মণ আছে, অথচ তার সঙ্গে খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা করাও চলে না। তিনি অত্যন্ত সহজভাবে সকলের সঙ্গে হাসিষ্টাটায় যোগ দিতে পারেন, কিন্তু তার সঙ্গে প্রগল্ভতা করবার সাহস কারুর নেই। তার সুকুমারত্বই যেন বর্ম।

প্রমথকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলুম। এতদিন বুবাতে পারিনি যে, তার জীবনে প্রেমঘটিত কোন জটিলতা আছে; এখন দেখলুম বেচারা একেবারে হাবড়ুবু থাচ্ছে। কম্পাসের কাঁটা অন্য সময়ে ঠিক থাকে; কিন্তু চুবকের কাছে এলে একেবারে অধীর অসংবৃত হয়ে পড়ে; প্রমথের অবস্থাও সেই রকম। তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে দিছে যে, ওই মেয়েটিকে সে ভালবাসে; সোক-লজ্জার খাতিরেও মনের অবস্থা লুকোবার ক্ষমতা তার নেই।

অথচ মিসেস দাস বিধবা, হোন প্রগতিশীলা আধুনিকা—তবু হিন্দু বিধবা।

মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। পাহাড়ের হিমেল হাওয়ায় এই যে বিচি

রোমাস অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, এর পরিণতি কোথায় ?

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মিসেস দাস উঠে পড়লেন, দিনের আলো থাকতে থাকতে তাকে হর-জটায় ফিরতে হবে। তিনি আমাদের তিনজনকে দৃশ্যে আমন্ত্রণে টেনে নিয়ে বললেন, 'একদিন হর-জটায় আসুন না। একটু নিখিলিণি এই যা, নইলে খুব সুন্দর জায়গা। এমন সূর্যোদয় পৃথিবীতে আর কোথাও দেখা যায় না। আসবেন।'

আমরা গলার মধ্যে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ করলুম। তিনি ঢলে গেলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ বসে আমরাও উঠলুম। অতিথি-সৎকারের যথোচিত চেষ্টা সহেও প্রমথ ক্রমাগত অন্যমনক হয়ে পড়ছে দেখে তাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না।

বাড়ি ফেরার পথে শ্যালককে জিজেস করলুম, 'কি হে, ব্যাপার কি ? তেতরে কিছু কথা আছে নাকি ?'

শ্যালক আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, 'তুমিও সংক্ষা করেছ দেখছি। আমি গুজর শুনেছিলুম, আজ চোখে দেখলুম। প্রমথ সাবিত্রীকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছে।'

'ওর নাম বুবি সাবিত্রী ? তা উনি কি বলেন ?'

'ঘৃতদূর শুনেছি, সাবিত্রীর মত নেই।'

'মত নেই কেন ? হিন্দু সংক্ষাৰ ? না অন্যকিছু ?'

'তা ভাই ঠিক বলতে পারি না। কতকটা সংক্ষাৰ হতে পারে, আবার কতকটা মৃত স্বামীৰ প্রতি ভালবাসাৰ হতে পারে।'

জিজেস করলুম, 'স্বামী কতদিন মারা গেছেন ?'

শ্যালক বলল, 'তা প্রায় বছর দুই হতে চলল। ভদ্রলোক রেলের বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন; হঠাৎ রেলে কাটা পড়লেন।'

'তোমার সঙে পরিচয় ছিল ?'

'সামান্য। খুব রাশভারী জবরদস্ত লোক, বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর হয়েছিল। মাত্র বছর থানেক সাবিত্রীকে বিয়ে করেছিলেন।'

'মিসেস দাস হর-জটায় থাকেন কেন ?'

'বাড়িটা দাসের ছিল, সাবিত্রী উত্তোলিকার সূত্রে পেঁচেছে। তাছাড়া দাস 'অন্ডিউট' মারা গিয়েছিলেন তাই রেলওয়ে থেকে তার বিধবা একটা মাসহারা পায়। তাইতেই চলে।'

'সাবিত্রী কেমন মেয়ে তোমার মনে হয় ?'

'খুব ভাল ; অমন মেয়ে দেখা যায় না। এই বয়সে একলা থাকে, কিন্তু কেউ কথনো ওর নামে একটা কথা বলতে পারেন।'

'বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি ?'

'এরকম কেবল হওয়াই ভাল। সারা জীবন অতীতের পালে চেয়ে কাটিয়ে

দেখার কোন মানে হয় না। ছেলেপুলে থাকলেও বা কথা ছিল, কিন্তু সাবিত্রী বোধ হয় নিয়ে করবে না।'

এই ঘটনার পর আরও দিন দশেক কেটে গেল। প্রমথ আর আসেনি। আমরা তার মনের কথা আঁচ করেছি বলেই বোধ হয় সে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছে।

আমারও স্বর্গ হতে বিদায় নেবার সময় হল। আমি পাততাড়ি গুটোছি এমন সময় একদিন প্রমথ এল। একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। দু'চার কথার পর বলল, 'মিসেস দাস চিঠি লিখে আমাদের তিনজনকে হর-জটায় বেমস্তু করেছেন, সূর্যোদয় দেখবার জন্য। যাবেন ?'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। কিন্তু শ্যালক আপত্তি তুললেন, 'সূর্যোদয় দেখতে হলে তার আগের রাত্রে নিয়ে হর-জটায় থাকতে হয়, কিংবা রাত্রি দুটোর সময় এখান থেকে বেরুতে হয়। সে কি সুবিধে হবে ?'

প্রমথ পকেট থেকে চিঠি বার করে বলল, 'তার চিঠি পড়ে দেখুন, অসুবিধে বোধ হয় হবে না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

গ্রীতি নমকারাত্মে নিবেদন, প্রমথবাবু, দেখছি আমার সেদিনের নিম্নৰূপ আপনারা মুখের কথা মনে করেছেন। আমি কিন্তু সত্যিই আপনাদের তিনজনকে নিম্নৰূপ করেছিলুম। আসুন না। রাত্রে আমার বাড়িতে থেকে সকালে সূর্যোদয় দেখবেন। কষ্ট হবে না ; আমার বাড়িতে তিনজন অতিথিকে স্থান দেবার মত জায়গা আছে।

কবে আসবেন জানাবেন। কিংবা না জানিয়ে যদি এসে উপস্থিত হন তাহলেও খুশি হব। আশা করি ভাল আছেন।

নিবেদিকা—সাবিত্রী দাস

এর পর আর শ্যালকের আপত্তি রইল না। প্রমথ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আজ শনিবার আছে, চলুন না আজই যাওয়া যাক। পাঁচটাৱ সময় বেরুলে সঙ্গেৱ আগেই পৌছুনো যাবে।'

তাই ঠিক করে বেড়িয়ে পড়া গেল।

হর-জটা শিখরাটি উপতাকা থেকে দেখা যায়, সত্যি হর-জটা নাম সার্থক। যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের জটা পাকিয়ে পোরে উঠেছে ; তার খাজে খাজে সাদা বাংলোগুলি ধূতুরা ফুলের মত ফুটে আছে। অপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু সেখানে পৌছুনো রাস্তাটি অপূর্ব নয় ; তিন মাইল পথ হাঁটতে পাকা আড়াই ঘণ্টা সাগল।

আমরা যখন মিসেস দাসের বাংলোৱ সামনে গিয়ে হাজিৱ হলুম তখন দিনেৱ আলো খুলিয়ে এসেছে ; তবু হর-জটাৱ কুটিল কুওলীতে সুর্যাস্তেৱ আবীৱ লেগে আছে। মিসেস দাস বাড়িৱ সামনেৱ বারান্দায় ইঞ্জিয়েরে বসে ছিলেন, উঁফুল কলকাকলি দিয়ে আমাদেৱ অভ্যন্তৰ কৱলেন। আমাদেৱ দেখে তার এই অকৃতিম

আনন্দ বড় ভাল লাগল।

শোনা যায়, আসন্ন দুর্ঘটনা সামলে কাগো ছায়া ফেলে তার আগমনিক জানিয়ে দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, সেদিন দুর্ঘটনার বিনোদন পূর্বাভাস পাইনি। সেই পার্বত্য সম্মান গৈরিক আলো—মনে হয়েছিল, এ আলো নয়, অপরূপ এক দৈবী প্রসন্নতা। তার আড়ালে যে লেশমাত্র অন্ত লুকিয়ে থাকতে পারে তা কহনা করাও যায় না। আমার বেথ হয় প্রমথও কিন্তু আভাস পাইনি।

মিসেস দাস আমাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। গরম জলে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রাইং রুমে এসে দেখি চা তৈরি। বাড়িতে পুরুষ চাকর নেই; দু'টি পাহাড়ী মেয়েমানুষ কাজকর্ম রাখাবালা করে এবং রাতে থাকে।

হর-জটায় এখনো বিদ্যুৎবাতি এসে পৌছয়নি। কেরোসিন ল্যাঙ্গের মোলায়েম আলোয় চা খেতে বসলুম। মিসেস দাস চাকরানিদের সাহায্যে আমাদের পরিচর্যা করতে লাগলেন।

ড্রাইং রুমের দেয়ালে একটা এন্লার্জ করা ফটোগ্রাফ টাষানো ছিল। দূর থেকে ভাল করে দেখতে পাইলুম না; চা খাওয়া শেষ হলে তার কাছে গিয়ে দাঢ়ালুম। ইনিই অকাল-মৃত মিস্টার দাস সন্দেহ নেই। ভাল করে দেখলুম। চেহারা সুন্দর বলা চলে না, কিন্তু একটা দৃঢ়তা আছে; চওড়া চিবুকের মাঝাখানে খাঁজ, চোখের দৃষ্টি একটু কড়া। ফটো তোলবার সময় ঠিন্টের কোণে যে হাসি আমার নিয়ম আছে সেটি অবশ্য রয়েছে, কিন্তু হাসি দিয়ে চরিত্রের দৃঢ় বলিষ্ঠতা ঢাকা পড়েনি।

মনে মনে এই মুখখালির সঙ্গে প্রমথের নরম মিষ্টি মুখের তুলনা করছি এমন সময় পাশে মনুকপ্তের আওয়াজ হল, ‘আমার স্বামী।’

দেখলুম মিসেস দাস আমার পাশে এসে দাঢ়িয়েছেন। তারপর প্রমথও এসে দাঢ়াল। মিসেস দাস কিছুক্ষণ ফটোর দিকে তাকিয়ে থেকে চকিতে প্রমথের পানে চাইলেন। তার মুখখালি শাস্তি, মুখ দেখে মনের কথা ধরা যায় না; তবু সন্দেহ হল তিনিও আমারই মত ফটোর সঙ্গে প্রমথের মুখ তুলনা করলেন।

আমরা আবার ফিরে এসে বসলুম।

মেয়েমানুষের মন বোৰা সহজ নয়; বিশেষত মিসেস দাসের মত মেয়ের মন। কবি বলেছেন, রমণীর মন সহজ বর্ধের স্থা সাধনার ধন। আমি ভাবতে লাগলাম, ইনি প্রমথকে বিয়ে করতে অসীকার করছেন একথা নিষ্ঠয় সত্তি, কিন্তু প্রমথ সংগে তাঁর মনে কি কোন দুর্বলতা লেই? এই যে আজ তিনি আমার মতন একজন অপরিচিত লোককে নিয়ন্ত্রণ করে এনেছেন এটা কি তখনই লোকিক সহনযোগী? না এর অন্তরালে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে কাছে পাবার অভিপ্রায় লুকিয়ে ছিল?

প্রমথের অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্পত্তিযোজন। সেদিন যেমন দেখেছিলুম আজও ঠিক তাই। চুম্বকাবিট কল্পাসের কাটা, অন্য কোন দিকেই তার লক্ষ্য নেই।

ক্রমে রাত্রি হল। উত্তর দিক থেকে একটা খুব ঠাণ্ডা হ্যাওয়া উঠে মাথার উপর দিয়ে সাই সাই শব্দে বইতে লাগল।

রান্নাবালা হতে স্বত্ত্বাতই একটু দেরি হল। আমরা রাত্রির খাওয়া শেষ করে যখন উঠলুম তখন প্রায় এগারোটা বাজে। মিসেস দাস বললেন, ‘আপনারা শয়ে পড়ুন গিয়ে। সকাল সাড়ে তিনটোর আগে কিন্তু উঠতে হবে, নইলে সুর্যোদয়ের সব সৌন্দর্য দেখতে পাবেন না।’

ভাবনা হল, এখন শুতে গেলে সাড়ে তিনটোর সময় সুম ভাঙবে কি? যদি না ভাঙে আজকের অভিযানটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। জিজেস করলুম, ‘অ্যালার্ম সঁড়ি আছে কি?’

মিসেস দাস বললেন, ‘না। কিন্তু সেজন্য ভাববেন না; আমি ঠিক সময়ে আপনাদের তুলে দেব।’

শ্যালক বললেন, ‘কিন্তু আপনার সুম যে ভাঙবে তার ঠিক কি?’

মিসেস দাস একটু হেসে বললেন, ‘আমি ঘুমোব না, এই ক'ষটা বই পড়ে কাটিয়ে দেব। আমার অভ্যেস আছে।’

অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। আমরা ঘুমোব আর ভদ্রমহিলা সারাবাত জেগে থাকবেন!

হঠাৎ প্রমথ তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘তাহলে আমিও জেগে থাকি।’ আমাদের দিকে চেয়ে বলল, ‘আপনারা শয়ে পড়ুন।’

আমার মন কিন্তু এ প্রত্যাবে সায় দিল না। আমরা দুজন বয়ক ব্যক্তি ঘুমোব, আর এই দুটি মুবক-ব্যুবতী সারাবাতি একত্র থাকবে—

শ্যালক সমস্যা ভঙ্গন করে দিয়ে বললেন, ‘তবে আমরা সকলেই জেগে থাকি না কেন? আমার আবার নতুন জায়গায় সহজে ঘুম আসে না; এমনিতেই হয়তো চোখ চেয়ে রাত কেটে যাবে।’

আমি বললাম, ‘আমারও ঠিক তাই।’

মিসেস দাস আপত্তি করলেন, কিন্তু আমরা শুনলুম না। ড্রাইং রুমে বেশ জুঁ করে বসা গেল। চোর ঘন্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে। শ্যালক প্রস্তাব করলেন, তাস খেলা যাক; কিন্তু বাড়িতে তাস ছিল না বলে তা আর হল না।

প্রথমে খুব উৎসাহের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে বিমিয়ে গল্প চলছে। মিসেস দাস একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে শুয়েছেন; শ্যালক সোফায় লাঙ্ঘা হয়ে সিগারেট টানছেন; আমিও একটা গদি মোড়া চেয়ারে গুচিসুটি হয়ে বেশ আরাম অনুভব করছি; কেবল প্রথম অস্ত্রভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটা ওটা নাড়ছে, আলোটা কখনো কমিরে দিচ্ছে কখনো বাড়িয়ে দিচ্ছে—

মিসেস দাসের শাস্তি চোখ তাকে অনুসরণ করছে।
বারোটা বাজল।

শ্যালক উঠে বসলেন; সিগারের দন্ত প্রান্তটুকু অ্যাশটুকের উপর রেখে

বললেন, 'আচ্ছা মিসেস দাস, আপনি এই বাড়িতে একলা থাকেন, আপনার ভাৰ কৰে না ?'

মিসেস দাস একটু ভুক্ত হুলে তাকালেন, 'ভয় ? কিসের ভয় ?'

বাড়ির মাথার ওপর ঠাণ্ডা বাতাসটা সাঁই সাঁই শব্দ কৰে চলেছে। আমি একটা হাই চাপা দিয়ে বললুম, 'মনে কৰুন ভৃত্যের ভয়।'

প্রমথ মিষ্টার দাসের ফটোগ্রাফের সামনে দাঁড়িয়ে বিবাগ-ভৱা ঢোখে তাৰ দিকে তাকিয়ে ছিল, আমাৰ কথা উনে চকিতে ফিরে চাইল ; তাৰপৰ আমাদেৱ মধ্যে এসে দাঢ়াল। বিন্দুপ কৰে বলল, 'ভৃত্যের ভয়। সে আবাৰ কি? ভৃত বলে কিছু আছে নাকি? বৰদাবাবুৰ যত কুসংস্কাৰ।'

মিসেস দাসকে জিজ্ঞেস কৰলুম, 'আপনারও কি তাই যত ?'

তিনি একটু চুপ কৰে থেকে বললেন, 'পৰজন্ম আমি বিশ্বাস কৰি। কিন্তু ভৃত—কি জানি—'

প্রমথ জোৱ গলায় বলে উঠল, 'ভৃত নেই। ভৃত শব্দেৱ যে অধিই ধৰ, ভৃত থাকতে পাৰে না। আছে শুধু বৰ্তমান আৰ ভবিষ্যৎ। এই কি যথোষ্ট নয়!'

তাৰ মুখেৰ পানে তাকালুম ; মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। প্রমথ গুৰুম হাতাবেৱ মানুষ, তাকে এত বিচলিত কৰলো দেখিনি। যেন সাবিত্ৰীকে একটা কথা বলবাৰ জন্ম তাৰ প্রাপে প্ৰবল আৰেগ উপস্থিত হয়েছে, অৰ্থাৎ আমাদেৱ সামনে বলতে পাৰছে না।

শ্যালক ও ব্যাপারটা বুৰোছিলেন ; তিনি বললেন, 'বৰ্তমান আৰ ভবিষ্যৎ যদি থাকে তবে ভৃতও থাকতে বাধ্য। আমাদেৱ সকলেৱই অতীত জীবন আছে—সেইটৈই ভৃত। তোমাৰও ভৃত আছে প্রমথ, তাকে এড়ানো সহজ নয়। তবে মৰা মানুষেৰ সঙ্গে আমাদেৱ তফাত এই যে, মৰা মানুষেৰ সবটাই ভৃত ; আমাদেৱ কিছুটা বৰ্তমান আৰ ভবিষ্যৎ আছে।'

শ্যালক যে ভৃত কথাটাৰ দু'ৰকম অৰ্থ নিয়ে লোকালুকি কৰছেন, প্রমথ তা বুৰাল না ; তাৰ তখন রোখ চেপে গেছে। সে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব হেয়ালি আমি বুঝি না। মৃত্যুৰ পৰ আস্থা যে বেঁচে থাকে তা প্ৰমাণ কৰতে পাৰেন ?'

শ্যালক হেসে বললেন, 'আমি কিছুই প্ৰমাণ কৰতে পাৰি না। প্ৰেত্যোনি সহজে বৰদা ধৰৰ বাখে, ওকে জিজ্ঞেস কৰি।'

আমি বললুম, 'দেখুন প্ৰমথবাৰ, যে লোক জেগে ঘুমোৱ তাকে জাগানো যায় না, আপনিও যদি বিশ্বাস কৰবেন না রলে বন্ধুপৰিৰুৰ হয়ে থাকেন তাহলে আপনাকে বিশ্বাস কৰালো কৰণৰ সাধা নয়! তবে এইটুকু বলতে পাৰি, অনেক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্ৰতিভাৰান লোক প্ৰেত্যোনিতে বিশ্বাস কৰেছেন। যথা—উইলিয়াম ক্রুকস, অলিভিয়া লজ, কোনন ভয়েল—'

প্রমথ মুখ শক্ত কৰে বলল, 'আমি বিশ্বাস কৰি না। যদি প্ৰমাণ কৰতে পাৰেন তো প্ৰমাণ কৰুন, নইলে কেবল কৃতকণ্ঠলি বিলাতী নাম আউড়ে আমাকে কন্তু

কৰতে পাৰবেন না।'

একটু বাগ হল। বললুম, 'বেশ। বিশ্বাস কৰা না-কৰা আপনার ইচ্ছে। কিন্তু যেটা কৰে দেখতে দোষ কি? মিসেস দাস, আসুন, প্ৰ্যাক্ষেট কৰা যাক।'

তিনি একটু শক্তি হয়ে বললেন, 'প্ৰ্যাক্ষেট। ভৃত নামাবেন ?'

বললুম, 'প্ৰমথবাৰ অবিশ্বাস ভাঙবাৰ আৱ তো কোন উপায় দেখি না। তবে আপনার যদি ভয় কৰে তাহলে কাজ নেই।'

তিনি বললেন, 'না, ভয় কৰবে না।' চকিতে একবাৰ প্ৰমথৰ দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো, কৰুন না। আৱ কিন্তু না হোক সময় তো কাটবে। কি চাই বলুন।'

বললুম, 'বেশি কিছু নয়, শুধু একটা তেপায়া টেবিল হলোই চলবে।'

ছোট একটা তেপায়া টেবিল ঘৰেই ছিল। আমি তখন দু'চাৰ কথায় প্ৰ্যাক্ষেটেৰ প্ৰক্ৰিয়া বুঝিয়ে দিলুম। তাৰপৰ আলোটা কমিয়ে দিয়ে চাৰজনে টেবিল ঘিৰে বসা গেল।

শ্যালক প্ৰশ্ন কৰলেন, 'কাকে ভাকা হবে ?'

আমি বললুম, 'যাকে ইচ্ছা ভাকা যেতে পাৰে। তবে এমন লোক হওয়া চাই যাকে আমাৰা সবাই চিনি। অন্তত যাৱ চেহাৰা আমাদেৱ সকলেৱ জনা আছে।'

আমাৰা যেখানে বসেছিলুম তাৰ অল্প দূৰেই মিষ্টার দাসেৱ ছবি দেয়ালে টাঙ্গান ছিল। প্ৰমথ বসেছিল ছবিৰ দিকে পিঠ কৰে, আৱ মিসেস দাস ছিলেন তাৰ সন্মুখে। মিসেস দাস ছবিৰ পানে চোখ তুললেন ; সঙ্গে সঙ্গে আমাদেৱ চোখও সেই দিকে ফিরল। আৱ আলোতে ছবিটা সমস্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল মুখখানা শ্পষ্ট হয়ে আছে।

মিসেস দাস ছবি থেকে চোখ নামিয়ে আমাৰ পানে চাইলেন। তাঁৰ চোখেৰ প্ৰশ্ন বুৰে আমি বললুম, 'হ্যা, ওকেই ভাকা যাক। আমি যদিও ওকে দেখিনি তবু ছবিতেই কাজ চলবে। সকলে চোখ বুজে মনে ঘনে ওঁৰ কথা ভাৰুন।'

আভুলে আঞ্চলে ঠেকিয়ে টেবিলেৰ ওপৰ হাত রাখা হল। তাৰপৰ আমাৰা চোখ বুজে মিষ্টার দাসেৱ ধান শুল্ক কৰে দিলুম।

প্ৰ্যাক্ষেটেৰ টেবিলে যখন প্ৰেত্যোনিৰ আবিৰ্ভাৱ হয় তখন টেবিলটা নড়তে থাকে ; মনে হয় টেবিলটাৰ মৰা কাঠে প্ৰাণ সঁঘাৱ হয়েছে, তাৰ ভেতৰ দিয়ে একটা স্পন্দন বইতে থাকে। আমাৰা প্ৰায় দশ মিনিট বসে রইলুম, কিন্তু টেবিল নড়ল না, তাৰ মধ্যে জীবন সঁঘাৱ হল না। তখন চোখ খুলে আৱ সকলেৱ পানে তাকালুম।

প্ৰমথকে দেখোই বুৰালুম প্ৰেতেৰ আবিৰ্ভাৱ হয়েছে, টেবিলেৰ ওপৰ নৰা, মানুষেৰ ওপৰ। এমন মাৰে মাৰে হয়, তাৰ মুখটা বুকেৰ ওপৰ কুলে পড়েছে, ঠোট দুটো নড়েছে ; মুখেৰ চেহাৰা কেমন যেন বদলে গেছে।

প্ৰেতেৰ উদ্দেশে প্ৰশ্ন কৰলুম, 'কেউ এসেছেন কি ?'

প্রমথ আন্তে আন্তে মুখ তুলল ; তারপর টকটকে রাঙা চোখ খুলে মিসেস দাসের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে রইল।

আমি হাত বাড়িয়ে আলোটা উজ্জ্বল করে দিলুম। এতক্ষণে প্রমথের মুখ ভাল করে দেখা গেল। তার মুখ দেখে আমি তার পেয়ে গেলুম। কঠিন হিংস্র মুখ—তুর চোখ দুটো জুলজুল করছে। চোখের দৃষ্টি প্রমথের দৃষ্টি নয়, যেন তার চোখের ভিতর দিয়ে অন্য একজন উকি মারছে।

মিসেস দাস সশ্রাহিতের মত তার পানে চেয়ে ছিলেন। হঠাতে প্রমথ উঠ কঠে বলে উঠল, 'সাবিত্রী!'

তার গলার আওয়াজ পর্যন্ত বদলে গেছে। মিসেস দাসের চোখ বিশ্ফারিত হতে লাগল; তাঁর ঠোঁট দুটি খুলে গেল। তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'অ্যা! তুমি, তুমি!' এই বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

তারপর যা কাও বাধল তা বর্ণনা করা যায় না। প্রমথ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; তার মুখ দিয়ে ফেলা বেরছে। আমি তাকে ধরতে গেলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি তাকে ধরে রাখি। তার গায়ে অসুবেগে শক্তি। আমাকে এক ঝটিকায় দূরে সরিয়ে দিয়ে সে সাবিত্রীর অজ্ঞান দেহটার ওপর বাঁপিয়ে পড়ল, তাকে দু-হাতে বাঁকানি দিতে দিতে গজরাতে লাগল, 'তুমি আবার বিয়ে করতে চাও ? দেব না—দেব না—তুমি আমার—'

ভেবে দ্যাখো, প্রমথের মুখ দিয়ে এই কথাগুলো বেরছে! কিন্তু আমাদের তখন ভাববার সময় নেই, আমি আর শ্যালক দুজনে মিলে টেনে প্রমথকে আলাদা করলুম। ইতিমধ্যে পাহাড়ী চাকরানি দুটো চেচমেচি ওনে এসে পড়েছিল; তারা সাবিত্রীকে তুলে নিয়ে কৌচের ওপর ওইয়ে দিল। আমরা প্রমথকে টেনে নিয়ে চললুম স্নান ঘরের দিকে; সেখানে তাকে মেরোয় ফেলে মাথায় বালতি বালতি ঝল ঢালতে লাগলুম আর চিৎকার করে বলতে লাগলুম, 'আপনি চলে যান—চলে যান—'

'না, যাব না—সাবিত্রীকে বিয়ে করতে দেব না—' দাঁত ঘষে ঘষে প্রমথ বলতে লাগল। আমরা জল ঢালতে লাগলুম। ক্ষমে তার গলার আওয়াজ জড়িয়ে এল; হাত-গা ছোড়াও বন্ধ হল।

আধঘন্টা পরে দুজনে মিলে তাকে চ্যাংডোলা করে নিয়ে গিয়ে একটা বিছানায় ওইয়ে দিলুম। তখন তার গায়ে আর শক্তি নেই, তবু বিজবিজ করে বকছে, 'দেব না—দেব না—'

শ্যালককে তার কাছে বসিয়ে ড্রাইং রুমে গেলুম। দেখি মিসেস দাসের জ্বান হয়েছে। আমাকে দেখে তিনি ভয়াৰ্ত কঠে কেঁদে উঠলেন, 'এ কী হল, বৰদাবাৰু, এ কী হল ?'

মেঝেদের মনের অন্তর্ভুমি কথা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন তাদের শজ্জা আব ভয়ের অন্ত থাকে না, কান্ত তখন তাদের একমাত্র আবরণ। আমি মিসেস

দাসের পাশে বসে তাঁকে যথাসাধ্য ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম। তারপর জাকরানিদের বগলুম, 'এক পেয়ালা কড়া চা শিগগির তৈরি করে নিয়ে এস।'

সেদিন সূর্যোদয় দেখা মাথায় উঠল। দুই ঘরে দুটি ঝংগীর পরিচর্যা করতেই বেলা সাতটা বেজে গেল।

যা হোক, মিসেস দাস তো সামলে উঠলেন, কিন্তু প্রমথ সেই বিছানায় ওয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, কিছুতেই তার ঘুম ভাঙে না। জোর করেও ঘুম ভাঙ্গাতে সাহস হল না, আবার হয়তো বিদ্যুটে কাণ্ড আৰম্ভ করে দেবে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের আজ ফিরে যেতেই হবে, নইলে অনেক হাঙ্গামা।

বেলা একটা পর্যন্ত যখন প্রমথের ঘুম ভাঙল না, তখন আমরা উদ্ধিয় হয়ে উঠলুম। ভাগ্যজ্ঞমে একজন বৃক্ষ ভাঙ্গার হৱ-জটায় বাস করেন, তাঁকে ডাকা হল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, 'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে, বিশেষ কিছু নয়; কিন্তু আজ এর বিছানা থেকে ওঠা চলবে না।'

আমরা কাত্তির চক্কে মিসেস দাসের পানে চাইলুম। তিনি এতক্ষণে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছেন, বললেন, 'প্রমথবাবু আজ এখানেই থাকুন। আপনারা যদি নিতান্তই না থাকতে পারেন—'

শ্যালক অত্যন্ত অগ্রসূত হয়ে বললেন, 'দেখুন, যাওয়া খুবই দুর্কার, কিন্তু আমরা না থাকলে আপনারা যদি কোন লজ্জার কারণ হয়—'

মিসেস দাস বললেন, 'সেজনে ভাববেন না।'

বৃক্ষ ভাঙ্গার আমাদের কথা ওনছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'ভাবনার কি আছে; আমি তো কাছেই থাকি, আমি না হয় রাত্রে এসে সাবিত্রী মা'র বাড়িতে থাকব; দুরকার হলে আমার স্তৰী এসে থাকতে পারেন। আপনারা ফিরে যান।'

বৃক্ষ ভাঙ্গারটি মরমী লোক; অথবা প্রশ়া করেন না। আমরা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রমথ সম্মৌখে চিন্তার কারণ নেই; ঘুম ভাঙ্গলেই সে সহজ মানুষ হয়ে পড়বে।

বেরক্বার সময় মিসেস দাস আমাদের একটু আড়ালে বললেন, 'কাল রাত্রির ঘটনা নিয়ে কোন আলোচনা না হলেই ভাল হয়।'

আমরা আশ্বাস দিলুম, 'আপনি নিশ্চিত থাকুন।'

তারপর হৱ-জটা থেকে নেমে এলুম।

পরদিন সন্দের সময় ঘৰে পেলুম প্রমথ ফিরে এসেছে। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল না।

এদিকে আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে বেরক্বার হবে। ভাবলুম, যাই, আমিই প্রমথের সঙ্গে দেখা করে আসি। এইসব ব্যাপারের পর তার হয়তো আসতে সংকোচ হচ্ছে।

পরদিন সকালবেলা বেড়িয়ে ফেরার পথে তার বাসায় গেলুম। সদর দরজা বন্ধ। কড়া নাড়তেই প্রমথ এসে দের খুলে দাঁড়াল। তার চেহারায় কী একটা সুস্থ

পরিবর্তন হয়েছে। সে কটমট করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে ঝইল, তারপর দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলে।

প্রমথর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে এলুম। www.banglابookpdf.blogspot.com

এই পর্যন্ত বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে চাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাজের নেশার জন্যই হোক বা বরদার গন্ধ উনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃষ্ঠী পৃষ্ঠী করিল, ‘তোমার গন্ধ এইখানেই শেষ ? না আর কিছু আছে ?’

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, ‘আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য খবর দিয়েছেন ; সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিয়ে অসম্ভব। প্রমথ বেশকালে আমার সঙ্গে অমন ঝুঁচ ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগাগোড়াই ভুল।

‘শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অদ্ভুত। এই অস্ত সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে ; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিষ্টার দাসের মতন হয়ে দাঢ়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা বাঁজ দেখা দিয়েছে—’

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া বরদা বলিল, ‘এতক্ষণ আমি সরলভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিষ্টার দাসের প্রেতাত্মা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েছী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিদ্বাকে আবার বিয়ে করেছেন ? কিংবা—আর কি হতে পারে ?’

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, ‘যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আস্তাটার কী হল ? কোথায় গেল সে ?’

অকস্মাত আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিংকারখনি হইল। আমরা চমকিয়া উর্ধ্বে চাহিলাম ; দেখিলাম, বাদুরের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে— কালো ত্রিকোণ পাখ। মেলিয়া পাখিটা ত্রিমে দূরে চলিয়া গেল।

কণ্ঠক্রিত দেহে আমরা চাহিয়া রহিলাম।

কে তুমি ?

শ্বেলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম আগী কথনও দেখিনি। শহরেই জন্ম, শহরেই বড় হয়েছি। শহরেই কেটেছে এই পঁচিশটি বসন্ত।

আমার এক বকু জুটেছে চাকরি করতে গিয়ে। বকুর নাম সুজিত। বৌরভূমি জেলায় কোন একটি গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। হঠাৎ একদিন সুজিত আমাকে বললে, যাবি আমাদের বাড়ি ? গ্রাম কথনও দেখিসনি বলছিস, দেখে আসবি।

সামনে চারদিন ছুটি। বললাম, যাব।

সুজিতদের গ্রামে এসেছি। রেল-স্টেশন থেকে বহুদূরে—কতক গৱাচ গাড়িতে, কতক বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। দুই বকুতে বেড়াতে বেড়াতে তাই গেলাম। www.banglابookpdf.blogspot.com

গ্রামখানি চয়ৎকার। চেউ-খেলানো মাটি, চারিদিকে ধানের মাটি। দক্ষিণে একটি জঙ্গল। শাল তাল তমাল গাছের সারি। মনে হয় প্রতিটি গাছ যেন যত করে পোতা। একে এরা জঙ্গল কেল বলে বুঝতে পারি না। পরিষ্কার পরিষ্কার মাটির ওপর শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়ানিবিড় তপোবনের মত স্থিত শ্যামল জায়গাটি আমার এত ভাল লাগল যে সহজে সেখান থেকে আসতে মন চাইল না।

সুজিতের বাড়িখানা পুরোন। আগেকার দিনের তৈরি দোতলা বাড়ি—কিছ ভেঙেছে, কিছু বা মেরামত করা হয়েছে।

দোতলার একটি ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খুললে দেখা যায়— পাশেই একখানি মাটির বাড়ি। পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। লোকজন কেউ বাস করে না। উঠোনে একটি আমের গাছ। গাছে তখন অজস্র মুকুল ধরেছিল। আমের মুকুলের গাছে আমার ঘরখানা ফেন ভরে আছে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। সেদিন কার ডাকে যেন শুম ভেঙে গেল শুনছেন ? শুনছেন ?

তীলোকের কষ্টস্বর।

জানলার পথে তাকিয়ে দেখলাম, সেই পোড়ো বাড়িটার উঠোনে আম গাছটির তলায় তৰী এক তরুণী দাঁড়িয়ে। জোওঞ্জার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছিল মেঘেটির সর্বাঙ্গে। মেঘেটি সুন্দরী বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন ?

পরিবর্তন হয়েছে। সে কটমট করে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর দড়াম করে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলো।

প্রমথর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। তার পরদিনই পাহাড় থেকে নেমে গুম। www.banglabookpdf.blogspot.com

এই পর্যট বলিয়া বরদা থামিল। ইতিমধ্যে টাঁদ অনেকখানি উপরে উঠিয়াছে। ভাঙের নেশার জন্মাই হোক বা বরদার গঁফ উনিয়াই হোক, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা লাগিতেছে।

পৃষ্ঠা প্রশ্ন করিল, 'তোমার গঁফ এইখানেই শেষ? না আর কিছু আছে?'

বরদা একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'আর একটু আছে। মাসখানেক পরে শ্যালকের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি এক আশ্চর্য করে দিয়েছেন: সাবিত্রীর সঙ্গে প্রমথর সিভিল ম্যারেজ হয়ে গেছে। আমার ধারণা হয়েছিল, যে ব্যাপার ঘটেছে, তারপর তাদের বিবে অসম্ভব। প্রমথ যে শেষকালে আমার সঙ্গে অমন রুচি ব্যবহার করেছিল, সেটাও আমি তার ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া মনে করেছিলুম। কিন্তু দেখলুম, আমার হিসেব আগামোড়াই ভুল।

'শ্যালক আর একটি খবর দিয়েছেন, সেটি আরও অন্তর। এই অন্ত সময়ের মধ্যে প্রমথর চেহারা নাকি অনেকখানি বদলে গেছে; সকলেই বলছে, তার চেহারা ক্রমশ গতাসু মিষ্টার দাসের মতন হয়ে দাঢ়াচ্ছে। এমন কি তার চিবুকের মাঝখানে একটা খাজা দেখা দিয়েছে—'

সিগারেটে একটা লসা টান দিয়া বরদা বলিল, 'এতক্ষণ আমি সরলভাবে ঘটনাটি বলে গেছি, নিজের টীকা-টিপ্পনী কিছু দিইনি। এখন তোমরাই এর টীকা-টিপ্পনী কর—এটা কি, মিষ্টার দাসের প্রেতাঞ্চা কি প্রমথকে তার দেহ থেকে উৎখাত করে নিজে কায়েমী হয়ে বসেছেন এবং নিজের বিধ্বনিকে আবার বিয়ে করেছেন? কিংবা—আর কি হতে পারে?'

আমরা কেহই উত্তর দিলাম না। বরদা তখন কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'যদি তাই হয় তাহলে প্রমথর আঝাটার কী হল? কোথায় গেল সে?'

অকস্মাত আকাশে একটা দীর্ঘ আর্ত কর্কশ চিংকারিনি হইল। আমরা চমকিয়া উর্ধ্বে চাহিলাম; দেখিলাম, বাদুরের মতো একটা পাখি চাঁদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে—কালো ত্রিকোণ পাখি মেলিয়া পাখিটা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল।

কন্টকিত দেহে আমরা চাহিয়া রইলাম।

কে তুমি?

শ্বেতজ্ঞানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম আমি কখনও দেখিনি। শহরেই জন্ম, শহরেই বড় হয়েছি। শহরেই কেটেছে এই পঁচিশটি বসন্ত।

আমার এক বন্ধু জুটেছে চাকরি করতে গিয়ে। বন্ধুর নাম সুজিত। বীরভূম জেলায় কোন একটি গ্রামে তার বাড়ি। বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। হঠাৎ একদিন সুজিত আমাকে বললে, যাবি আমাদের বাড়ি? গ্রাম কখনও দেখিসনি বলছিস, দেখে আসবি।

সামনে চারদিন ছুটি। বললাম, যাব।

সুজিতদের ঘামে এসেছি। রেল-স্টেশন থেকে বহুদূরে—কতক গরুর গাড়িতে, কতক বা পায়ে হেঁটে যেতে হয়। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে তাই গেলাম।

গ্রামখানি চয়ৎকার। চেউ-খেলালো মাটি, চারিদিকে ধানের মাঠ। দক্ষিণে একটি জঙ্গল। শাখা তাল তমাল গাছের সরি। মনে হয় প্রতিটি গাছ যেন বাত করে পৌতা। একে এরা জঙ্গল কেন বলে বুবাতে পারি না। পরিষ্কার পরিষ্কার মাটির ওপর শ্রেণীবদ্ধ গাছের ছায়ালিবিড় তপোবনের মত খিল্প শ্যামল জাহাগাটি আমার এক ভাল লাগল যে সহজে সেখান থেকে আসতে মন চাইল না।

সুজিতের বাড়িখানা পুরোন। আগেকার দিনের তৈরি দোতলা বাড়ি—কিছ ভেঙেছে, কিছু বা মেরামত করা হয়েছে।

- দোতলার একটি ঘরে আমার শোবার বাবস্থা করে দিয়েছে। দক্ষিণ দিকের জানলাটি খুললে দেখা যায়—পাশেই একখানি মাটির বাড়ি। পোড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। লোকজন কেউ বাস করে না। উঠোনে একটি আমের গাছ। গাছে তখন অজন্তু মুকুল ধরেছিল। আমের মুকুলের গাছে আমার ধরাখানা যেন তারে আছে।

রাত্রি তখন কত ঠিক মনে নেই। সেদিন কার ভাকে যেন যুম ভেঙে গেল শুনছেন? শুনছেন? www.banglabookpdf.blogspot.com

স্ত্রীলোকের কঠিনর।

জানলার পাথে তাকিয়ে দেখিলাম, সেই পোড়ো বাড়িটার উঠোনে আম গাছটির তলায় তরী এক তরুণী দাঢ়িয়ে। জ্যোৎস্নার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়েছিল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। মেয়েটি সুন্দরী বলেই মনে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি বলছেন?

মেয়েটি বললে, আমার মা কোথায় বলতে পারেন ?
বললাম, আমি নতুন এসেছি এ-গ্রামে। আমি কিছু জানি না।
আর কিছু বললে না মেয়েটি।

মনে হল যেন সে চলে গেল। আলোছায়া ঘেরা সেই গাছের তলায় তাকে
আর দেখাতে পেলাম না। কোন দিক দিয়ে কোথায় গেল বুঝতে পারলাম না।

ষটবাটা আমি ভুলতে পারছিলাম না। পরের দিন সকালে বললাম
সুজিতকে।

সুজিত বললে, ও জানলাটা আর খুলো না। বক করে দিয়ো।
কেন বল দেখি ? মেয়েটা কি—

সুজিত বললে না, না, সে-রকম কিছু নয়। কাজ কি ব্যাবা পরের মেয়ের
সঙ্গে... দুদিনের জন্যে এসেছিস—

বুরালাম। সেই ভাল।

সেদিন যাত্রে জানলাটা বক করেই আমি ওয়েছিলাম।

কিন্তু সেদিন আবার। আবার সেই কঠিন। আবার সেই ভাক ; শুনছেন ?
শুনছেন ?

জানলার কপাটটা ঠেলছে বলে মনে হল।

বাধা হয়ে জানলাটা খুলে ফেললাম।

কিন্তু এ-কী ? সেই সুন্দর মুখখানি জানলার শিকগুলোর ঠিক পেছনে।
মেয়েটি মনে হল যেন জানলার শিক থেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব ? জানলার পেছনে তো কিছুই নেই ! মেয়েটি
তাহলে দাঁড়িয়ে আছে কিসের উপর ?

এই কথা ভাবতেই টপ করে মাথাটা আমার ঘুরে গেল।

বললাম, আমি জানি না—কাল তো বলেছি আপনাকে।

আমার কপালে তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। আমি কাপছি ঠক্ঠক
করে। জানলাটা বকও করতে পারছি না, চিংকার করে ভাকতেও পারছি না
সুজিতকে।

আমার অবস্থা দেখেই বোধ হয় খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটি! সুন্দর
সাজান দাঁতের সারি। উজ্জ্বল দুটি টানা টানা চোখ।

মেয়েটি বললে, আমি তো কোন কথাই আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি! আমি
জানি আপনি নতুন এসেছেন। ক'দিন থাকবেন ?

খুব খানিকটা সাহস সংগ্রহ করে জানলাটা বক করার জন্যে হাত বাড়িয়ে
ছিলাম বোধহয়। কিন্তু জানলাটা বক করবার অবসর আমি পেলাম না। তার
আগেই মেয়েটি এসে দাঁড়াল একেবারে আমার সুমুখে—ঘরের ভিতর।

আবার তার সেই হাসি।

তারপর কি হয়েছে আমার আব কিছু মনে নেই।

জ্ঞান যখন ফিরে এল—দেখি, আমি শয়ে আছি সুজিতের ঘরে। সুজিতের
হোট বোন দাঁড়িয়ে আমার মাথায় হাওয়া করছে। মাথার চুলগুলো ভিজে। মাথায়
বোধকরি জল ঢালা হয়েছে।

সুজিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছিস যে ? কী হয়েছিল রে ?

সুজিত বললে, কিরকম ভীতু রে হুই। ও-রকম চেঁচিয়ে উঠেছিলি কেন ?
কেন তা আমি কেমন করে বলি! বললাম, তারপর ?

সুজিত বললে, তোর চিংকার শুনে ছুটে গেলাম। ভাগ্যিস দোরে খিল বক
করিসনি। নইলে কি যে হত কে জানে।

খুব হয়েছে আমার গ্রাম দেখা।

পরের দিনই বললাম, আমি কলকাতায় যাব।

সুজিতকেও আসতে হল আমার সঙ্গে।

আমে থাকতে সুজিত আমাকে কোন কথাই বলেনি। কোন রহস্যই ভাঙ্গেনি।

ট্রেনে আসতে আসতে সুজিত বললে, বেচারী সুবী! ওকে আমরা দেখেছি
সবাই। কিন্তু আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা গ্রহ্য করি নে।

মেয়েটা আসে। তার মার খবর জানতে চায়। বলে, তার মা কোথায় তোমরা
বল।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। খুলে বল সব কথা।

সুজিত বলল, তাহলে শোন!

সংসারে দুটি মাত্র মানুষ। মা আর মেয়ে।

মার বয়স হয়েছে। মেয়ের বয়স এই সবে আঠারো-উনিশ, কিন্তু দুজনেই
বিধবা।

ঝগড়া-ঝাটি তাদের চরিষ্ণ ঘণ্টা লেগেই থাকে। মেয়েটাই দিবারাত
খিটিমিটি করে ; মার সঙ্গে ঝগড়া করবার ছুতো খুজে বেড়ায়। আবার অবাক
কাও—খুব খানিকটা ঝগড়া করে নিজেই শেষে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে।

মা বলে, তুই একটা কিছু না করে আর ছাড়বিনে দেখছি! মাথার একপিঠ
চুল এলিয়ে এই ভর্তি দুপুরবেলা কাঁদতে বসলি যে ? আয়, চুলগুলো বেঁধে দিই।

এই বলে চুলগুলো বেঁধে দেবার জন্যেই মা হয়তো তার কাছে এগিয়ে যায়,
কিন্তু মেয়ে তখন রেগে একেবারে টং। চুলে হাত দিতে সে কিছুতেই দেবে না।
বলে, যাও, যাও, খুব হয়েছে। তোমাকে আ—

মার চোখ দুটি তখন জলে ভরে আসে।

আঁচলে চোখ মুছে বলে, থাক তবে, কাঁদ ওইখানে বসে! বলে ধীরে ধীরে সে
ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে এর বাড়ি খানিকক্ষণ বলে, ওর বাড়ি
খানিকক্ষণ বসে, কথা কইবার মত কাউকে যদি কাছে পায় তো বলে, ওই বয়েস
আব ওই রূপ নিয়ে বিধবা হল মা, মেয়েটার মুখের পানে আব তাকাতে

পারছিলে ।

প্রতিবেশিনী হয়তো আখ্যাস দেয় । বলে, তোর না মা, গা-সওয়া হয়ে থাবে ।

মা কিন্তু তার নিজের কথাই বলতে থাকে । বলে—আমার কি মনে হয় জানিস বাছা, মনে হয়—এই নিয়ে সুবী হয়তো দিবারাত্রি ভাবে । তোরে আর যখন কূল-কিনারা পায় না, তখন হয়তো ও অমনি করে হয় কাদতে বসে, নয়তো বাগড়া করবার জন্যে খুনসুড়ি করে বেড়ায় ।

প্রতিবেশিনী মেয়েটি এবার নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে কথাটা সমর্থন করে । সুবীর মা তার মুখের পানে তাকিয়ে বলে, বুঝতে সবই পারি বাছা, কিন্তু মা হয়ে আমি যে আর—

বলতে বলতে ঠোট দুটি তার ধরথর করে কাঁপতে থাকে, চোখ দিয়ে দরদগুর করে জল গড়িয়ে আসে ।

সে চোখের জল আর কিছুতেই থামতে চায় না । আঁচল দিয়ে মোছে আর তৎক্ষণাত্ম কানায়-কানায় ভরে ওঠে ।

মার সে কান্না বুঝি বিধাতারও সহ্য হল না । তাই সে কান্নার পালা হঠাৎ একদিন চুকে গেল । বিধাতা চুকিয়ে দিলেন, কি সুবী নিজেই চোকালে কে জানে!

সেদিন দুপুরে মা ও মেয়ে দুজনেই থেতে বসেছে । তাত চিরোতে গিয়ে কটাই করে সুবী তার দাঁতে একটা কাঁকর চিবিয়ে ফেললে । হাতের ধাসটা তৎক্ষণাত্ম সে থালার ওপর ছিটকে ফেলে দিয়ে বলে উঠল—না, আর পারি নে বাবা! কেন, চালগুলো বেছে নিতে পারোনি?

মা বললে, চাল আর কত বাছব বাছা! ভাতে কাঁকর পাথর দু-একটা অমনি থাকে । তাই বলে তোর মতন এমন বিটকেল কেউ করে না— থা ।

মেয়ে আর না খেয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইল দেখে মার মনে মনে সত্ত্বাই এবার একটুখানি বাগ হল । বললে, এমন তিবিকে মেজাজ তোর কেন হল সুবী? কই, আগে তো এমন ছিল না!

সুবীর মুখখানা ভায়ি হয়ে উঠল ।

তাই না দেখে মা আবার বললে, এতই যদি নবাবের মেয়ে হয়ে থাকিস তো চালগুলো কাল থেকে তুই নিজের হাতে বেছে দিস ।

তাই দেব । বলে থালাটাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সুবী উঠে দাঁড়াল ।

সর্বনাশ! বিধবা মেয়ে, একবারের বেশি থেতে নেই! মা চট করে বাঁ-হাত বাড়িয়ে আঁচলটা চেপে ধরে বলে উঠল, বোস, চারটি থেয়ে নে! কেউ দেখেনি, ভাতে দোষ নেই, নে বোস!

বাঁকুনি দিয়ে সুবী আঁচলটা ছাড়িয়ে নিলে । বললে, না, আর থাব না ।

সারাদিন থেতে যে আর পারি নে হতভাগী, উপোস দিয়ে মরবি?

মরণ হলে তো বাঁচি ! মরণ যে হয় না ছাই !

তাই মর তুই ! আমারও হাড়টা ভুঁড়ায় তাহলে ।

বিড়বিড় করে কি যেন বলতে বলতে সুবী আঁচাতে চলে গেল ।

মা-ই বা আর কেমন করে থায়! থালাটা সরিয়ে দিয়ে মা-ও উঠে দাঁড়াল ।

থিড়কির পুকুর থেকে হাত-মুখ ধূয়ে এসে সুবী দেখলে, এঁটো থালা তেমনি পড়ে আছে, আর ঘটির জলে উঠোনে হাত ধূয়ে মা তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে ।

মা তার সেদিন যেখানে সেখানে কেন্দে কেন্দে সারা হল । না মা, রইল ওই দস্তি মেরে আমার বাড়িতে, আমায় দেখছি অন্য কোন দেশে গিয়ে পালাতে হল ।

প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ বা সান্তুলা দেয়, আবার কেউ বা রলে, কি জানি মা, তোমাদের বাগড়ার কিছু বুঝি নে আমরা!

মায়ের চোখ দিয়ে জল আসে । বলে, বুঝতে কি ছাই আমিই পারি বাছা! ও যে কেন অমন করছে মা, তা কে জানে!

মা আবার সে-বাড়ি থেকে উঠে আর এক বাড়িতে গিয়ে বসে । সেখানেও সেই কান্না আর ওই এক কথা ।—আজ আর আমি বাড়ি চুকাই নে । দেখি ও আমায় বুঁজতে আসে কিনা!

এমনি করে এ-বাড়ি সে-বাড়ি করতে করতে সূর্য ডুবল । রোজ ঠিক এমনি সময় পুকুর থেকে এক-কলসী করে থাবার জল তাকে আনতে হয় । পাড়ার মেয়েরা সব কলসী কাঁখে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল, করালীর মা বললে, চল, না হস্ত আমার একটা কলসী নিয়েই চল আজকে ।

সুবীর মা বললে, না বাছা, থাক, আজ আর যাব না । মজাটা একবার বুরুক ।

মজা বোবাবার জন্যে সে রইল বটে, কিন্তু দেখতে দেখতে চারদিক আঁধার করে এল, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলল, তবু সুবী তাকে ডাকতে এল না ।

মার মন ঘর ছেড়ে এমন করে কতক্ষণই বা বাইরে থাকে । তুলসীতলায় এখনও হয়তো সঙ্গে পড়ল না—এতক্ষণ হয়তো সে তার নিজের লক্ষ্মণটি জ্বলে নিয়ে রামায়ণ পড়তে বসে গেছে—মা তার মরল না বাঁচল বয়ে গেছে তার দেখতে!

সরু একটা গলির অপর প্রান্তে একেবারে একটেরে তাদের সেই ছোট মাটির ঘরখানি—চারিদিকে মাটির থাটীর দিয়ে ঘেরা । সদর দরজা পেরিয়েই বাঁ-হাতে উঠোনের এক পাশে বছদিনের থাটীন একটা আমের গাছ—অজস্র ডালপালা বিঞ্চার করে জায়গাটাকে অঙ্ককার করে রেখেছে । তাহলেও ঘরে যদি আলো জলে তো বাইরে থেকেই টের পাওয়া যায় । কিন্তু আলো জ্বলা দূরে থাক, সুবীর মা সদর দরজা ঠেলে ঘরে চুকতে গিয়ে দেখে, দরজাটা ভেতর থেকে বক ।

হেকে বললে, সুবী দরজা খোল!—কাজ দ্যাখ দেবি মেয়ের! ঘরে চুকতে না দেবার মতলব!

ভেতর থেকে সুবী সাড়া আর কিছুতেই দেয় না, দরজাও খোলে না ।

কাছেই তারাপদদের বাড়ি । তারাপদ তখন সবেমাত্র গোয়ালে গাই-আ, প্রি. ভৌ. গ.-১২

গুরুত্বলিকে থেকে নিয়ে ঘরে এসে বসেছে, এমন সময় সুবীর মা এসে বললে, আয় তো বাবা, সুবীরকে একবার আচ্ছা করে ধরক দিবি! সদর দরজায় খিল দিয়ে বসে আছে, আমায় চুক্তে দেবে না।

তারাপদ হেসে বললে, বাগড়া হয়েছে বুঝি? বলেই লঞ্চনটি হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দরজায় বারকৃতক জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, খেল বলছি সুবী, নইলে কিছু বাকি রাখব না।

দরজা তবু খুলল না।

লঞ্চনটা হাত থেকে নামিয়ে তারাপদ বললে, তুমি দাঁড়াও মাসি, পাঁচিল টপকে দরজাটা খুলে দিই।

খাটো মাটির প্রাচীর। উঠতে বিশেষ বেগ পেতে হল না।

কিন্তু ঝুপ করে ওপাশে নেমেই সক্ষ্যার আবছা অঙ্ককারে কি যেন দেখে সে আমগাছের তলা থেকে সহসা বিকৃত কষ্টে চিন্কার করে উঠল, মাসি! মাসি!

বাইরে থেকে সুবীর মা বললে, কি বাবা?

কিন্তু জবাব দেবার অবসর তখন আর নেই। দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলেই তারাপদ কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি লঞ্চনটা তুলে নিয়ে সে আমগাছের তলায় গিয়ে দেখে—সর্বনাশ!

সুবীর মা তো অস্ফুট কষ্টে বিকট একটা চিন্কার করে সেখানেই আছাড় থেয়ে পড়ল—

আর স্তুতি নির্বাক তারাপদ কম্পিত হতে লঞ্চনের আলোটা তুলে ধরে দেখল—আমগাছের একটা ভালের গায়া মোটা একটা দড়ির ফাসে লটকে সুবী আভ্যন্তর্যামী করেছে! পায়ের নিচে দড়ির ভাঙা খাটিয়াটা ডেলটে পড়ে আছে। টকটকে ফরসা রঙ যেন দুধে আলতায় গোলা, পিঠের ওপর ঢেউ খেলানো কালো একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায় নেই। দাঁতের ফাঁকে খানিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বড়, গায়ের কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোজ্জে! হতভাগী মরবার আগে বাঁচবার জন্যে চেঁচা করেছিল কিনা তাই-বা কে জানে।

ব্যস! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা!

গ্রামদেশে আভ্যন্তর্যামী এমন কিছু নিত্যনেমিতিক ঘটনা নয়, দু'দশ বছর পরে কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাং যদি বা এক-আধটা এমন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটে যায় তো কিছু বলবার খাকে না।

এখন এ মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—এই হল গ্রামের লোকের ভাবনা। আঞ্চীয়-স্বজ্ঞন কেউ কোথাও তাদের আছে কিনা কে জানে। সুবীর মা তো সেই যে মাটিতে উপুড় হয়ে আছাড় থেয়ে পড়েছে, সেই থেকে আর ওঠেনি।

শিব মন্দিরের পাশে গ্রামের একটা গ্রান্তার ধারে সেই রাত্রেই মজলিস বসল। অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে এই ঠিক হল যে, কী জানি বাবা, আভ্যন্তর্যামী

মড়া শাশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসবার পর কেউ যদি পুলিশে ব্যবর দিয়ে দেয় যে সে আভ্যন্তর্যামী করেনি, কেউ তাকে মেরে ফেলে দিয়ে গাছে অমনি টাঙ্গিয়ে রেখেছিল—তখন... তার তেরে আগে থেকেই পুলিশে ব্যবর দেওয়া হোক।

গ্রাম থেকে তিন ক্রেশ দূরে থামা। কিন্তু সুবীর দুর্ভাগ্য, চৌকিদার ক্রেশে এসে ব্যবর দিলে—দারোগা সাহেব ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন, জমাদার সাহেব আসবেন কাল সকালে। বলেছেন, দাঁড়া আমি দেখাচ্ছি মজা, গলায় দড়ি দিয়ে মরা আমি বের করছি।

গ্রামের লোক তো ভয়ে অস্থির!

দুও ভট্চায় বললে, কেন, তখনই তো বলেছিলাম দাদা, পুলিশে ব্যবর দিয়ে কাজ নেই; দিই জ্বালিয়ে।

লোকনাথ দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠল। ব্যাটা বলে কি হো তারপর? তারপর তেলাটি কে সামলাতো?

দুও বললে, তেলা আবার কিসের?

হরিপদ তাকে বুবিয়ে দিলে যে, কেউ যদি বলত যে, না, ও গলায় দড়ি দিয়ে মরেনি, দুও ভট্চায়ের সঙ্গে দিলের বেলা বাগড়াবাটি না কি সব যেন হয়েছিল—

দুও ভট্চায় কালা মানুষ, কালে তাল কুনতে পায় না। এদের আগেকার মস্তবা সে কিছুই শোনেনি। হরিপদের মুখে তার নাম শনে সে চিন্কার করে লাফিয়ে উঠল, ব্যবরদার বলছি হরিপদ, মিছে কথা বলিস নে। আমার সঙ্গে বাগড়া-বাটি কিছু হয়নি।

সবাই তখন মুচকি মুচকি হাসছে।

হরিপদের সঙ্গে হাতাহাতি হবার যোগাড়। অনেক কষ্টে ভট্চায়কে থামান গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থামা থেকে জমাদার সাহেব এলেন না।

গ্রামে মানুষ মরছে, বাসি-মড়া তো হলই, তার ওপর আভ্যন্তর্যামী মড়া। ঠাকুর দেবতার শিলা-বিশ্বাসের নিত্য সেবা যাদের বাড়িতে আছে তারা তো ভেবেই অস্থির। বাড়ি থেকে মৃতদেহটাকে বের না করা পর্যন্ত ঠাকুর দেবতার পুজো হবে না এবং পুজো যাবা করবে, পুজো না হলে তাদের জলঘাসণ করার উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ি প্রত্যহ শালঘাস শিলার তোগ হয়। সকালে উঠেই ভিন্ন-গ্রামে সে একটা প্রায়শিক করাতে গিয়েছিল, প্রায় বারোটা সময় তেতেপুড়ে এসেই শনলে পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও উঠেনেই পড়ে আছে। মড়া দেখতে যাবা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি তাদের প্রত্যেককেই কেঁদে কেঁটে হাতে পায়ে ধরে মড়াটাকে একটুখানি বের করে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কঠরোধ হয়ে এসেছে। ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে শালঘাসের পুজোটা করে দিয়ে জুল থাবে। কিন্তু তাও যখন হল না, তখন সে

নিয়েই হনহন করে বেরিয়ে গেল।

আপাদমস্তক ঢাকা-দেওয়া সুবীর মৃতদেহ আগলে—দেখা গেল মা তার আমগাছের তলায় একাকিনী চূপ করে বসে আছে। চোখে জল নেই, মুখখালি শুকলো—কেন্দে কেন্দে সে যেন হয়রান হয়ে গেছে।

দরজার বাইরে থেকে লোকলাখ চেঁচিয়ে উঠল, বলি ও ঠাকুরণ, যেয়ে তো না হয় সাত কুল উজ্জ্বল করে দিয়ে মলো, তাই বলে কি ও হারামজাদীর সঙে সঙে আমাদেরও মরতে হবে নাকি? মড়া বের না করলে যে ঠাকুরের ভোগ হয় না।

মুখ তুলে একবার চাইতেই সুবীর মার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এল। কথা সে কিছুই বলতে পারলে না, গলা তখন তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

লোকলাখ ভাবলে—বাড়ি

করে মানুষ মরেছে, তার দরজন টাকা শুধ নিয়ে তিনি বাড়িতে পাঠাবেন, আর ‘সই টুকা খরচ হবে তার সন্তানের জন্মোৎসবে!— তা হোক, পুলিশে কাজ করে অভসব ভাবতে গেলে চলে না!

কিন্তু সাহেবের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, কিছু না নিয়েই তাঁকে ফিরতে হল। মৃতদেহ সংকার করবার হকুম দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

শীতকালের রাত। মৃতদেহ সংকারের পর স্নান করতে হবে। তার ওপরে রাজে আর বাড়ি ফিরতে নেই। শুশানেই রাত কাটাতে হয়। সুতরাং কেউ আর বাড়ি থেকে সহজে বেরোতে চায় না।

গামছা কাঁধে লোকলাখ এসে দাঢ়াল।

দুগু ভট্টাচার্য লাফিয়ে উঠল—ব্যস্ত, কাউকে চাইনে। একজন সঙ্গী পেলে আগি ধেতাটি পলিয় ফেলতে পারি!

খালিক পরে, তার দেখাদেখি জন দশ-বারো গ্রামের ছোকরা— প্রত্যেকেই হাতে একটা করে লণ্ঠন নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখে, পুকুরের পাড় থেকে খালিক দূরে একটা মাটের ওপর দুণ ভট্টাচ দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর তার পায়ের কাছে সুবীর মৃতদেহ অর্ধ-উলঙ্ঘন অবস্থায় পড়ে আছে।

ব্যাপার কি?

বাপস আসে। আবার পথে

কঠোর কষ্টে ভট্টাচকে খামান
হব এলেন না।

ওপর আজ্ঞাহতার মড়া।
বাড়িতে আছে তারা তো
করা পর্যন্ত ঠাকুর দেবতার
নে তাদের জলগ্রহণ করার

হয়। সকালে উঠেই ভিন্ন-
বারোটার সময় তেতেপুড়ে
ঠোনেই পড়ে আছে। মড়া
তাদের প্রত্যেককেই কেবে
নে দেবার জন্মে অনুরোধ
হচ্ছে। ভেবেছিল, বাড়ি গিয়ে
ও যখন হল না, তখন সে

আর অস্তিত নির্বাক তারাপদ কম্পিত হতে লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে
দেখল—আমগাছের একটা ভালের পায় মোটা একটা দড়ির ফাঁসে লটকে সুবী
আজ্ঞাহতা করেছে! পায়ের নিচে দড়ির ভাঙা খাটিয়াটা উলটে পড়ে আছে।
উকটকে ফুরমা রঙ মেন দুধে আলতায় গোলা, পিঠের ওপর চেউ খেলানো কালো
একপিঠ চুল, কিন্তু মুখের চেহারা দেখলে আর সে-সুবী বলে চেনবার উপায়
নেই। দাতের ফাঁকে খালিকটা জিভ বেরিয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বড়, গায়ের
কাপড়-চোপড় বেসামাল অবস্থায় মাটিতে লুটোছে। হতভাগী মরবার আগে
বাচবার জন্মে চেঁচা করেছিল কিনা তাই-বা কে জানে!

বাস! সমস্ত গ্রাম একেবারে ঠাণ্ডা!

গ্রামদেশে আজ্ঞাহতা এমন কিছু নিচানৈমিত্তিক ঘটনা নয়, দু'দশ বছর পরে
কদাচিৎ কোনও গ্রামে দৈবাং যদি বা এক-আধটা এমন আকর্ষিক দুর্ঘটনা ঘটে
যায় তো কিছু বলবার খাকে না।

এখন এ মৃতদেহ নিয়ে কি করা যায়—এই হল গ্রামের লোকের ভাসন।
আয়ীয়-সুজন কেউ কোথাও তাদের আছে কিনা কে জানে। সুবীর মা তো সেই
যে মাটিতে উপুড় হয়ে আছাড় থেয়ে পড়েছে, সেই থেকে আর ওঠেনি।

শির মন্দিরের পাশে গ্রামের একটা গান্ধার ধারে সেই ঝাঁকেই মজলিস বসল।
অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষে এই ঠিক হল যে, কী জানি বাবা, আজ্ঞাহতাৰ

কাউকে বা ভুব দিতে হয়, কেউ বা মাথায় জল ঢালে, আবার কাউকে বা
মাথায় একটুখানি গঙ্গাজল ছিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর কখনও সে সুবীর
হাড় দেখতে যাবে না।

গ্রামের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের মজলিসে এই নিয়ে কথা ওঠে। বলে,
সর্বনাশ হল দেখছি। এবার ঘরে ভূত নাচবে!

বিজ্ঞাপন প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ প্রক্ষেপ

বাগড়া-বাটি কিছু হয়নি।

সবাই তখন মুচকি মুচকি হাসছে।

হরিপুর সঙ্গে ইত্তাহাতি হবার মৌগাড়। অনে

গেল। কিন্তু পরদিন সকালেও থানা থেকে জয়দার সা

গ্রামে মানুষ মরছে, বাসি-মড়া তো হলই, তাৰ
ঠাকুৰ দেবতার শিলা-বিঘ্নের মিঠা সেৱা যাদের
ভেবেই অস্তিৰ। বাড়ি থেকে মৃতদেহটাকে বের না
পুঁজো হবে না এবং পুঁজো যাবা কৰবে, পুঁজো না হ
উপায় নেই।

লোকনাথের বাড়ি প্রতাহ শালগ্রাম শিলার তোগ
গ্রামে সে একটা প্রায়শিক করাতে গিয়েছিল, প্রায়
এসেই ওনলে পুলিশও আসেনি এবং মড়া তখনও উ
দেখতে যাবা গিয়েছিল, সকাল থেকে সুবীর মা নাকি
কেটে হাতে পায়ে ধরে মড়াটাকে একটুখানি বের ক
করেছিল, কিন্তু কেউ তা শোনেনি।

লোকনাথের তখন পিপাসায় কঠোরোধ হয়ে এসে
শালগ্রামের পুঁজোটা করে দিয়ে জল যাবে। কিন্তু তা

গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার ইচ্ছে সুবীর মাঝে ছিল না, তবু তাকে জোর করে সবাই মিলে বলে কয়ে গয়ায় পাঠিয়ে দিল। বেচারা একাকিনী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল গয়ায়। মেরের নামে দুর্নীম রটিবে তাই-বা সে সহ্য করবে কেমন করে। অথচ সে নিজে যদি তাকে একটিবার দেখতে পেত! মাঝের মন—যে মেয়ে রাগ করে চলে গেছে তাকেই সে একটিবার শুধু চোখে দেখতে চায়। শুশানের যে জায়গাটায় সুবীরকে পৌতা হয়েছিল, সুবীর মা সেইখানে বসে কাঁদতে লাগল। ভাবলে—না, সে গয়ায় যাবে না। ভূত হয়েও যদি মেয়েটা একবার দেখা দেয়। গয়ায় পিণ্ডি দিলে সে আশাও হয়তো আর থাকবে না! রাত্রিটা আজ সে এই শুশানেই কাটিয়ে দেবে। ভূত হয়েও যদি সে আসে তো একবার জিজ্ঞেস করবে, হতভাগী রাগ করে তুই কেম গেলি!

সারারাত সুবীর মা সেই অঙ্ককারে শুশানের মাঝে বসে রইল। এদিকে গ্রামের লোক জানে সে গয়ায় গেছে।

দিন দুই পরেই গ্রামের মধ্যে আবার এক হলসুল ব্যাপার!

থানা থেকে পুলিশ এসেছে। গ্রামের জনকতক ভাবিকী মাতৃকর লোককে তারা থানায় নিয়ে যাবে। কি জন্যে নিয়ে যাবে জিজ্ঞেস করলে বলে না। বলে শুধু সেখানে গিয়ে একটা বন্ধু সন্মান করতে হবে!

জুলাতন!

এই গ্রামের ওপরেই যত অভ্যাচার রে বাবা!

সোকনাথ বললে, সুবীর মা ফিরে আসুক, এলেই দেখবি সব হাঙ্গামা চলে যাবে। www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু গ্রামের লোক থানায় নিয়ে দেখে, কাটের একটা বারের মধ্যে সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা কি একটা জিনিস। ইসপেষ্টরবাবু বললেন, দেখুন দেখি চিনতে পারেন কিমা? বলে যেই ঢাকা খুলেছে, আর চক্র হ্রিৎ!

সবাই দেখলে রেলের লাইনে কাটা তাল-গোল-পাকানো একটা মৃতদেহ, মুখখানা কিন্তু তখনো পর্যন্ত দেখলে চেনা যায়—সুবীর মা ছাড়া আর কেউ নয়। মানুষ বাস করা দূরে থাক, সঙ্গের অঙ্ককারে ও পথ দিয়ে কেউ আর সহজে যেতে চায় না, যেতে হলে এখনও গা ছমছম করে। প্রথম বৎসর ঘরের চাল গেল উড়ে, দ্বিতীয় বৎসর কাঠামোটা ও গেল ভেড়ে—আজকাল খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু ওর চারপাই মাটির দেওয়াল। যে আমগাছে সুবী মরেছিল, গাছটা এখনও ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বছরের পর বছর ঠিক সময়ে তার শুকলো পাতা বারে, কচি পাতা গজায়, শুকুলের গকে চারদিক আয়োদিত হয়ে ওঠে, শেষে থলো থলো আম ধরে। কিন্তু গ্রামের মধ্যে এত যে ডানপিটে ছেলো—তা কেউ আর সাহস করে ও আমগাছটার তলা দিয়ে পেরোয় না—ও আমও কেউ থায় না—গাছের আম গাছেই পাকে।

আবার সময় হলে যাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যায়।

দিন দুপুরে ভূত

বুদ্ধিমত্তের বস্তু

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্রাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদুর পিঠে চড়চড় করে ফুটছে আলপিলের মতো। এই এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আত্মে আত্মে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্রামকে।

এমন সময় বাস্তা পার হয়ে ছোট একটি মেরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললো, ‘আপনি কি ডাক্তার?’

ভাবতেই পারিলি মেয়েটি আমাকে কিন্তু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গাহ্য করলাম না। কিন্তু পরমুভূতেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে আকিয়ে বললে, ‘দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?’

খুব অল্পক হলাম, একটু যেন শুশিশ—‘কী করে বুঝালে?’

ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখাব যান্ত। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?’

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললো যেন এটা মোটেও অন্তর্ভুক্ত কি অসাধারণ কিন্তু নয়। আমি তো কী বলবো তেবে পাইছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দাকুণ রোদুরে আবার হয়তো পনের মিনিটের ধারা।

মেয়েটি ভাঙ্গ-ভাঙ্গ গলায় ক্যাতরভাবে বললো, ‘চলুন না যাবেন?’

ও-সব কথায় কান না দিয়ে ট্রামে উঠে গড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হতো সম্ভেদ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলুম না, ট্রামটা মোড় দ্বুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটরঘটের করতে করতে বেরিয়ে গেলো।

‘যাবেন তো?’ www.banglabookpdf.blogspot.com

‘কোথায় তোমার বাড়ি?’

‘চেতলাবা—এই কাছেই।’

‘কী হয়েছে তোমার মা-র?’

‘কী হয়েছে, জানি না তো। বড়ো অসুখ।’

‘কিন্তু অসুখ?’

‘অনেকদিন। ভাঙ্গারবাবু আপনি যাবেন তো?’

মেয়েটির মান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হলো। ভাবলুম যাই না, দেখে আসি ব্যাপারটা।

বললুম, ‘চলো।’

‘ভাঙ্গারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না—’মেয়েটি আরো

কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলো।

‘আজ্জ আচ্ছ, সে জন্ম ভেবো না।’ আমি তাড়াতাড়ি বললুম। নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, আফ্টুয়া-বন্ধু মহলে ডাক-খোজ পড়ে মাঝে-মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশ টাকা যে-মাসে পাই, সে মাসেই খুব খুশি। এই তো এক বন্ধুর ছেলের নিরানকবই বুরি জুর হয়েছে, ট্রামের পরসা খরচ করে এসে তার প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে এতোক্ষণ আড়া মেরে বাড়ি ফিরলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলো।

হেঁটে রঙনা হলাম মেয়েটির সঙে কালিঘাট পুলের দিকে। জিঞ্জেস করলুম, তোমার মাকে আর কেন্দ্রে ডাঙ্কার দেখেননি ?

‘ডাঙ্কার ? না। বলেন, ডাঙ্কার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। টাকা পাবো কোথায়—’

‘তুমি কি আজ ডাঙ্কার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে ? আর কেউ নেই তোমার বাড়িতে ?’

‘নাঃ, কে আর পাববে !এক দাদা ছিলো আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলেই কাটা পড়লো ! সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যে কেন অসুখ করলো মা-র ? ডাঙ্কারবাবু, মা কদ্দিনে ভালো হবেন ?’

আমি ডাঙ্কারি ধরলে হেসে বললুম, ‘সে এখন কী করে বলি ?’

‘ডাঙ্কারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হয়ে আছেন—একবারও চোখ মেলে তাকান না। দেখুন, বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে এতোদূরে এসেছি, যদি কেন্দ্রে ডাঙ্কার খুঁজে পাই, যদি আমার ওপর কেন্দ্রে ডাঙ্কার দয়া করেন। এই তো সব ওযুধের দোকান, ভেতরে পাঁকুন-পরা ডাঙ্কার বসে—আমার তো সাহস হয় না ভেতরে চুকতে। রাস্তার এদিক ওদিক কেবলই ঘুরছি এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হলো আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে থাবেন আমাদের বাড়ি—কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি, ছি, এটা কী বললুম ! আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে থেতে আসবেন—ডাঙ্কারবাবু, আপনার দয়া আমি কেনেদিন ভুলবো না।

‘ডাঙ্কারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?’

‘কিন্তু না। চলো।’

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতেই মনে হতে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব-দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধূকতে ধূকতে মরছে না থেরে, তাদের সবার উপকার করতে গেলে নিজেরই—

পুল থেকে নেমে জিঞ্জেস করলুম, ‘আর কতোদূর ?’

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে মেয়েটি বললো, ‘এই তো—আর একটুখানি। আমার পরসা নেই, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি করে নিতুম। ওঃ, কতো কষ্ট হলো আপনার !’

‘বাঃ, এইটুকু হাঁটতে পারবো না !’

অনেক গলিয়ুজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি—সত্য বলতে জায়গাটা ঠিক কলকাতা নয়। একেবাবে পাড়াগাঁ, পুকুর, বনজঙ্গল, কিন্তু পাকা বাড়ি, কিন্তু বা খড়ের ঘর। একটা অতিজীব শ্যাওলা-ধরা খসে-গড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললো, ‘এই !’

ভিতরে চুকে দেখি, মেরোর উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাধ হয়ে শয়ে। চোখ তার আধো-বোজা, থানিক পর-পর নিষ্পাস পড়ছে জোরে জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলে, ‘মা, মা !’

কোনো জবাব এলো না।
‘মা মা, তোমার জন্মে ডাঙ্কার নিয়ে এসেছি, চেয়ে দেখো। মা, এই ডাঙ্কারবাবু তোমাকে ভালো করবেন !’

চোখ দুটো একবার পলকের জন্ম খুলেই আবার বুজে এলো। একখানা হাত বুঁধি একটু ওঠাবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটা আওয়াজ হয়তো বেঙ্গলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললো, ‘ডাঙ্কারবাবু, ভালো করে দেখুন, মাকে আজই ভালো করে দিন।’

কিন্তু কিন্তু দেখবার ছিলো না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা সব সময় একবার শেষ চেষ্টা করে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, ‘তুমি একটু বসো, আমি আসছি।

মেয়েটি বললো, ‘ডাঙ্কারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো ? আমার মা ভালো হবেন তো ?’

‘এস্ফুমি আসছি ওমুখ নিয়ে’ বলে আমি বেরিয়ে গেলুম।

ফেরার সময় রাস্তাটা বোধহয় কিন্তু গোলমাল হয়েছিলো। একটু ঘূরপথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদুরে ছোটাছুটি করে তখন আমি কানে পি-পি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাঙ্কারের নিজের বাস্ত্রের কথা ভাববার তখন সময় নয়। ভিতরে চুকতে ঠিক যেন পা সরছিলো না, কে জানে গিয়ে কী দেখবো। দরজাটা খোলা দেখে চুকলুম কিন্তু চুকেই স্তুপিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম ? না, এই তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, এই দুটো সুপরিগাছ। দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে, কিন্তু মেয়েটি কোথায় ? তার মৃদু মা-ই বা কোথায় গেলো ? ঘরের জিনিসপত্র কমই ছিলো, কিন্তু সে-কটা ও দেখছিই না।

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই মারা গেলো, আর ওর মাকে নিয়ে চলে গেলো কেওড়াতলাতে ? এতো অঞ্চল সময়ের মধ্যে কী করে তা হতে পারে ? ঘরে কিন্তু জিনিসপত্র ছিলো, একটা লাট্টন, দু-একটা থালা-বাটি, সেগুলো ?

আন্তে-আন্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ানুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল... মনের ভুল ? এই রোচুনে কি আমার মাথা খারাপ হয়ে গেলো ? এই তো আমি ঠিক দাঢ়িয়ে, আমার ইন্ডোকশন, সব ঠিক আছে। নাকি আমি পথ ভুল করে ভুল বাঢ়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি ?

ফ্যালক্যাল করে তাকিয়ে আছি, মাথার উপরে যে আগুন ঝরছে সে খোলাও নেই। চারিদিক ছবির মতো চৃপচাপ। হঠাৎ দেখি টাকপড়া একটি আধ-বয়সী লোক আমার পাশে এসে তখন দাঢ়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললো, ‘কী মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি ?’

—‘আপনার বাড়ি বুবি?’

লোকটা ঠোট উলটিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খাবে কে ? কোথাকার এক বিষবা পিসী, জন্মে দুবার চোখেও দেখিন মশাই—সংসারে কেউ কোনোখানে নেই—আইনের প্যাচে ঘুরতে-ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়লো আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন—এমন কপাল নিয়েও আসে গানুষ ! পিসে টেসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা যেলে কাটা পড়লো, পিসী তখন স্বগতে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হলো। একটা মেয়ে ছিলো—‘হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বললো, ‘ও-সব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।’

আমি কথা বলার জন্য হাঁ করলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোবার আগেই লোকটা বলে চললো, ‘ঠো একফোটা বাবো বছরের মেয়ে, তা মা-টা মেদিন অক্তা পেলো, পরের দিন ও দিনি কড়িকাঠ থেকে কুলে পড়লো ! একখানাই শাড়ি ছিলো পরনে সেটা দিয়ে কর্ম সারলো। কী ডেপো মেয়ে মশাই—থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিত্তম, বাড়িখানা ছিলো তিনপুরুষের, একরকম চলে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা মশাই, হ্যাঁ। ভূত না হাতি ! আপনি তো এভুকেটেজ লোক, আপনি বলুন, ও-সব কথায় কি কান দিতে আছে ! নিতে চান তো খুব সন্তান ছাড়তে পারি। সবসুন্দর পাঁচশো টাকা—আজ্ঞা হয়েদেরে চারশোই দেবেন, যান। জন্মের দরে পাছেন, জমিটুকু তো রইলো, আপনি ইচ্ছেমতো বাড়ি তৈরী করে নেবেন।

অতি শ্বীগুরে আমি জিগোস করলুম, ‘কদিনের কথা এটা ?’

‘কোনটা ? এই পিসীর—তা দু'বছর হবে। পিসীর জন্য কোনো ভাবনা ছিলো না মশাই, মেরেটার জন্য বাড়িটার এমন বদনাম হয়েছে যে পাঁচ টাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে টাঙ্গো তো শুধে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরোতেও পারিনে। আমি গবিব মানুষ, আমার শুপরে এ জুলুম কেন ? থাকি কাঁচড়াগড়ায়, রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে—আজ্ঞা, কী দেবেন আপনিই বলুন—বলুন না।’

মণ্টির মা নরেন্দ্র দেব

মণ্টির বয়স যখন সবে চার পাঁচ বছর সেই সময় মণ্টির মা মারা গেলেন। মাকে হারিয়ে মণ্টি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়ল। তাকে সবাই বোঝাতে লাগল যে, তার মা মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে—শীগগীরই ফিরে আসবে। মণ্টি কিন্তু কাতর কথাই শোনে না কেবলই মার জন্য কাদে ; কেবলই বলে, মার কাছে যাবো ; মা কোথা গেল ? আমার মাকে এনে দাও !

মণ্টির বাবা মণ্টিকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর কোনও কাজকর্ম নেই, কেবল ছেলেকে নিয়ে থাকতে হয়। রোজ বিকেলে তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হয়। কোনও দিন বায়োকোপ দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যান, কোনও দিন বা মিউজিয়াম দুরিয়ে নিয়ে আসেন। এমনি ক'রে দিনগুলো একে একে কাটতে লাগল বটে, কিন্তু রাত্রি আর কাটতে চায় না। www.banglabookpdf.blogspot.com

রাত্রে বাপের কোলের কাছটিতে ঘেসে ঘৰে বাপের গলা জাড়িয়ে ধরে মণ্টি যতক্ষণ না ঘুমোরে ততক্ষণ কেবলই তার মায়ের কথা কয়। হ্যাঁ বাবা, মা কবে মামা বাড়ি থেকে আসবে ? চললা বাবা, তুমি আমি দু'জনে মামার বাড়ীতে গিয়ে মাকে নিয়ে আসি। মার জন্যে যে আমার বড় মন কেমন ক'রছে ! এমনি ক'রে প্রতিদিন মণ্টি যখন তার মার কথা ভুলে তার বাবাকে ব্যতিবাঞ্ছ ক'রে তুলতো, মণ্টির মার জন্যে মণ্টির বাবারও প্রাণটা কেন্দে উঠতো। চুপি চুপি পাশ ফিরে কোচার কাপড়ে চোখের জল মুছে ফেলে মণ্টির বাবা বলতেন “তুমি এখন ঘুমোও, কাল তোমাতে আমাতে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে আসবো।”

এমনি ক'রে আর ক'দিন চলে ! মণ্টি ক্রমেই মার জন্যে হেদিয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু যেতে চায় না ; কোথাও যেতে চায় না, খেলাধুলো করাও ছেড়ে দিলে। দিনরাত মুখ শুকিয়ে বেড়ায়। আর তেমন ক'রে হাসে না, দিনদিন সে রোগা হ'য়ে যেতে লাগল।

মণ্টির অবস্থা দেখে তার বাবার বড় ভাবনা হ'লো— তাইতো ছেলেটার জন্যে কি করা যায়। শেষে তিনি একদিন চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিয়ে মণ্টির এক মাসীমাকে নিয়ে এলেন। মণ্টির মাসীমা এসে আদরযত্নে মণ্টিকে অনেকটা

ঠাঙ্গা ক'রে ফেললেন। মাসীমাকে পেয়ে মণ্ডি আস্তে আস্তে তার মাঝ কথা ভুলে যেতে লাগল, ক্রমে মাসীমাই মণ্ডির কাছে সর্বস্ব হ'য়ে উঠল।

যে সব মেহের দাবী দাওয়া অভ্যাচার সে তার মাঝ উপর ক'রতো, তার সেই সব আব্দার এখন মাসীমাকেই উন্তে হয়। মণ্ডির বাবা যখন দেখলেন যে, ছেলে তার মাসীকে পেয়ে মায়ের অভাব তো ভুলেছেই, এমন কি বাপকে সুন্দর আর চায় না, তখন তিনি আবার নিজের কাজকর্মে মন দিলেন। এমনি করে আরও তিন চার মাস কেটে গেল।

কিন্তু মাসী তো তাঁর বাড়ী ছেড়ে চিরকাল মণ্ডিদের ওখানে থাকতে পারবেন না—তাঁকে এইবাবে চলে যেতে হবে। তিনি মণ্ডির বাবাকে ডেকে ব'ললেন, “দেখ, আমার ত আর থাকবার সময় নেই; অনেকদিন হলো এসেছি, এইবাবে আমায় ফিরতেই হবে, কিন্তু মণ্ডির সম্বন্ধে কি করা যায় বলো তো ? ও তো আমায় একদণ্ড ছাড়তে চায় না, তা আমি কি তকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো ?” মণ্ডির বাবা ব'ললেন, “তা হলে আমি আর এ বাড়ীতে একদণ্ড থাকতে পারবো না। মণ্ডি চলে গেলে আমি বাঁচবো না।”

মণ্ডির মাসী হেসে ব'ললেন, “তা হ'লে ছেলেকে একটি তার মনের মতন ‘মা’ এনে দাও, তা হ'লেই সে বেশ থাকবে।”

মণ্ডির বাবা ব'ললেন, “সে এখন আমি কোথায় পাবো ? তার চেয়ে মণ্ডির দিদিমাকে দেশ থেকে আন্তে পাঠাই না কেন ? তিনি তো একলাটি সেই পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পড়ে আছেন। তাঁকে নিয়ে আসি, এখানে থাকবেন আর তাঁর নাতীকে দেখবেন উন্বেন।”

মণ্ডির মাসী ঘাড় নেড়ে বললেন, “তিনি আর এ বাড়ীতে চুকবেন না। যে বাড়ীতে তাঁর মেয়ে মারা গেছে, সে বাড়ী তিনি আর মাড়াবেন না, তা ছাড়া দেশের বাড়ীতে তাঁর আর কেউ নেই যে সক্ষের সময় তুলসী তলায় একটা প্রদীপ জ্বলে দেবে। তিনি সে ভিটে ছেড়ে আর কোথাও ন'ডবেন না।”

মণ্ডির বাবা ব'ললেন, “তবেই ত মুক্তি! তা হ'লে এখন উপায় কি ?”

মণ্ডির মাসী ব'ললেন, “একমাত্র এর সহজ উপায় হ'চ্ছে যে, তুমি আবার একটি বিয়ে ক'রে নতুন বউ নিয়ে এসো, সে এসে, মণ্ডি মা হবে!”

মণ্ডির বাবা ব'ললেন, “তুমি আর কিছুদিন থাকো, আমি ভেবে দেখি।”

মণ্ডির বাবা যেদিন আবার একটি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এলেন, মণ্ডির মাসী তার কাছে মণ্ডিকে নিয়ে গিয়ে বললেন, “বউ, এই তোমার ছেলে, একে মানুষ করবার ভাব এখন তোমাকেই নিতে হবে!” মণ্ডিকে ব'ললেন, “মণ্ডি এই তোমার নতুন মা, খুব লক্ষ্মীছেলের মতন এর কাছে থাকবে। ইনি তোমায় খুব আদরযত্ন, করবেন, খুব ভালোবাসবেন।”

মণ্ডি তার নতুন মার মূখের দিকে অনেকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। নতুন মা হেসে হাত নেড়ে তাকে কাছে ঢাকলেন। মণ্ডির এই নতুন মা'টিকে বেশ পছন্দ হলো, সে ছুটে গিয়ে একেবারে তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি আমার মা ?” নতুন মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্ব খেয়ে বললেন, “হ্যাঁ!” মণ্ডির মাসী এদের দু'জনের এই সন্তাব দেখে বেশ খুশী হ'য়ে নিজের বাড়ী ফিরে গেলেন।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই, মণ্ডির নতুন মা মণ্ডিকে বড় অযত্ন ক'রতে আরম্ভ করলেন! মণ্ডি একটু কিছু দুষ্টি ক'রলেই তিনি মণ্ডিকে ধরে খুব মারধোর ক'রতেন। মণ্ডির বাবা কাজকর্ম থেকে ফিরে এলেই মণ্ডি তাঁর কাছে গিয়ে কাদতে কাদতে ব'ললে দিত। মণ্ডির বাবা প্রথম প্রথম মণ্ডির দিকে হ'য়ে তার নতুন মাকে খুব ব'ক্তেন এবং মারধোর ক'রতে বারণ করতেন। এতে কিন্তু আরও উল্টো ফল হতো। মণ্ডির বাবা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেই, মণ্ডির নতুন মা তাকে আরও বেশী ক'রে শাসন ক'রতেন। পেট ভরে তাকে থেকে দিতেন না, কথায় কথায় উঠতে বস্তে দাঁত খিঁচুতেন। খুব মেরে ধরে ঘরের ভিতর সমস্ত দিন চাবি বন্ধ ক'রে রেখে দিতেন। মণ্ডি বেচারী কেন্দে কেন্দে ঘুমিয়ে পড়তো।

একদিন সে ঘুমুতে ঘুমুতে স্বপ্ন দেখলে যে, তার পুরোনো মা এসে বেল তাকে ব'লছেন, “মণ্ডি, আয় আমার সঙ্গে তোর মামার বাড়ী গিয়ে থাকবি। এখানে আর থাকিস নি।” মণ্ডি ঘুম ভেঙ্গে উঠে তাড়াতাড়ি ‘মা মা’ বলে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দে'খলে, ঘরের দোর বাইরে থেকে বন্ধ করা রয়েছে। সে তখন ভয়ানক চেচামেচি ক'রতে লাগল, দরজায় লাঢ়ী মারতে লাগল! তার নতুন মা তার এই কাণ্ড দেখে ভয়ানক রেগে এসে দরজা খুলে তাকে টেনে বার ক'রে মারতে মারতে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। মণ্ডি বাড়ীর সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাদতে লাগল দে'খে তিনি সদর দোর বন্ধ ক'রে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। মণ্ডি সোনের ধারে চৌকাঠের উপর আছড়ে পড়ে কাদতে লাগল, “ও মা! দোর খুলে দাও! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি দুষ্টি ক'রবো না!”

কিন্তু কেউ তাকে দরজা খুলে দিলে না। তখন ঠিক দুপুরবেলা, রাত্তায় লোকজনও কেউ চল্ছিল না। বেচারী একলাটি সেইখানে পড়ে কাদতে কাদতে রাত্তার ধারেই ঘুমিয়ে পড়ল।

মণ্ডির যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে জেগে উঠে দেখলে যে, তার সেই পুরোনো মায়ের কোলে সে ভয়ে রয়েছে। আহ্বাদে গদগদ হ'য়ে সে তার মাঝ গলা জড়িয়ে ধরে ব'ললে, “মা তুমি এসেছো! এতদিন কোথায় ছিলে ? তুমি আমার লক্ষ্মী-মা। নতুন মা বড় দুষ্ট ! আমি তোমার কাছে থাকবো।”

মণ্ডির মা বললেন, “সেইজন্যেই তো তোমাকে আজ নিতে এসেছি। চল—

তুমি আমার সঙ্গে চল।” মণ্ডি আনন্দে নাচতে নাচতে তার মাঝ হাত ধরে এগিয়ে চলল।

মাঝ সঙ্গে গিয়ে মণ্ডি ট্রামে উঠল। ট্রাম হ্যারিসন রোড দিয়ে বরাবর হাওড়ার দিকে চলল। হাওড়ার পোলের সামনে ট্রাম থেকে নেমে সে মাঝ হাত ধরে হাওড়ার পোল পার হয়ে গেল। মণ্ডি এব আগে আর কখনো হাওড়ার পোল দেখে নি। পায়ের নীচের গঙ্গার অগাধ জল। তার উপর এই প্রকাণ্ড পোল ভাসছে। পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে মণ্ডির খুব আহসন হচ্ছিল, আবার তারও হাতে লাগল, যদি সে পা ফক্ষে জলে পড়ে যায়, তা হলে নিশ্চয় ভুবে যাবে! সে মাঝ খুব কাছে ঘেসে তাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে চলল। পোল পার হয়ে তারা হাওড়ার টেশনে এসে রেলগাড়ী চড়লে। রেলগাড়ী চ'ড়ে মণ্ডির কি ফুর্তি! রেলে চলতে চলতে রাত্রি হয়ে গেল! মণ্ডির মা মণ্ডিকে কত কি খাবার দাবার কিনে খাওয়ালেন। খেয়ে দেয়ে সে মাঝ কোলাটিতে মাথা রেখে শয়ে গল্প করতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরোত্তে যখন মণ্ডির খুব ভাল তখন মা'রে পোমে তারা গরুর গাড়ী ক'রে শুকপুর আমের পথ দিয়ে চলেছে। মণ্ডি জিজ্ঞাসা করলে, “মা, এ আমরা কোথায় যাচ্ছি?” তার মা ব'ললে, “তোমার মামার বাড়ীতে, এ জায়গাটার নাম শুকপুর। তোমাকে আমি তোমার দিদিমার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।” মণ্ডির একথা শনে ভাবি আনন্দ হ'ল। অনেকদিন সে দিদিমাকে দেখে নি। দিদিমা তাকে কত আদরযত্ন করবেন, কত ভালোবাসবেন। শুকপুরে সে নিশ্চয় সুবে থাকবে। সকালবেলা সূর্য ওঠবার আপেই তাদের গরুর গাড়ী একখানি সুন্দর পরিকার কুটীরের সামনে এসে দাঁড়াল। মণ্ডির মা মণ্ডির হাত ধ'রে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে ভাড়া দিয়ে তাকে বিদেয় ক'রে দিলেন। তারপর মণ্ডিকে সেই কুটীরের বক্সারের কাছে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “তোর দিদিমাকে ডাক, দরজা খুলে দেবেন। আমি ততক্ষণ এই পুকুর ঘাটে গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে আসি।”

খোকার ডাকে তার দিদিমা এসে দরজা খুলে দিয়ে খোকাকে দেখে অবাক! বললেন, “একি! মণ্ডি! তুই এমন সময় একলাটি এখানে কার সঙ্গে এলি?” মণ্ডি বললে, “কেন, আমি তো মাঝ সঙ্গে এলুম!”

মণ্ডির কথা শনে দিদিমা চম্কে উঠলেন—সে কি? খোকা এ কি বলছে? তার মা যে আজ একবৎসর ই'তে চলল মারা গেছে। তবে ও কার সঙ্গে এলো? বোধ হয় ওর বাবা আবার যে বিয়ে ক'রেছে সেই বউয়ের সঙ্গে এসেছে। তিনি মণ্ডিকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন, “ওঁ তুই বুবি তোম নতুন মাঝ সঙ্গে এসেছিস? কই সে মেয়ে কোথা গেল? মণ্ডি সজোরে ঘাড় নেড়ে বললে, “না গো না—নতুন মা নয় দিদিমা, আমার মা! আমার নতুন মা বড় দুষ্ট, সে আমাকে

আস্তে দিতো না। আমার পুরোনো মা আমাকে নিয়ে এসেছে। মা আমাকে দরজা ঠেলে তোমাকে ডাকতে ব'লে ওই সামনের পুকুরে হাতমুখ ধূতে গেছেন।” মণ্ডির দিদিমা কথাটা শনে আশ্রয় হ'য়ে ব'ললেন, “কই কোন পুকুরে গেল চল তো দেখি।” মণ্ডি মহা উৎসাহে তার দিদিমাকে নিয়ে সেই পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির হলো। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না। তখন তার দিদিমা মনে করলেন, ছেলেমানুষ! মাকে হয় তো ঠিক চিনতে পারে নি, আমের অন্য কোনও বড়-বিয়ের সঙ্গে এসেছে হয় তো! তাই বলছে, মাঝ সঙ্গে এসেছি। তিনি বললেন, “আচ্ছা, চল ঘরে চল, সে এখনি আসবে বোধ হয়।”

দিদিমার শোবার ঘরে ঢুকে মণ্ডি দেখলে দেওয়ালে তার মাঝ একখানি বাঁধানো ফটোগ্রাফ খুলছে। মণ্ডি বললে, “ঐ যে আমার মাঝ ছবি রয়েছে, ওই মাই তো আমার নিয়ে এল।” মণ্ডির দিদিমা তার কথা শনে অবাক! শেষে সমস্ত শনে তিনি ব'ললেন, “আহা! মেরেটা মরেও ছেলের মাঝা খুলতে পারে নি! ছেলেটার সেখানে বড়ই কষ্ট হচ্ছে দেখে নিজে সঙ্গে করে এনে আমার কাছে নিয়ে গেল।”

এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটা খুব হৈ চৈ পড়ে গেল। কেউ কেউ ব'ললে, “ওটা আগাগোড়াই মিছে কথা। মণ্ডির মা আজ প্রায় পনেরো মাস হলো মারা গেছেন, তিনি ওকে নিয়ে আসবেন কি ক'রে?” কিন্তু মণ্ডির দিদিমা ব্যাপারটা ঠিক অবিশ্বাস করতে না পেরে, মণ্ডির বাবাকে থবর দেওয়া উচিত ভেবে তাকে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। তার জবাব এলো যে, সত্যিই সেদিন মণ্ডিকে মেরে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে বাড়ীর দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কিন্তু ঘন্টাখানেট পর তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। আপনার চিঠি পেরে খোকার সহজে নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু মণ্ডির মাঝ সমস্কে যা লিখেছেন, সেটা কি ঠিক? দিদিমা লিখলেন তার একটি বর্ণও মিথ্যে নয়, সত্যিই মণ্ডির মাঝ প্রেতাঞ্চা তোমাদের কাছে ছেলের কষ্ট দেখতে না পেরে নিজে আবার পূর্বরূপ ধারণ করে তাকে ওখান থেকে এখানে এনে দিয়ে গেছে!

মণ্ডির বাবা এ চিঠি পেয়ে মণ্ডির নতুন মাকে বললে, “এ সব বাজে কথা” মানুষ মরে গেলে আর ফিরে আসে না। এ সব এই বুড়ির চালাকি!”

আয়না নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দান তিনেক আগে সন্ধ্যার পর বউবাজার ট্রাইটের একজন বন্ধুর ফার্নিচারের দোকানে বসে গল্প করছিলাম। উভর দক্ষিণে লম্বা দোকানটির বেশির ভাগ জায়গা সরোজ ওদামের কাজে লাগিয়েছে। নামা প্যাটার্নের খাট, চেয়ার, আলমারিতে সেই ওদাম ভরতি। দোরের সামনে যে অংশ একটু জায়গা রয়েছে, সেখানে ছোট একটি টেবিল। সরোজের কাউন্টার। আমরা সেই টেবিলের ধারে দু'খানা চেয়ারে পাশাপাশি বসে সুব দুঃখের কথা বলছিলাম।

বাইরে টিপ টিপ করে শুষ্ঠি হচ্ছে। ফৌটা কখনো ছোট, কখনো বড়। বৃষ্টিটা একটু জোরে শুরু হতেই সরোজ দোর বন্ধ করে দিল। বলল, ‘কাও দেখ! এক বাপটায় সব ভিজিয়ে ফেলল। কার্ডিকের শেষে এমন বদরসিক বষ্টি আর দেখেছ!'

বন্ধুর সেই বিরভিটুকু আমি উপভোগ করলাম। তারপর উচ্চে দাঙ্গিয়ে বললাম, ‘এবার যাই।’ www.banglabookpdf.blogspot.com

কিন্তু সরোজ জোর করে আমার হাত ধরে টেনে বলল, একটু ধমকের সুরে বলল, ‘সেই তো যাই যাই করছ! ন’মাসে হ’মাসে একবার দেখা হয়, যদি দু-দণ্ড বসতেই না পার, তবে আস কেন?’ তারপর হেসে নরম গলায় বলল, ‘বসো আর একটু। মন-মেজাজ খুব খারাপ। যা ওয়েদার চলছে, তাতে করে যে ফের থবেরের ঘুর দেখব, কে জানে!'

বললাম, ‘তোমার গলায় সত্যিই বিরহের সূর ফুটছে।’

আমার কথা শেয় না হতেই দরজায় টোকা পড়ল। আমি গলা নামিয়ে বললাম, ‘দেখ, তোমার থবের বোধ হয় এবার একজন এলেন।’

সরোজ উঠে দাঙ্গিয়ে বলল, ‘আসুন দোর খোলাই আছে।’

গ্রায় সঙ্গে সঙ্গে সশ্বে দরজা টেলে ভদ্রলোক ধরে ঢুকলেন। আমি একট চমকে উঠে তাকে ডাকালাম। ভদ্রলোকের বয়স বাছৰ চলিশ-বিয়ালিশ হবে। লম্বায় প্রায় ছ’ফুট। বেশ সুপুরুষ। গৌরবৰ্ণ চেহারা। নাক-চোখ ঢানা-ঢানা। শুধু দুপুরুষই নয়, ভদ্রলোক বেশ সৌখিন। গায়ে পরদের পাঞ্চাবি। পরনে যিহি কোচালো ধূতি। এইটুকু পথ আসতেই বেশ একটু ভিজে গেছেন।

এমন একজন সুদর্শন পুরুষকে দেখেও আমার বন্ধু সরোজ খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না। বরং তাকে যেন একটু অপ্রসন্নই দেখাল।

সরোজ পঞ্চির স্বরে বলল, ‘বসো নিরঞ্জন। এই বৃষ্টি-বাদলের দিনেও বেরিয়েছ?'

এতক্ষণ ভদ্রলোককে বেশ স্বাভাবিক সপ্রতিভ অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্তু সরোজের শুই সাধারণ একটি প্রশ্নে তিনি যেন অন্যরকম হয়ে গেলেন। যেন কি একটা গোপন অপরাধ তার ধরা পড়ে গেছে। চোখে মুখে ঠিক তেমনি এক ধরনের

নার্তাস ভাব ফুটে উঠল।

তিনি যেন একটা অভিযোগের প্রতিবাদ করছেন তেমনি ভঙ্গিতে বললেন, ‘হ্যা, বেরিয়েছি। কি এমন বড়-বাপটা হচ্ছে যে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারবে না! আমার এদিকে কাজ ছিল, তাই বেরিয়েছি।’

সরোজ একটু হাসতে চেষ্টা করে বললে, ‘বেশ করেছ। দরকার থাকলে বেরোবে বৈকি! আমরা কি বেরোই না! বসো, ভাল হয়ে বসো।’

কিন্তু লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের মধ্যে যেন কিসের একটা চাপলা আরম্ভ হয়েছে। তিনি তাকে জোর করে চাপতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতে পেরে উঠেছেন না। মনে হল, তিনি যেন একবার উঠে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু না পেরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। যেন জোর করে তাকে কেউ উঠতে দিয়েছে না, তাকে ইচ্ছার নিরঞ্জনে আটকে রাখছে। তার ভাবভঙ্গি দেখে কেমন যেন একটা অপ্রকৃতিপূর্ণ বলে মনে হল।

তারপর হঠাতে তিনি বললেন, ‘সেই আয়নাখানা কোথায়? বিজি হয়ে গেছে?’

সরোজ তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি জানতুম, তুমি এ কথাটি ঠিক জিজ্ঞেস করবে। তুমি এর জন্মেই এসেছ।’

ভদ্রলোক ফের প্রতিবাদের সুরে বললেন, ‘এর জন্মেই এসেছি। আশ্চর্য তোমাদের ধারণা। আমার একটা জিনিস তোমাকে বিজি করতে দিয়েছি, সেটা তুমি বিজি করলে কি করলে না জিজ্ঞেস করলেই তা দোষের হয়ে গেল?’

সরোজ শাস্তিভাবে বলতে চেষ্টা করল, ‘আমি কি বলছি দোষের! তুমি এত চটচট কেন? সত্যিই তো, তোমার জিনিসের কথা তুমি একবার কেন, হাজার বার জিজ্ঞেস করতে পার, তাতে কিছুই দোষের নেই। ওই তো তোমাদের সেই ড্রেসিং টেবিলটা রয়েছে। এখনো বিজি করতে পারিনি। ভেবো না, দুরদাম হচ্ছে, একদিন বিজি হয়ে যাবে।’

‘আমার ভাববাব কি আছে।’

বলে ভদ্রলোক চেয়ারে চেপে বসে রইলেন। তারপর যেন নিজের অনিষ্ট সত্ত্বেও উঠে পড়লেন। ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালেন জ্বেসিং টেবিলটার সামনে। এতক্ষণ ফার্নিচারের মধ্যে আমি সেই টেবিলটাকে এতক্ষণ লক্ষ্য করিলি। তিনি গিয়ে দাঁড়াতে এবার জ্বেসিং টেবিলটা আমার চোখে পড়ল। দেখলাম, টেবিল-আয়নাখানা সত্যিই বেশ সুন্দর। আগেকার আমলের বার্মাটিকে তৈরি। কালো পালিশ। আয়নাখানা বেশ পুরু আর সুস্থ। আমি ফার্নিচার ডিলাগ নই। এসব জিনিস তেমন ব্যবহারও করিলে। তবু বুঝতে পারলাম, জিনিসটা বেশ দামী। আজকাল এ জিনিস খুব সুলভ নয়।

কিন্তু আয়নার মধ্যে ভদ্রলোকের গুরের যে ছায়া পড়েছে, তাকে দিকে হঠাতে আমার চোখ পড়ায় আমি চমকে উঠলাম। বলতে লজ্জা নেই, আঁককে উঠলাম। এমন বিবরণ ভীত খুব আমি আর দেখিনি। ভদ্রলোক আয়নার মধ্যে কি দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু তাকে দেখে আমার মনে হল যেন তিনি আর আমাদের জগতের কেউ নন, কেন এক অলৌকিক গোকের অধিবাসী। তবু জিনিসটা বোধ হয়

সংক্ষিপ্ত। নইলে তাঁস্তু ভয় আমাকে এমন ভয়ার্ত কার তলাবে কেন?

তাম চোর গোটেন, শব্দের গুরের চেয়েও অনী মেয়ের গুরু আরো
বাগড়াগাঁটি খুল চলতে লাগল। তারপর কথার মুখে নিরঞ্জন
ল, আমার যা খুশি তাই করব। আমি বিয়ে করব রেখাকে। আমি
তোমার দ্বারা তো আব তা হবে না।

নে একটি ছেলে হওয়ার সময় হাসপাতালে মীরা বৌদির
ল। সেই থেকেই তাঁর সন্তান হওয়ার সংজ্ঞানা নষ্ট হয়ে যায়।
ফের সেই পুরোন কথা শুনে মীরা বৌদি হঠাতে শুক হয়ে
পর আব তিনি কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি।

স থেকে দেদিনও খুব রাত করেই ফিরে এসেছিল। এসে দেখে,
জা বুক। অনেক অনুভব বিনয় রাণ্যারাগির পরও দরজার পাট না

১৯৯

Superstitions লোক নিয়ে কাজকর্ম করাই মুশকিল।*

মারা একটু লাজত হয়ে বলেছিলেন, তা নয়। একটা আয়না বিক্রি করলে,
কতই রা হত!

কিন্তু নিরঞ্জন আব মাসিমাৰ কাছে শুনেছি, আয়নাৰ ওপৰ মীরা বৌদিৰ একটু
বেশিৱকম দুৰ্বলতা ছিল। গঁষনাগাঁটি তিনি বেশি পৱতেন না। কিন্তু সময় পেগেই
যথন-তথন আয়নাৰ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। এক দৃষ্টিতে নিজেৰ ছায়াৰ দিকে
চেয়ে থাকতেন। কি দেখতেন, কি ভাবতেন তিনিই জানেন। যে ক্ষেপে স্বামীকে মুক্ত
কৰতে পারেননি, সেই ক্ষেপকে তিনি কি চোখে দেখতেন তা জানিনে। নাকি নিজেৰ
ছায়াৰ দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলতেন, আরো শক্ত হও, ধৈর্য ধৰ, কিছুতেই তেঙ্গে

১৯৮

কটু। এই নিয়ে
একদিন বলে বস
ছেলেমেয়ে চাই।

পথে বৌব
অপারেশন হয়েছিল
স্বামীৰ মুদ্রণ
গিয়েছিলেন। তাৰ
নিরঞ্জন অফিস
শোবাৰ ঘৰেৰ দৰ

বছর পাঁচেক বাদে মেসোমশাইও চোখ বুজলেন। কিন্তু নিরঞ্জনের তখনও ফেরবার নাম নেই। শুই সেই পিসে বিরাজ গাঙ্গুলী যেন ওপর মধ্যে নতুন জন্ম নিয়েছে।

এই সময় একদিন ছেলের অনুগ্রাশনে মনের নিম্নলিখিত করেছিলাম। নিরঞ্জন আসেনি। মাসিমা আর মীরা বৌদি এসেছিলেন। শান্তভ্রিং অসাক্ষাতে মীরা বৌদি সেদিন আক্রেপ করে বলেছিলেন, সরোজবাবু, বাবা আমাকে শুধু বাড়ি-ঘর দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, কার হাতে দিলেন দেখেনি।

আমার শ্রী মহিলা বলেছিল, শুকথা কেন বলছেন মীরাদি। ঝুপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোনটাতেই তো তিনি থাটো নন। তাঁর তো সবই আছে।

মীরা বৌদি বলেছিলেন, মানুষ তো কেবল বাইরেটাই দেখে, ভিতরে যে থাকে সেই বোবো সব থাকবার কি জুলা।

তাঁর সেই কথাওলি আজও যেন আমার কানে লেগে রয়েছে।

আরো বছর তিনিকের মধ্যে নিরঞ্জন পৈতৃক বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব খোয়াল। দামী দামী সব ফার্নিচার তারি সন্তান বিক্রি করে দিল। আমাকে একবার জানালও না। আমি জানতে পারলে ওকে অমন করে ঠকাতাম না। মীরা বৌদি রাগ করে গিয়ে বাপের বাড়ি ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, বিয়ের সময় বাবার কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া তাঁর খাট আলজারি পর্যন্ত নিরঞ্জন বিক্রি করে দিয়েছে। বাকি আছে ড্রেসিং টেবিলটা। তারও দরদাম হচ্ছে। মীরা বৌদি সেই আয়নার সামনে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে রইলেন। বললেন, আমাকে না বেচে তুমি আমার বাবার দেওয়া এই টেবিল বিক্রি করতে পারবে না। তাঁর দেওয়া একটা জিনিসও আমি রাখতে পারব না।

তারপর ওরা জোড়াবাগান ছেড়ে বরানগরের একটা ছোট ভাড়াটে বাড়িতে উঠে যায়। সেখানেও জোর দাপ্তা-কলহ চলে। তারপর হঠাত নিরঞ্জন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ও সেবার মাস হয়েক ভুগেছিল। মাঝে মাঝে আমি যেতাম। আর দেখতাম, মীরা বৌদির সেবা-গুরুৱা। তখন তাঁর গয়না বিক্রি করে চিকিৎসা চলত, সংসার চলত। এই গয়নার বাক্স স্থামীর হাতে পড়বে বলে নিজের দাদার কাছে তিনি লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন। বিপদের দিনে সেই বাক্স আবার তিনি ফেরত নিয়ে এলেন। নিরঞ্জন একদিন শ্রীকে বলেছিল, আয়নাটা বিক্রি করতে দিলে না, অথচ গয়নাগুলি নিবিধি বিক্রি করছ। আয়নাটা কি গয়নাগুলির চেয়ে দামী?

পড়ো না।

নিরঞ্জন সুস্থ হয়ে উঠল। ডাক্তার শাসন করে বলেছিলেন, কেবল মদ ধরালে আর বাচবেন না। অনেক কষ্টে লিভারটিকে রক্ষা করেছি। আর অত্যাচার করলে সইবে না।

তবু মনের জন্ম নিরঞ্জনের মন চপ্পল হয়ে উঠত। কিন্তু উঠলে হবে কি, আর সেই অর্থও ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। মৃদু মোলায়েম নেশা হিসাবে মীরা বৌদি নাকি তাকে এসময় তাঙ্গের সরবৎ করে দিতেন। নেশার সময়টাকে পার করে দেওয়ার জন্ম সেজেওজে স্থানীয় কাছে গঢ় করতে বসতেন।

সুস্থ হওয়ার পর নিরঞ্জনের হঠাত সুমতি হল। এককাল বাদে চাকরির খোজে বেরোল নিরঞ্জন। একটা ইনসিওরেন্স অফিসে ভাল চাকরিত পেল। চেহারা আছে জিয়ী আছে, বলতে কইতে পারে, পাবে না কেন! খবর শুনে মীরা বৌদিকে কনফাচুলেট করে এলাম। বললাম, আপনার ক্ষমতা আছে। আগনি ছাড়াও কে আর কেউ ফেরাতে পারত না।

মীরা বৌদি ক্ষিত মুখে চুপ করে রইলেন।

বছর ধানেক ভালই কাটল। কিন্তু তারপর তাঁর সে সুখ বেশি দিন সইল না।

নিরঞ্জনকে নতুন নেশায় ধরল। মদ নয়, মনের চেয়েও মারাত্মক। রেখা চ্যাটার্জি নামে বাইশ-তেইশ বছবের একটি নেয়ে নিরঞ্জনদের অফিসে টাইপিস্টের কাজ করে। তাঁকে নিরঞ্জনের চোখে পড়ল। আমি সে সেয়েটিকে দেখেছি। দেখতে কামো, রোগা, তাঙ্গা চেহারা। তাঁর মধ্যে নিরঞ্জন কি যে দেখেছে সেই জানে। আমরা, টাইপিস্ট আর তাঁর নাম জড়িয়ে নানা কথা শুনতে লাগলাম। ফুটির পর নিরঞ্জন সরাসরি বাড়ি আসে না। রেখাকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, শিলেমায় যায়, খিয়েটারে যায়। নানারকম সৌধিন জিনিস কিনে খেজেন্ট করে। মাইলের বেশির ভাগ টাকাই নাকি তাঁর এইজাবে বায় হয়ে যায়। আর এই নিয়ে বামী-গুৰু মধ্যে দিন-রাত বাগড়া চলে। সত্যি বলতে কি, বেরোন দিকে নিরঞ্জনের আগে কৌক ছিল না। সে মনেই খুশি থাকত। মীরা বৌদি তখন নাকি বলতেন, তুমি বরং অন্য মেয়েকে ভালবাস তা আমার সইবে, কিন্তু মনের পদ্ম আমি সইয়াচ বাসে না। —তিনি পাখে মিহি সে মনের পদ্ম আমি সইয়াচ বাসে না।

খুলতে পেরে, রাত্রের জন্যে নিরঞ্জনকে মার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়। পরদিন তোমে
মিস্টি ডেকে ভেঙে ফেলে দরজা। দেখা যাব কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে মীরা বৌদি
বুলছেন। তাঁর পায়ের ছায়া পড়েছে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায়। এ দৃশ্য দেখে
নিরঞ্জন স্তন্ধ হয়ে যায়, মাসিমা চিৎকার করে উঠলেন। বাপ-মা মরা সুলতা নামে
চোদ-পরেরো বছরের একটি ভাইবি থাকতে তাঁর কাছে, সে মুছা যায়। তারপর যা
যা ঘটতে লাগল সবই গতানুগতিক। আমার স্ত্রী একদিন মাসিমার সঙ্গে দেখা
করতে গিয়ে শুনে এল, সুলতা নাকি ও বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না। নিরঞ্জন
অফিসে বেরিয়ে গেলে ঘরখানা সাধারণত বন্ধই থাকে। সেদিন বিকেল বেলায়
সুলতা ঘর বাড়ি দেওয়ার জন্যে যেই দরজা ঢেলে ভিতরে ঢুকেছে, কে যেন
তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে থেকে সরে গেল। আর একদিন সকার একটু আগে
মাসিমা ওই ঘরের পাশে দিয়ে যাওয়ার সময় চিরশীতে চুল আঁচড়াবার শব্দ শুনতে
গেলেন।

এমন কিছু নতুন নয়। যে বাড়ির বউ আস্থাহত্যা করে যাবে, সে বাড়ির মেয়েরা
কিছুদিন এ ধরনের অনিসর্গিক ব্যাপার দেখতে-শুনতে পায়। আমি আমার স্ত্রীর
কথা হেসেই উভয়ে দিলাম। বললাম, কবে দোকান থেকে ফিরে এসে দেখব, মীরা
বৌদি তোমার সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন।

আমার স্ত্রী রাগ করে বলল, তাকে নিয়ে ঠাণ্ডা আমার ভাল লাগে না।

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেলাম। সত্যি, মীরা বৌদিকে নিয়ে ঠাণ্ডা
করা চলে না। কিন্তু এত যাব বুদ্ধি, এত যাব ধৈর্য, তিনি ঝোকের মাথায় ও কাজ
করতে গেলেন কেন? নিরঞ্জনকে বাধা দেওয়ার আর কি কোন উপায় ছিল না?

দিনকয়েক বাদে নিরঞ্জন এল এই দোকানে। একথা-সেকথার পর হঠাতে বলল,
মীরা বৌদির ড্রেসিং টেবিলটা সে বিক্রি করে দিতে চায়। তার কথা শুনে আমি তো
অবাক। এমন কাজ কেন করতে যাবে নিরঞ্জন। মীরা বৌদির একটা শৃতিচিহ্ন থাক
না শুনের বাড়িতে। আয়নাটা কত ভালোবাসতেন বৌদি।

নিরঞ্জন সেদিন আর কিছু না বলে উঠে গেল। দিনকয়েক বাদে মাসিমা
আমাকে খবর পাঠালেন। তাঁর কাছে শুনলাম, নিরঞ্জন নাকি রাত্রে আলো জ্বলে
যুমোয়। অথচ এর আগে ঘরে একটু আলো থাকলে তার ঘুম হত না। এর পর
তিনিও আমাকে টেবিলটা নিয়ে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বললেন, এখন
তোর ঢাকা দিতে হবে না, বিক্রি হয়ে গেলে যদি কিছু দিতে হয় দিস, না দিলেও
কিছু আমার লোকসান হবে না।

মাসিমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টেবিলটা নিয়ে আসার জন্যে আমাকে এমন বাব করে
করে বলতে লাগলেন যে পরদিনই আমি দোকানের একটা কুলিকে পাঠিয়ে দিলাম।
নিরঞ্জন মুখে একটু আপত্তি করল, কেন আবার তুমি এত কষ্ট করতে গেলে।
আয়নাটা যেবানে ছিল, দেখানেই না হয় থাকত।

কিন্তু ওর ভাবভঙ্গ দেখে আমার মনে হল, আয়নাটা ওর বাড়ি থেকে নিয়ে
আসায় নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত হয়েছে, খুশি হয়েছে।

ড্রেসিং টেবিলটার যা ন্যায্য দাম, আমি তাই ওকে দিতে গেলাম। কিন্তু

নিরঞ্জন কিছুতেই নিল না। বলল, ঘর থেকে কেন দেবে, বিক্রি হয়ে গেলে তারপর
দিও।

দাম নিল না বটে, কিন্তু নিরঞ্জন রোজ একবার করে আয়নাটাৰ ঘোঁজ নিতে
আসতে লাগল। জিনিসটা বিক্রি হয়েছে কিনা, কেউ এসে দুর করে গেছে কিনা,
রোজ এক পৃশ্চ।

মাসিমা আর একদিন খবর দিলেন, বললেন, নিরঞ্জন এবার একটা বিয়েটিয়ে
দে।

কথাটায় আমি একটু আঘাত পেলাম। এই সেদিন মীরা বৌদি মারা গেলেন,
তাও সাধারণ মৃত্যু নয়, আর এরই মধ্যে মাসিমা ছেলের বিয়ের প্রস্তাৱ করছেন?

মাসিমা আমার মনের ভাব বুবাতে পেরে বললেন, একা এক ঘরে থাকতে
বোধ হয় ভয় হয়। সারা রাত ঘুমোয় না। আমি বলি, আমি এসে তোম কাছে
থাকি, কিন্তু তাতে ও বাজী হয় না। বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে বল? ও
নাকি তাকে ভালবাসে। তুই তাকেই একটু বুবিয়ে বল।

এরপর সত্ত্বাই আমি সেই রেখা চ্যাটার্জির সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম। খুব
রেখি ভূমিকা না করে বললাম, আপনি বোধ হয় দুর্ঘটনার কথা সব শুনেছেন?

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল।

আমি বললাম, মাসিমার ইচ্ছা আপনারা তাড়াতাড়ি বিয়ে করুন।

রেখা বলল, তা হয় না।

কেন? আপনিও কি ভূতের ভয় করেন নাকি?

রেখা এবার চোখ তুলে আমার দিকে ভাকাল, বলল, না, ভূত নয়, ভূতে
পাওয়া মানুষকে আমার ভয় সবচেয়ে বেশি।

আমার বৰু তার কাহিনী শেষ করুন।

আমি চুপ করে রইলাম। রেখা চ্যাটার্জির কথা যে কত সত্যি, তা আমি একটু
আগেই টের পেয়েছি।

বষ্টির জোরটা একটু কমে এলে আমি বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।
আশ্চর্য, তারপর থেকে রোজই আমার ইচ্ছা করতে লাগল, আয়নাটাৰ একবার
ঘোঁজ নিয়ে আসি। কিন্তু ও-পথে আমি কিছুতেই আর মাড়ালাম না। শেষে আমিও
কি নিরঞ্জনের মত হব? তবু বাব বাব আমার কৌতুহল হতে লাগল, কি হল সেই
আয়নাটাৰ, কি হল নিরঞ্জনেৰ।

আজকের সকালের কাগজ আমার সেই কৌতুহল মিটিয়েছে। খবর বেরিয়েছে
দমদম স্টেশনে কাল সকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের তলায় কাটা পড়েছে
একজন লোক। নিরঞ্জন হালদার বসে তাকে সন্তান করা হয়েছে। রেল পুলিশ
ঘথারীতি তদন্ত করেছে। কেসটি আস্থাহত্যা বলেই তাদের সন্দেহ।

ন্যাপা লীলা মজুমদার

অস্বাভাবিক মানুষ ও অস্বাভাবিক ঘটনা বে হরদম চোখে পড়ে এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই—ই, এমনকি এমন বহু ঘটনার কথা শোনা যায় যাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে গেলে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কে না জানে যে সেসব ঘটনাও হামেশাই ঘটে থাকে।

হামেশাই ঘটে থাকে বলছি বটে, তবে সব সময় নিজেদের জীবনে ঘটে না, তাই চাকুর প্রমাণ দিতে পারে এমন সাক্ষী খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাদের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, এ-রকম বহু লোকের নিজেদের জীবনে না হোক, তাদের নিকট আর্জীয়ত্বজনদের কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জীবনে সেসব ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকতে শোনা যায়।

যেমন ধরুন আমার মাঝে সই হিস গাঙ্গুলীর কথা। বিয়ে-থা করেননি, নামকরা শ্রীশান বাড়ির মেয়ে, নামটা অবিশ্বা পালটে দিয়েছি, নইলে সবাই চিনে কেতাবেন শেষটা—ভবানীপুরের দিকে একটা মেঝেদের হোটেল চালান। আমার মামা বাড়ির পুরোন চাকর বনমালীও সেখানে বহু বছর কাজ করছে। সব জানাশোনা লোকেরা ব্যাপৰ, বুবাতেই পারছেন, এরা কেউই সেনকম একটা বালিয়ে মিথ্যে কথা বলবার মানুষও নন, অথচ ঘটনাটা শুনে কী বলবেন তা ভেবে পাবেন না।

সারাদিন বনমালী ন্যাপাকে আগলিয়েছে, এখন সকা঳ ঘনিয়ে এসেছে, আর তাল লাগছে না। মানুষের ভাইবেন কেন হয়? ন্যাপাটা পাজির একশেষ, আর কেউ হলে বনমালী তার সঙ্গে কথাটি বলত না, অথচ মায়ের পেটের ভাই বলে যেই না জেল থেকে ছাড়া গেল, অমনি বনমালীও তাকে নিয়ে গিয়ে রান্না শরে তোকাতে বাধ্য হল।

‘ওর জুড়ি রাঁধুনে সারাটা পৃথিবী ধূরে আর একটা খুঁজে পাবেন না দিনি, নিদেন একটা ট্রায়েল দিন তো।’

কথাটা মিথ্যোও নহ। একবেলা ন্যাপার রান্না থেঁয়েই দিদিমণিদের মুখে তার প্রশংসা আর ধরে না। আর ন্যাপাকে পায় কে।

তবু কাজটা ভাল হয়নি। ন্যাপার মনে কী আছে কে জানে! দুষ্টবুদ্ধি জাগতেই বা কতক্ষণ? বাড়ির ভিতরে তো বনমালী আর বাইবের ফটকে দারোয়ান ছাড়া আর একটা বাটাহেলে নেই। সারাদিন দিদিরা ইঙ্গুলে পড়ায়, বাড়ি-ঘর থা-থা করে, জিনিসপত্র এধারে-ওধারে ছড়ানো পড়ে থাকে। ন্যাপার যা স্বতাব, বনমালীর মনে শান্তি নেই। অথচ মায়ের পেটের লাইটাকে সে-ই মাদি আশ্রয় না দেয় তো

আর কে দেবে?

যাক, তবু যতক্ষণ রান্নাঘরে কাজে থাকে ততক্ষণ রক্ষা। বাস্তবিক দাঁধে থাসা। ছেলেবেলা থেকে ওর হাতে জাদু আছে, বেশ ভাল মাইনেতে সাহেব-বাড়িতে করে থেকে পারত, অথচ তবু যে কেল দুর্বুদ্ধি জাগে কে জানে! যাকগে, এখন রাতের খাবার জন্য টেবিলটা লাগাতে হবে, এসব ভেবে তো কোন লাভ নেই।

দরজার কোণা থেকে বনমালী লক্ষ করে দেখল, মোড়ের বাড়ির বুড়ি মাসিমা এসেছেন। সবাই মিলে টেবিল থিবে বসেছেন। কথাও কালে আসছে। মাসিমা একবার কথা বলতে শুরু করলে আর বক্ষা নেই, কিন্তু তুনতে বেশ মজাও লাগে।

‘ইয়া, একদম চেছেপুঁছে সব নিয়ে এলাম ব্যাক থেকে। আমাকে সন্দেহ করে এত বড় আশ্পর্দ্ধা! বুঝলি উমাশশী, প্রত্যেকটি জিনিস আমার বাবা আমার মাঝ জন্য পড়িয়ে দিয়েছিলেন। মা মরবার সময় সম্মান দুই ভাগ করে আমার হাতে দিলেন। একটা ভাগ আমার, একটা ভাগ ভাদুর বউয়ের জন্যে। সে একবারে ছলচেরা ভাগ ভাই। জোড়া ভেঙ্গে ভেঙ্গে একটা বালা আমাকে একটা ওকে; একটা ইয়ারিং আমাকে, একটা ওকে। যেমন দুটি বন্ধালে বেঁধে দিয়েছিলেন, তেমনি ব্যাকে তুলে দিয়েছিলাম, এই দশ বছরে একবারও খুলিনি। ওরাও মফস্বলে ঘুরেছে, সাহস করে কিছু নেয়ানি। এখন এখানে এসে বসেছে, অমনি বউ কিনা আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। আজ ভাবি রেগে গেছি, এই পুটলিসুন্দ ওর মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেব।’

উমাদিদি কিছু বলবার আগেই কম বয়সের মণিদিদি বলে উঠলেন, ‘কই মাসিমা, দেখি, দেখি কি বকম গয়না!'

মাসিমা ও তাই চান, দুই পুটলি খুলে টেবিলের উপর ঢেলে দিলেন। কালোপানা কাটের উপর ছোট ছোট সোনার তিবির মত জুলভূল করতে লাগল। বনমালীর চোখ বলসে গোল। এত গয়না যে ওই থালকাপড়-পরা বুড়ি মাসিমাৰ থাকতে পারে, এটা বনমালীৰ ধারণা ছিল না। ইস, লাল নীল সাদা সবুজ পাথর বসানো একবারে তাল-তাল সোনা গো। ওর দাম কত হাজাৰ টাকা হবে কে জানে? এর ছোটপানা একটা বেচলেই বনমালীৰ মাঝ ইন্জেকশনগুলোৱ দাম উঠে যাবে। বুড়ি মাসিমা তো আছা, এই রাজাৰ ধনৱত্ত তুলে রেখে দিয়ে মিলেৱ থালকাপড় আৰ ববাৰেৰ চঠি পৱে বেড়ায়, বুড়ো বয়স অবধি ইঙ্গুলে সেলাই শেখায়। একটা ভাল জিনিস কোনদিন কৈনে না, থায় না।

দিদিমণিৰা জিনিসগুলোৱ উপর বুকে পড়ে নেড়ে ঢেড়ে দেখতে, এক-একটাৰ উপর আলো পড়ে আৰ অমনি খিলমিলিয়ে ওঠে। বনমালীৰ চোখ জুলা কৰে। ভয়ে-ভয়ে একবার পিছন ফিরে দেখে, ভাগিয়া, ন্যাপা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। বনমালীৰ মুক চিপ চিপ কৰতে থাকে। আঃ বাঁচা গেল, মাসিমা আবাৰ ওঙ্গলোকে পুটলি বেঁধে ফেলছেন।

মণিদিদিৰ হাতে তখনও লাল পাথর বসানো মালাটা রয়েছে। ‘আপনাৰ কী সাহস মাসিমা! এত সব দেখে আমাদেৱই চুৱি কৰে নিজে ইচ্ছ

করবে, আর আপনি ওই ব্যাগ নিয়ে সঙ্গেবেলা এতটা পথ একা হেঁটে বাড়ি গিয়ে
তবে লোহার সিন্দুকে তুলবেন। ভয়ড়র নেই আপনার প্রাণে ?'

মাসিমা অমনি পুটুলি বাঁধা বন্ধ করে একগাল হেসে বললেন, 'আরে, আমাৰ
বাবাৰ জুলায় কি আমাদেৱ ভয়টয় পাৰাৰ জো ছিল ! জানিস তো বাবা মন্ত বড়
উকিল ছিলেন, রাশি রাশি টাকা রোজগাৰও কৰতেন, দুই হাতে খৰচও কৰতেন।
সোনাদানায় কৃপোৰ বাসনে আৰ তাৰ চেয়েও দামী কাট-কাটেৱ ফুলদানি আৰ
ঝাড়লষ্ঠনে বাড়ি বোৰাই ছিল। এক-একটা বিলিতি ছবিৰই কত দাম ছিল। তাৰ
কিছুই নেই অৰশি এখন, রিটায়াৰ কৰে বাবা বিদেশ দূৰে বেৰিয়ে সব উড়িয়ে
পুড়িয়ে শ্ৰেষ্ঠ কৰে দিয়েছিলেন, শুধু মাৰ গায়েৰ গয়নাগুলো ছাড়া। তা, হাঁ, কী
যেন বলছিলাম, তয় পাৰ কী, এই দৈত্যেৰ মতো দুটো কুকুৰ ছিল যে আমাদেৱ।
সাধাদিন বাঁধা থাকত, সারা বাত ছাড়া থাকত। একটাৰ রঙ ছিল হলদে, আৰ
কালো পোড়া ইঁড়িৰ মত এই প্ৰকাণ মুখ, তাৰ নাম ছিল রোলো। ইউমাই কৰে
তেড়ে এলে তাই দেখে ভয়ে প্ৰাণ উড়ে যেত। কিন্তু আসলে কিছু বলত না। শুধু
ধাৰালো টুচলো দাঁত দিয়ে কুটকুটি কৰে জামাৰ সব বোতাম কেটে ফেলে দিত।
সে এক মজাৰ ব্যাপার ! অন্যটাৰ নাম ছিল কিম। কী সুন্দৰ সে দেখতে ছিল, সে
আৰ কী বলল। এই লম্বা চকচকে লাল লোম সারা গায়ে, মখমলেৰ মত চোখ,
ঝালৱেৰ মত ল্যাঙ। মুখে কিছু বলত না। নিঃশব্দে হুটো এসে এক লাকে টুটি
কামড়িয়ে ধৰতে চেষ্টা কৰত। বাড়িৰ লোকদেৱ কিছু বলত না। পাঁচ-সাতশো
টাকাৰ জন্য এখানে কত চুৰি-ভাকাতি খুন-খাৰাবিৰ কথা শোনা যেত, আৰ
আমাদেৱ বাড়িতে হাত বাঢ়ালৈ হাজাৰ টাকাৰ আসবাৰে হাত ঠেকে যেত, অথচ
ওই দুই কুকুৰেৰ জন্য কুটেটা কখনও চুৱি যেত না। আৱে তোৱা কী বলিস,
গোছা-গোছা জড়োয়া চুড়ি হাতে দিয়ে মাৰ সঙ্গে তোদেৱ এই বাড়িতেই চায়েৰ
নেমন্তন্ত্র খেয়ে কত বাত কৰে বাড়ি ফিৰেছি। সঙ্গে ওই দুটো কুকুৰ থাকতে শুধু
আমাদেৱ কাছাকাছি কেন, এই ফুটপাথ দিয়ে লোক চলেনি। এখানে তখন স্যার
গিৱান্তু থাকতেন। কত নাম কৱা লোকেৰ যাওয়া-আসা ছিল এ-বাড়িতে, কী সুন্দৰ
সাজানো-গোছানো ছিল। কী ভালই যে বাসতাম আমৱা ওই কুকুৰ দুটোকে—'

কানেৰ কাছে একটা ফেঁস শব্দ শুনে বনমালী চমকিয়ে উঠল। ন্যাপার চোখ
দুটো অন্নাভাবিক রকম জুলজুল কৰছে। 'যা ভাগ, তোৱা কাজকৰ্ম মেই নাকি ?'

ন্যাপা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কাৰণ অত সোনাদানা থাকা উচিত না,
কাৰণ না।'

'ন্যাপা তোৱা পায়ে পড়ি। আবাৰ কিছু পাকিয়ে বসিস না। এই সবেমাত্ৰ ছাড়া
পেয়েছিস, বুড়ো মাকে আৰ জুলাসনি বলছি, ও ন্যাপা শোন বলছি।'

কিন্তু ন্যাপা ততক্ষণে হাওয়া।

মাসিমা পুটুলি দুটোকে ততক্ষণে বেঁধে-ছেঁদে, হাতে ঝোলানো কালো
কাপড়েৰ দলিৰ মধ্যে পুৱে, ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে পড়েছেন। থলিটাকে তুলে
ধৰে বললেন, 'তোৱাই বল, কাৰ বাবাৰ সাধি বুৰাবে এই থলিৰ মধ্যে আবাৰ সাত
ৰাজাৰ ধন থাকতে পাৱে। আৰ ভয়েৰ কথা মনেও আনিস না, চলিশ বজৰ আগে

কুকুৰ দুটো মৰে গোছে, কিন্তু তয়টা আমাদেৱ তখন থেকেই ঘুচে গোছে। তবে
শৰীৱটা আজকাল বড় সহজে ঝালত হয়ে পড়ে, এই বা। কুকুৰ দুটোৰ জন্য মাৰো
মাৰো বড় মন-কেমন কৰে।'

মাসিমা চঠি পায়ে দিয়ে বিদায় নেন, দিদিমণিৰাও নিজেদেৱ মধ্যে গয়নাৰ
বিষয় বলাবলি কৰতে কৰতে উঠে পড়েন।

এতক্ষণ পৰে বনমালী টেবিল লাগায়। তাৰ মন ভাল নেই। ভয়ে থাণ উড়ে
যাবাৰ যোগাড়। রান্নাঘৰে ন্যাপা নেই। বাবাৰদাবাৰওলো উনুনেৰ পাশে গাদাগাদি
কৰে গৱামে রাখা।

কোনমতে সে সব টেবিলে পৌছে দিয়ে, বনমালী উমাদিদিকে বলল, 'আৰ
আমি পাৱছি না সিদি, বড় শৰীৱ থারাপ লাগছে।' বলে উৰ্ধশ্বাসে খড়কিদোৱেৰ
দিকে ছুটল।

বেশি দূৰে যেতে হল না। দৱজা খোলাৰ সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাপা এসে গায়েৰ
উপৰ আছড়িয়ে পড়ল। সৰ্বাঙ্গ থৰথৰ কৰে কাঁপছে, মুখে গলায় রঞ্জেৰ ছোপ, চোখ
দুটো ঠিকৰে বেৰিয়ে আসছে। ধড়াস কৰে খড়কি-দোৱ বন্ধ কৰে বনমালী বলল,
'ন্যাপা, আবাৰ কী সৰ্বনাশ কৰে এলি রে, বল শিগগিৰ ?'

দেৱালে ভৱ দিয়ে বিৰণ মুখে ন্যাপা বলল, 'মাইৱি বলছি, কাৰও অনিষ্ট
কৰিনি। আমাৰ পিছন পিছন কাউকে আসতে দেখলে দাদা ?'

'কই, না তো, কে আবাৰ আসবে ?'

রান্নাঘৰেৰ রকেৱ উপৰ বসে পড়ে ন্যাপা বলল, 'কী জানি! মনে ভাৰলাম ওৱ
গোটা দুভিন হাতিয়ে নিলেই আমাদেৱ এ-জন্যেৰ ভাৰলা-চিতা ঘুচে যাবে। মোড়েৰ
মাথায় গিয়ে ওই অক্ষকাৰ জায়গাটায় লুকিয়ে থাকি, উনি পাৰ হয়ে গোলে পৰ,
পিছন থেকে মাথায় এক বাড়ি দিয়ে—অমন কৰে তাকাছ কেন, কাউকে কোনদিন
প্রাণে মেৰেছি বলতে পাৰ ? মাৰিনি, কিছু কৰিনি। উনিও পাৰ হয়ে গোছেন, আমিও
যেই লাঠি তুলেছি, অমনি কোথা থেকে সে যে কী বিকট দুটো কুকুৰ এসে আমাকে
আক্ৰমণ কৰল সে আৰ কী বলব দাদা। এই প্ৰকাণ কালো পোড়া ইঁড়িৰ মত মুখ,
বুকেৱ উপৰ বাঘেৰ মত থাবা তুলে লাফিয়ে উঠে পট-পট কৰে জামাৰ সব কটা
বোতাম দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিল গো! অন্যটা দেখতে কী সুন্দৰ লাল লাল লম্বা
লোম, আগন্তেৰ ভাঁটাৰ মত চোখ কৰে আমাৰ গলাটা ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা কৰছিল।
ওইখানেই লাঠি ফেলে দিয়ে কোনৰকমে পালিয়ে বেঁচেছিল। উঃ। কোথেকে যে এল
বুকলাম না। তাৰপৰ দৌড়তে দৌড়তে একবাৰ ফিৱে দেৰি শৰণ সঙ্গে সঙ্গে
লাজ নাড়তে নাড়তে ঘৰেৱ দাওয়ায় গিয়ে উঠল। আশ্চৰ্যেৰ বিষয়, এত কাও ঘটে
গেল, বুড়ি একবাৰ ফিৱেও দেখল না।

বনমালীৰ হাত-পা কাঁপছিল, মুখে কথা সৱল না। কোন মতে ন্যাপাকে ধৰে
তুলল, 'ন্যাপা, প্ৰতিজ্ঞা কৰ, অমন কাজ আৰ কৰিবি নে। কী বাঁচা বেঁচেছিস রে
ন্যাপা! জানিস, আমি নিজেৰ কানে শুনলাম মাসিমা বলছেন, ওই কুকুৰ দুটো
ওনাদেৱ বড় আদৱেৰ ছিল, চলিশ বছৰ হল মৰে গোছে। ও কি, ও ন্যাপা, আবাৰ
বসে পড়লি যে !'

ভূতো সত্যজিৎ রায়

নবীনকে দ্বিতীয়বার হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। অঙ্গুরবাবুর মন ভেজানো গেল না। উত্তরপাড়ার একটা ফাংশনে নবীন পেরেছিল অঙ্গুর চৌধুরীর আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয়। তেন্ত্রিলোকুইজ্যুম। খেলার নামটা নবীনের জানা ছিল না। সেটা বলে দেয় দ্বিজপদ। দ্বিজুর বাবা অধ্যাপক, তাঁর সাইক্রোগ্রাফে নানান বিষয়ের বই। দ্বিজু নামটা বলে বানানটাও শিখিয়ে দিল। ভি-ই-এন-টি-আর-আই-এল-ও-কিউ-ইউ-আই-এস-এম। তেন্ত্রিলোকুইজ্যুম। অঙ্গুর চৌধুরী ঘষে একা মানুষ কিন্তু তিনি কথা চালিয়ে যাচ্ছেন আরেকজন অদৃশ্য মানুষের সঙ্গে। সেই মানুষ যেমন হলের সিলিং-এর কাছাকাছি কোথাও শুন্যে অবস্থান করছে। অঙ্গুরবাবু তাকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, তারপর উত্তর আসে উপর থেকে।

'হুরনাথ, কেমন আছ ?'

'আজ্জে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি।'

'হুনলাম তুমি নাকি আজকাল সংগীতচর্চা করছ ?'

'আজ্জে হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন।'

'রাগ সংগীত ?'

'আজ্জে হ্যাঁ, রাগ সংগীত।'

'গান করো ?'

'আজ্জে না।'

'যদ্ব সংগীত ?'

'আজ্জে হ্যাঁ।'

'কী যদ্ব ? সেতার ?'

'আজ্জে না।'

'সরোদ ?'

'আজ্জে না।'

'তবে কী বাজাও ?'

'আজ্জে প্রামোফোন।'

হাসি আর হাততালিতে হল মুখের হয়ে ওঠে। প্রশ্নটা উপর দিকে চেয়ে করে উত্তরটা শোনার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেঁট করে নেন অঙ্গুরবাবু, কিন্তু তিনি নিজেই যে উত্তরটা দিচ্ছেন সেটা বোঝার কেমন উপায় নেই। ঠোঁট একদম নড়ে না।

নবীন তাজ্জব বলে গিয়েছিল। এ জিনিস শিখতে না পারলে জীবনই বখ। অঙ্গুর চৌধুরী কি হাত নেবেন না ? নবীনের পড়ালেনায় আগ্রহ নেই। হাইয়ার সেকেন্ডারী পাশ করে বসে আছে বছর তিনেক। আর পড়ার ইচ্ছে হয়নি। বাপ নেই, কাকার বাড়িতেই মানুষ সে। কাকার একটা প্লাইডের কারখানা আছে; তার ইচ্ছে নবীনকে সেখানেই চুকিয়ে দেন, কিন্তু নবীনের শখ হল ম্যাজিকের দিকে। হাত সাফাই, কুমালের ম্যাজিক, আংটির ম্যাজিক, বলের ম্যাজিক—এসব সে বাড়িতেই অভ্যাস করে বেশ খালিকটা আরও করেছে। কিন্তু অঙ্গুর চৌধুরী তেন্ত্রিলোকুইজ্যুম দেখার পরে সেগুলোকে নিরামিষ বলে মনে হচ্ছে।

www.banglobookpdf.blogspot.com

ফাংশনের উদ্দোঁজদের কাছেই নবীন জানল যে অঙ্গুরবাবু থাকেন কলকাতায় আমহাটী লেনে। পরদিনই ট্রেনে চেপে কলকাতায় এসে সে সেজা চলে গেল যাকে শুরু বলে মেনে নিয়েছে তাঁর বাড়িতে। শুরু কিন্তু বাদ সাধলেন।

'কী কৰা হয় এখন ?' প্রথম প্রশ্ন করলেন তেন্ত্রিলোকুইজ্যুট। কাছ থেকে তদুলোককে দেখে হস্তক্ষেপন শুরু হয়ে গিয়েছিল নবীনের। বয়স পঁয়তালিশের বেশি নয়, ঢাঢ়া দেওয়া ঘন কালো গোফ, মাথার কালো চুলের ঠিক মধ্যখানে টেরি, তার দু'দিক দিয়ে চেউ খেলে চুল নেমে এসেছে কাঁধ পর্যন্ত। চোখ দুটো চুলচুল, ঘদিও প্রেজে এই চোখই স্পটলাইটের আলোতে বিলিক মারে।

নবীন বলল সে কী করে।

'এইসব শব্দ হয়েছে কেন ?'

নবীন সত্যি কথাটাই বলল। —'একটু-আধটু ম্যাজিকের অভ্যাস আছে, কিন্তু এটার শব্দ হয়েছে আপনার সেদিনের পারফরম্যান্স দেখে।'

অঙ্গুরবাবু মাথা নাড়লেন।

'এ জিনিস সকলের হয় না। অনেক সাধনা লাগে। আমাকেও কেউ শেখাবাবি। যদি পার তো নিজে চেঁচা করে দেখ !'

নবীন সেদিনের মত উঠে পড়ল, কিন্তু সাতদিন বাদেই আবার আমহাটী লেনে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে সে খালি তেন্ত্রিলোকুইজ্যুমের ব্যপ্তি দেখেছে। এবার দরকার হলে সে অঙ্গুরবাবুর হাতে পায়ে ধরবে।

কিন্তু এবার আরো বিপর্যয়। এলার অঙ্গুরবাবু তাকে একরকম বাড়ি থেকে বারই করে দিলেন। বললেন, 'আমি যে শেখাব না সেটা প্রথমবারেই তোমার বোঝা উচিত ছিল। সেটা বোঝানি মানে তোমার ঘটে বুকি নেই। বুদ্ধি না থাকলে কোনরকম ম্যাজিক চলে না—এ ম্যাজিক তো নয়ই।'

প্রথমবারে নবীন মুষড়ে পড়েছিল, এবারে তার মাথা গরম হয়ে গেল। চুলোয়া যাক অঙ্গুর চৌধুরী। সে যদি না শেখাব তবে নবীন নিজেই শিখবে, কুছ পরোয়া নেই।

নবীনের মধ্যে যে একটা ধৈর্য আর অধ্যবসায় ছিল সেটা সে নিজেই জানত না। কলেজ স্টীটে একটা বইয়ের দোকান থেকে তেন্ত্রিলোকুইজ্যুম সফরে একটা

বই কিনে নিয়ে সে শুরু করে দিল তার সাধন।

মোটামুটি নিয়মটা সহজ। প বর্গের অর্থাৎ প ফ ব ভ ম, কেবল এই কটা অক্ষর উচ্চারণ করার সময় ঠোট ঠোট ঠেকে, ফলে ঠোট নাড়াটা ধরা পড়ে বেশি। এই কটা অক্ষর না থাকলে যে কোন কথাই ঠোট ফাঁক করে অথচ না নাড়িয়ে বলা যায়। কোনো কথায় প বর্গের অক্ষর থাকলে সেখানেও উপায় আছে। যেমন, 'তুমি কেমন আছ' কথটা যদি 'তুঙি কেন্তন আছ' করে বলা যায়, তাহলে আর ঠোট নাড়াবার কোনো দরকারই হয় না, কেবল জিত নাড়ালেই চলে। প ফ ব ভ ম-য়ের জায়গায় ক খ গ ঘ ঙ—এই হল নিয়ম। কথোপকথন যদি হয় এই রকম—'তুমি কেমন আছ?' 'ভালো আছি', 'আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা পড়েছে, দিবি ঠাণ্ডা।'—তাহলে সেটা বলতে হবে এই ভাবে—'তুমি কেমন আছ?' 'ঘালো আছি' 'আজ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' 'তা কড়েছে, দিগ্নি ঠাণ্ডা।'

আরো আছে। উত্তরদাতার গলার আওয়াজটাকে চেপে নিজের আওয়াজের চেয়ে একটু তফাত করে নিতে হবে। এটাও সাধনার বাপার, এবং এটাতেও অনেকটা সময় দিল নবীন। কাকা এবং কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ভুলিয়ে যখন সে তারিফ পেল, তখনই বুঝল যে ভেন্টিলোকুইজম ব্যাপারটা তার মোটামুটি রঞ্জ হয়েছে।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়।

সেই অদৃশ্য উত্তরদাতার শুগ আর আজকাল নেই। আজকাল ভেন্টিলোকুইটের কোলে থাকে পুতুল। সেই পুতুলের পিছন দিয়ে হাত ঢুকিয়ে মাথা ঘোরায় এবং ঠোট নাড়ায় ঘানুকর। মনে হয় ঘানুকরের প্রশ্নের উত্তর বেরোছে এই পুতুলের মুখ দিয়েই।

তার আশ্চর্য প্রোঞ্চিসে খুশি হয়ে কাকাই এই পুতুল বানাবার খবর দিয়ে দিলেন নবীনকে। পুতুলের চেহারা কেমন হবে এই নিয়ে দিন পনের ধরে গভীর চিন্তা করে হঠাৎ এক সময় নবীনের মাথায় এল এক আশ্চর্য প্ল্যান।

পুতুল দেখতে হবে অবিকল অক্তুর চৌধুরীর মত। অর্থাৎ অক্তুর চৌধুরীকে হাতের পুতুল বানিয়ে সে তার অপমানের প্রতিশোধ নেবে।

একটা হ্যান্ডবিলে অক্তুর চৌধুরীর একটা ছবি ছিল সেটা নবীন সয়ত্রে রেখে দিয়েছিল। সেটা সে অদিনাথ কারিগরকে দেখাল।—'এইরকম গোফ, এই টেরি, এইরকম চুল্চুলু চোখ, ফোলা ফোলা গাল।' সেই পুতুল যখন মুখ নাড়বে আর ঘাড় ঘোরাবে নবীনের কোলে বসে, তখন কী রগড়টাই না হবে! আশা করি তার শো দেখতে আসবেন অক্তুর চৌধুরী!

সাতদিনের মধ্যে পুতুল তৈরি হয়ে গেল। পোশাকটা ও অক্তুর চৌধুরীর মত কালো গলাবক্ষ কোটের তলায় কোঁচা কোমরে গৌঁজা খুতি।

নেতাজী ক্লাবের শশধর বোসের সঙ্গে নবীনের আলাপ ছিল; তাদের একটা

ফাঁশনে শশধরকে ধরে তার ভেন্টিলোকুইজমের একটা আইটেম ঢুকিয়ে নিল নবীন। আর প্রথম অ্যাপিয়ারেন্সেই যাকে বলে হিট। পুতুলের একটি নামও দেওয়া হয়েছে অবশ্য—ভূতনাথ, সংক্ষেপে ভূতো। ভূতোর সঙ্গে নবীনের সংলাপ লোকের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ভূতো হল ইন্টিবেঙ্গলের সাপোর্টার, আর নবীন মোহনবাগানের। বাগ্বিতপ্তা এতই জামেছিল যে ভূতো যে ক্রমাগত ইন্টিবেঙ্গল আর জেহনবাগান বলে চলেছে সেটা কেউ লক্ষ্য করেনি।

এর পর থেকেই বিভিন্ন ফাঁশনে, টেলিভিশনে ডাক পড়তে বাগল নবীনের। নবীনও বুঝল যে ভবিষ্যৎ নিয়ে তার আর কোনো চিন্তা নেই, রঞ্জি-রোজগারের পথ সে পেয়ে গেছে।

অবশ্যে একদিন অক্তুর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হল নবীনের।

মাস তিনিক হল নবীন উত্তরপাড়া হেডে কলকাতায় মির্জাপুর স্ট্রাটে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রয়েছে। বাড়িওয়ালা সুজেশ মুৎসুন্দি বেশ লোক, নবীনের খ্যাতির কথা জেনে তাকে সমীহ করে চলেন। সম্প্রতি মহাজাতি সদনে একটা বড় ফাঁশনে নবীন এবং ভূতো প্রচুর বাহরা পেয়েছে। ফাঁশনের উদ্দেশ্যে মধ্যে আজকাল নবীনকে নিয়ে কাঢ়াকাঢ়ি পড়ে গেছে। নবীনের নিজের ব্যক্তিত্বেও সাফল্যের ছাপ পড়েছে, তার চেহারা ও কথোবার্তায় একটা মজুল জৌলুস লক্ষ করা যায়।

হয়তো মহাজাতি সদনের অনুষ্ঠানেই অক্তুরবাবু উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কাছ থেকে নবীনের ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন। সেদিনের আইটেমে নবীন আর ভূতোর মধ্যে কথাবার্তা ছিল পাতাল রেল নিয়ে। যেমন—

'কলকাতায় পাতাল রেল হচ্ছে জান তো ভূতো?'

'কই, না তো।'

'সে কি, তুমি কলকাতার মানুষ হয়ে পাতাল রেলের কথা জান না?'

ভূতো মাথা নেড়ে বলল, 'উহ, তবে হাসপাতাল রেলের কথা শুনেছি বটে।'

'হাসপাতাল রেল?'

'তাই তো শুনি। একটা বিরাট অপারেশন, সারা শহরের গায়ে ছুরি চলছে, শহরের এখন-তখন অবস্থা। হাসপাতাল ছাড়া আর কি?'

আজ নবীন তার ঘরে বসে নতুন সংলাপ লিখছিল লোড শেডিংকে কেন্দ্র করে। লোড শেডিং, জিনিসের দাম বাড়া, বাসস্ট্রামে ভিড় ইত্যাদি যে সব জিনিস নিয়ে শহরের লোক সবচেয়ে বেশি মেতে ওঠে, ভূতোর সঙ্গে সেইসব নিয়ে আগোচনা করলে দর্শক সবচেয়ে বেশি আনন্দ পায় এটা নবীন বুঝে নিয়েছে। আজকের নকশাটা ও বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। নবীন দরজা খুলে বেশ খালিকটা হকচকিয়ে দেখল অক্তুরবাবু দাঢ়িয়ে আছেন।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই !'

নবীন অঙ্গলোককে ঘরে এলে নিজের চেয়ারটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিল।

অঙ্গুরবাবু তৎক্ষণাত্ বসলেন না। তাঁর দৃষ্টি ভূতোর দিকে। সে অনড় ভাবে বসে আছে নবীনের টেবিলের এক কোণে।

অঙ্গুরবাবু এগিয়ে গিয়ে ভূতোকে ভূলে নিয়ে তার মুখটা বেশ মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। নবীনের কিছু করার নেই। সে যে খানিকটা অসোয়াত্তি বোধ করছে না সেটা বললে ভুল হবে, তবে অঙ্গুরবাবুর হাতে অপমান হবার কথাটা সে মোটেই ভোলেনি।

'তোমার হাতের পুতুল বানিয়ে দিলে আমাকে ?'

অঙ্গুরবাবু চেয়ারটায় বসলেন।

'ইঠাণ্ড এ মতি হল কেন ?'

নবীন বলল, 'কেন বানিয়েছি সেটা বোধ হয় বুবাতে পারছেন।' আমি অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিলাম আপনার কাছে। সবচুলু ভেঙে দিয়েছিলেন আপনি। তবে এটুকু বলতে পারি—আপনার এই প্রতিমূর্তি কিন্তু আজ আমাকে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আমি খেয়ে-পরে আছি এর জন্যেই।'

অঙ্গুরবাবু এখনো ভূতোর দিক থেকে চোখ সরাননি। বললেন, 'তুমি জান কি না জানি না—বারাসাতে সেদিন আমার একটা শো ছিল। টেজে নেমেই যদি চতুর্দিক থেকে 'ভূতো' 'ভূতো' বলে টিটকিরি শুনতে হয়, সেটা কি খুব সুখকর হয় বলে তুমি মনে কর ? তোমার ভাত-কাপড় আমি জোগাতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য যে আমার ভাত-কাপড়ের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তার কী হবে ? তুমি কি ভেবেছ আমি এটা এত সহজে মেলে নেব ?'

সময়টা সক্ষ্য। লোড শেডিং। টিমটিম করে দুটি মোমবাতি ঝুলছে নবীনের ঘরে। সেই আলোয় নবীন দেখল অঙ্গুরবাবুর চোখ দুটো টেজে যেমন জুলজুল করে সেই ভাবে ঝুলছে। ছোট মানুষটার বিশাল একটা দোলায়মান ছায়া পড়েছে ঘরের দেয়ালে। টেবিলের উপর চুলচুল চোখ নিয়ে বসে আছে ভূতনাথ—অনড়, নির্বাক।

'তুমি জান কি না জানি না', বললেন অঙ্গুরবাবু, 'ভেন্ট্রিলোকুইজমেই কিন্তু আমার যাদুর দোড় শেষ হয়ে যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছর বয়স থেকে আটক্রিশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশের একজন অজ্ঞাতনামা আথচ অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন যাদুকরের শিয়ত্ত করেছি। কলকাতা শহরে নয়; হিমালয়ের পাদদেশে এক অত্যন্ত দুর্গম স্থানে।'

'সে যাদু আপনি মাঝে দেখিয়েছেন কখনো ?'

'না। তা দেখাইনি কারণ সে সব টেজে দেখানোর জিনিস নয়। রোজগারের গত্তা হিসেবে আমি সে যাদু ব্যবহার করব না এ প্রতিশ্রূতি আমি দিয়েছিলাম

আমার ওপরকে। সে কখন আমি রেখেছি।'

'আপনি আমাকে কী বলতে চাইছেন সেটা ঠিক বুবাতে পারলাম না।'

'আমি শুধু সতর্ক করে দিতে এসেছি। তোমার মধ্যে সাধনার পরিচয় পেয়ে আমি খুশিটি হয়েছি। ভেন্ট্রিলোকুইজম যেমন তোমাকে আমি শেখাইনি, তেমনি আমাকেও কেউ শেখায়নি। পেশাদারী যাদুকররা তাদের আসল বিদ্যা কাউকে শেখায় না, কোনদিনই শেখায়নি। মাজিকের রাস্তা যাদুকরদের নিজেদেরই করে নিতে হয়—যেমন তুমি করে নিয়েছ। কিন্তু তোমার পুতুলের আকৃতি নির্বাচনে তুমি যে ধৃষ্টতা দেখিয়েছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। শুধু এইটুকুই বলতে এসেছি তোমাকে।'

অঙ্গুরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর ভূতনাথের দিকে চেয়ে বললেন, 'আমার চুল আর গৌফ এতদিন কাঁচা ছিল, এই সবে পাকতে শুরু করেছে। তুমি দেখছি সেটা অনুমান করে আগে থেকেই কিছু পাকা চুল লাগিয়ে রেখেছ।... যাক, আমি তাহলে আসি।'

অঙ্গুরবাবু চলে গেলেন।

নবীন দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভূতনাথের সামনে এসে দাঢ়াল। পাকা চুল। ঠিকই। দু-একটা পাকা চুল ভূতনাথের মাথায় এবং গৌফে রয়েছে বটে। এটা নবীন এতদিন লক্ষ্য করেনি। সেটাও আশ্র্য, কারণ ভূতোকে কোলে নিলে সে নবীনের খুবই কাছে এসে পড়ে, আর সব সময় তার দিকে তাকিয়েই কথাবার্তা চলে। সাদা চুলজলো আগেই চোখে পড়া উচিত ছিল।

যাই হোক, নবীন আর এই নিয়ে ভাববে না। দেখার ভুল সব মানুষেরই হয়। মুখ চোখের দিকেই বেশি দৃষ্টি দিয়েছে নবীন, চুলটা তেমন ভালো করে দেখেনি।

কিন্তু তাও মন থেকে খটকা গেল না।

ভূতোকে বইবার জন্য নবীন একটা চামড়ার কেস করে নিয়েছিল, সেই কেসে ভরে সে পরদিন হাজির হল চিপ্পুরে আদিনাথ পালের কাছে। তার সামনে কেস থেকে ভূতোকে বার করে মেরোতে রেখে নবীন বললে, 'দেখুন তো, এই পুতুলের মাথায় আর গৌফে যে সাদা চুল রয়েছে, সে কি আপনারই দেওয়া ?'

আদিনাথ পাল ভারি অরাক হয়ে বলল, 'এ আবার কী বলছেন স্যার। পাকা চুলের কথা তো আপনি বলেননি। বললে, কাঁচা পাকা মিশিয়ে দিতে তো কোনো অসুবিধে ছিল না। দু'রকম চুলই তো আছে স্টকে; যে যেমনটি চায়।'

'ভুল করে দু-একটা সাদা চুল মিশে মেতে পারে না কি ?'

'ভুল তো মানুষের হয় বটেই। তবে তেমন হলে আপনি পুতুল নেবার সময়ই বলতেন না কি ? আমার কী মনে হয় জানেন স্যার, অন্য কেউ এসে এ চুল লাগিয়ে দিয়েছে; আপনি টের পালনি।'

তাই হবে নিশ্চয়ই। নবীনের অজ্ঞাতেই ঘটনাটা ঘটেছে।

চেতলায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের ফাঁশনে একটা মজাৰ ব্যাপার হল।

ভূতোৱ জনপ্ৰিয়তাৰ এইটেই প্ৰমাণ যে ফাঁশনেৰ উদ্দেয়ানৰা তাৰ আইটেমটি বেঞ্চেছিলেন সবাৰ শেষে। লোড শৈডিং নিয়ে রসাল কথোপকথন চলেছে ভূতো আৱ নবীনে। নবীন দেখল যে ভূতোৱ উভৰে সে যে সব সময় তৈৰি কথা ব্যবহাৰ কৰছে তা নয়। তাৰ কথাৰ অনেক সময় এমন সব ইংৰিজি শব্দ চুকে পড়ছে যেওলো নবীন কথনো ব্যবহাৰ কৰে না—বড় জোৱ তাৰ মানেটা জানে। নবীনেৰ পক্ষে এ একেবাৱে বতুন অভিজ্ঞতা। অবিশ্য তাৰ জন্য শো-এৱ কোন ক্ষতি হয়নি, কাৰণ কথাগুলো খুব লাগসহ ভাবেই ব্যবহাৰ হচ্ছিল, আৱ লোকেও তাৰিফ কৰছিল খুবই। ভাগো তাৱা জানে না যে নবীনেৰ বিদ্যো হাইয়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰ্যন্ত।

কিন্তু এই ইংৰিজি কথাৰ অপ্রত্যাশিত ব্যবহাৰটা নবীনেৰ খুব ভালো লাগেনি। তাৰ সব সময়ই মনে হচ্ছিল অন্য কেউ যেন অলঙ্ঘ্য তাৰ উপৰ কৰ্তৃত কৰছে। শো-এৱ পৰ বাড়ি ফিৰে এসে ধৰে চুকে দৰজা বন্ধ কৰে দিয়ে নবীন টেবিল ল্যাম্পটা জুলিয়ে ভূতোকে রাখল বাতিৰ সামনে।

কপালেৰ তিলটা কি হিল আগে ? না। এখন রয়েছে। সেদিন তাৰ ঘৰে বসেই নবীন প্ৰথম লক্ষ্য কৰেছে অকুৱাৰুৰ কপালেৰ তিলটা। খুবই ছোট তিল, প্ৰায় চোখে পড়াৰ মত নয়। ভূতোৱ কপালেও এখন দেখা যাচ্ছে তিলটা।

আৱ সেই সঙ্গে আৱো কিছু।

আৱো খান দশেক পাকা চুল।

আৱ চোখেৰ তলায় কালি।

এই কালি আগে ছিল না।

নবীন চেয়াৰ হেডে উঠে পায়চাৰি শুক কৰে দিল। তাৰ ভাৱি অস্তিৰ লাগছে। ম্যাজিকেৰ পূজাৰী সে কিন্তু এ ম্যাজিক বড়ই অস্বত্তিকৰ। যে ম্যাজিকে সে বিশ্বাস কৰে তাৰ সবটাই মানুষেৰ কাৰসাজি। যেটা অলৌকিক, সেটা নবীনেৰ কাছে ম্যাজিক নয়। সেটা অন্য কিছু। সেটা অনুভ। ভূতোৱ এই পৱিবৰ্তনেৰ মধ্যে সেই অন্তৰে ইন্দিত রয়েছে।

অথচ একদৃষ্টে চেয়ে থেকেও ভূতোকে পুতুল ছাড়া আৱ কিছুই মনে হয় না। চোখে সেই চুলচুলু চাহনি, ঠোটেৰ কোণে অন্ত হাসি, আৱ খেলাৰ সময় তাৰ নিজেৰ হাতেৰ কাৰসাজি ছাড়া যে কোন পুতুলেৰ মতই অসাড়, নিঝীৰ।

অথচ তাৰ চেহারায় অন্ত অন্ত পৱিবৰ্তন ঘটে চলেছে।

আৱ নবীন কেন জানি বিশ্বাস কৰে এই পৱিবৰ্তনগুলো অকুৱ চৌধুৱীৰ মধ্যেও ঘটিছে। তাৱও চুলে পাক ধৰেছে, তাৱও চোখেৰ তলায় কালি পড়ছে।

ভূতোৱ সঙ্গে মাৰো মাৰো কথা বলে টেকনিকটা ঝালিয়ে মেওয়াৰ অভ্যাস নবীনেৰ প্ৰথম থেকেই। যেমন—

‘আজ দিনটা বেজায় গুমোট কৰছে, না রে ভূতো ?’

‘ইঁ, গোজায় গুঙ্গেট !’

‘তবে তোৱ সুবিধে আছে, ঘাম হয় না।’

‘কুতুলেৰ আগাৰ ঘাঙ- হাঃ হাঃ হাঃ।’

আজও প্ৰায় আপনা থেকেই নবীনেৰ মুখ থেকে পশ্চাটা বেৰিয়ে পড়ল।—

‘এসব কী ঘটছে বল তো ভূতো ?’

উত্তৰটা এল নবীনকে চমকে দিয়ে—

‘কৰ্তৃখল কৰ্তৃখল !’

কৰ্মফল।

নবীনেৰ ঠোট দিয়েই উচ্চারণটা হয়েছে যেমন হয় টেজে কিন্তু উত্তৰটা তাৰ জানা ছিল না। এটা তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে। কে বলিয়েছে সে সবক্ষে নবীনেৰ একটা ধাৰণা আছে।

সে রাত্ৰে চাকুৰ শিবুৰ অনেক অনুযোধ সত্ত্বেও নবীন কিছু খেল না। এমনিতে রাত্ৰে ওৱ শুম ভালোই হয়, কিন্তু সাবধানেৰ মাৰ বেই, তাই আজ একটা শুমেৰ বড়ি থেয়ে নিজ। একটা নাগাদ বুৰাতে পালল বড়িতে কাজ দেৰে। হাত থেকে পত্ৰিকাটা নামিয়ে রেখে হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিতেই চোখেৰ পাতা বুজে এল।

শুমটা ভেঙে গেল মাঝৱাস্তিৰে।

ঘৰে কে কাশল ?

সে নিজে কি ? কিন্তু তাৰ তো কাশি হয়নি। অথচ কিছুক্ষণ থেকেই যেন থুক থুক শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

ল্যাম্পটা ঝুলালো নবীন।

ভূতনাথ বসে আছে সেই জায়গাতেই, অনড়। তবে তাৰ দেহটা যেন একটু সামনেৰ দিকে বৌকা, আৱ ডান হাতটা ভাজ হয়ে বুকেৰ কাছে চলে এসেছে।

নবীন ধৰ্তিতে দেখল সাড়ে তিলটে। বাইৱে পাহাৱাওয়ালাৰ লাঠিৰ ঠক ঠক। দূৰে কুকুৰ ডাকছে। একটা পাঁচা কৰকশৰে ভাকতে ভাকতে উড়ে গেল তাৰ বাড়িৰ উপৰ দিয়ে। পাশেৰ বাড়িৰ কাৰুৰ কাশি হয়েছে নিশ্চয়ই। আৱ জানালা দিয়ে হাওয়া এসে ভূতোৱ শৰীৰটাকে সামলে বুকিয়ে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে কলকাতা শহৰেৰ জনবহুল মিৰ্জাপুৰ স্ট্ৰাটে তাৰ এহেন অহেতুক ভয় অত্যন্ত বিসন্দৃশ।

নবীন ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল এবং আবাৱ অলক্ষণেৰ মধ্যেই শুমিয়ে পড়ল।

প্ৰদিন কিনুলে রিক্রিয়েশন ক্লাবেৰ বাণসৱিক ফাঁশনে নবীন প্ৰথম ব্যৰ্থতাৰ আৰম্ভণ পেল।

প্ৰকাঞ্জ হলে প্ৰকাঞ্জ অনুষ্ঠান। যথাৱীতি তাৰ আইটেম হল শেষ আইটেম। আধুনিক গান, আৰণ্তি, রবীন্দ্ৰসংগীত, কথক নাচ ও তাৱপৰ নবীন মুনসীৰ গোল্ডিলোকুইজম। সকালে বাড়ি থেকে বেৰোৱাৰ আগে নিজেৰ গলার ঘৰ নেবোৱ জন্য যা কৱাৱ সবই কৰেছে নবীন। গলাটাকে পলিকার রাখা খুবই

দরকার, কারণ সুস্থিতম কঠেল না থাকলে ভেন্টিলোকুইজ্ম হয় না। চেয়ে ঢেকার আগে পর্যন্ত সে দেখেছে তার গলা ঠিক আছে। এমন কি ভূতোকে প্রথম গ্রন্থ করার সময়ও সে দেখেছে গলা দিয়ে পরিষ্কার রূপ বেরোচ্ছে। কিন্তু সর্বমাঝ হল ভূতোর উত্তরে।

এ উত্তর দর্শকের কানে পৌছাবে না কারণ সর্দি-কাশিতে রসে গেছে সে গলা। আর এটা শুধু ভূতোর গলা। নিজের গলা সাফ এবং স্পষ্ট।

'লাউডার পুরী' বলে আওয়াজ দিল পিছনের দর্শক। সামনের দর্শক অপেক্ষাকৃত ভদ্র তাই তারা আওয়াজ দিলেন না, কিন্তু নবীন জানে যে তারা ভূতোর একটা কথাও বুঝতে পারছেন না।

আরো পাঁচ মিনিট চেষ্টা করে নবীনকে মাগ চেয়ে টেজ থেকে বিদায় নিলে হল। এমন লজ্জাকর অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম।

সেদিনের পারিশ্রমিকটা নবীন নিজেই প্রত্যাহার করল। এ অবস্থায় টাকা লেওয়া যায় না। এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই চিরকাল চলতে পারে না। অন্ধদিনের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এ বিশ্বাস নবীনের আছে।

ভদ্র মাস। গ্রহণ প্রচণ্ড। তার উপরে এই অভিজ্ঞতা। নবীন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত সাড়ে এগারোটা। সে রীতিমত অসুস্থ বোধ করছে। এই প্রথম ভূতোর উপর একটু রাগ অনুভব করছে সে, যদিও সে জানে ভূতো তারই হাতের পুতুল। ভূতোর দোষ মানে তারই দোষ।

টেবিলের উপর ভূতোকে রেখে নবীন দক্ষিণের জানালাটা খুলে দিল। হাওয়া বিশেষ নেই, তবে যেটুকু আসে, কারণ আজ শনিবার, রাত বারোটার আগে পাখা চলবে না।

নবীন মোমবাতিটা জ্বলে টেবিলে রাখতেই একটা জিনিস দেখে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

ভূতোর কপালে বিলু বিলু ঘাম।

শুধু তাই না। ভূতোর গালে চকচকে ভাবটা আর নেই। ভূতো শুকিয়ে গেছে। আর ভূতোর চোখ লাল।

এই অবস্থাতেও নবীন তার পুতুলের দিকে আরো দু'পা এগিয়ে না গিয়ে পারল না। কত বিশ্রয়, কত বিভীষিকা তার কপালে আছে সেটা দেখবার জন্ম যেন তার জেন চেপে গেছে।

দু'পা-র বেশি এগোন সম্ভব হল না নবীনের। একটি জিনিস চোখে পড়ার তলা আপনিই বস্তা হয়ে গেছে।

ভূতোর গলাবক কোটের বুকের কাছটার একটা মৃদু উত্থান-পতন।

ভূতো শ্বাস নিজে।

শ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি?

হ্যাঁ, যাচ্ছে বৈ কি। ট্রাফিক-বিহীন নিষ্ঠক রাতে নবীনের ঘরে এখন একটির

বদলে দুটি মানুষের শ্বাসের শব্দ।

হয়তো চরম অতঙ্ক আর প্রচণ্ড বিদ্যম থেকেই নবীনের গলা দিয়ে একটা অস্তু শব্দ বেরিয়ে পড়ল—

'ভূতো!'

আর সেই সঙ্গে এক অশীরীর চিকিৎসা নবীনকে ছিটকে পিছিয়ে দিল তার অঙ্গপোশের দিকে—

'ভূতো নয়! আমি অক্তুর চৌধুরী!'

নবীন জানে যে সে নিজে এই কথাগুলো উচ্চারণ করেনি। কষ্টস্বর ওই পুতুলের। অক্তুর চৌধুরী কোনো এক আন্তর্য যান্তবলে ওই পুতুলকে সরব করে তুলেছেন। নবীন চেয়েছিল অক্তুর চৌধুরীকে তার হাতের পুতুল বানাতে। এ জিনিস নবীন চায়নি। এই জ্যাত পুতুলের সঙ্গে এক ঘরে থাকা নবীনের পক্ষে অসম্ভব। সে এখনই—

কী যেন একটা হল।

একটা শ্বাসের শব্দ কমে গেল কি?

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

ভূতো আর নিশ্বাস নিজে না। তার কপালে আর ঘাম নেই। তার চোখের লাল ভাবটা আর নেই, চোখের লাল আর কালি নেই।

নবীন খাট থেকে উঠে গিয়ে ভূতোকে হাতে নিল।

একটা তফাত হয়ে গেছে কেমন করে জানি এই অল্প সময়ের মধ্যেই।

ভূতোর মাথা আর ঘোরানো যাচ্ছে না, টেটো আর নাড়ানো যাচ্ছে না। যন্ত্রপাতিতে জাম ধরে গেছে। আর একটু চাপ দিলে ঘুরবে কি মাথা?

চাপ বাড়াতে গিয়ে মাথাটা আলগা হয়ে টেবিলে খুলে পড়ল।

* * *

পরদিন সকালে সিঁড়িতে নবীনের দেখা হল বাড়িওয়ালা সুরেশ মুৎসুকির সঙ্গে। ভদ্রলোক অভিযোগের সুরে বললেন, 'কই মশাই, আপনি তো আপনার পুতুলের খেলা দেখালেন না একদিনও আমাকে। সেই যে ভেন্টিকলোজিয়াম না কী!'

'পুতুল নয়,' বলল নবীন, 'এবার অন্য ম্যাজিক ধরব। আপনার যখন শব্দ আছে তখন নিশ্চয়ই দেখাৰ। কিন্তু হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন?'

'আপনার এক জাতভাই যে মারা গেছে দেখলুম কাপজে। অক্তুর চৌধুরী।'

'তাই বুবি?'—নবীন এখনো কাগজ দেখেনি।—'কিসে গেলেন?'

'হৃদরোগ', বললেন সুরেশবাবু, 'আজকাল তো শতকরা সত্ত্ব জনই যায় ওই রোগেই।'

নবীন জানে যে খোজ নিলে নির্ধার জানা যাবে মৃত্যুর টাইম হল গতকাল রাত বারোটা বেজে দশ মিনিট।

ঘাটবাবু

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত কটা বাজে তার ঠিক নেই। অনেকস্থল ধরেই বৃষ্টি পড়ছে। বাম্বামে বৃষ্টিস
শব্দ শুনতে শুনতে নেশা লেগে যায়।

বাসু হালদারের ঘূম ভেঙে যাচ্ছে বার বার। একটা অস্তি হচ্ছে কিন্তু।
দরজার বাইরে দুটো কুকুর এসে খটি-খটি হয়ে শুয়ে কুই কুই শব্দ করছে। বাসু
হালদার চেঁচিয়ে উঠলে, এই যাঃ যাঃ!

যদিও সে ভাল করে জানে, কুকুর দুটো এই সামান্য ধমক শুনে ঘোটেই যাবে
না। এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেই বা কোথায়!

বাসু হালদার জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল একবার। বৃষ্টি থামবার
কোন লক্ষণ নেই। আজ আর কেউ আসবে না মনে হয়। বাসু হালদার আজ সদের
মুখেই বাড়ি চলে যাবে ভেবেছিল। সেই সময়ই মুখিয়া ডোমস্টা এক ছিলিম গাঁজা
সেজ এনে বলেছিল, একটু পেসাদ করে দেবেন নাকি, বড়বাবু!

মুখিয়ার মুখে বড়বাবু ডাকটা বড় অধুর লাগে। এই দুনিয়ায় বাসু হালদারকে
খাতির করে না কেউ, শুধু মুখিয়াই তাকে ওই নামে ডাকে। মুখিয়াটাও যেন
কোথায় চলে গেছে। এই সময় আর এক ছিলিম গাঁজা পেলে মন হত না।

বাসু হালদার এই মফস্বল শহরের ঘাটবাবু। তার কাজ হচ্ছে, কেউ মড়া নিয়ে
এলে ডাঙারের সাটিফিকেট আছে কিনা দেখে নেওয়া আর মিউনিসিপ্যালিটির দুটি
টাকা ফি আদায় করা। www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা পা ল্যাঙ্ডা, জীবনে আর কোন চাকরি ঝুঁটিত না। অনেক বছর আগে
রসবার্জ গুহ যখন এখানকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তখন তিনি দয়া করে বাসুকে এই
কাজটা জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বাসু হালদারকে সারা দিন রাত
শুশান-ঘরের ছোট অফিস ঘরটাতেই পড়ে থাকতে হয়। একটা পেট চলে যায়।

এরকম বৃষ্টি বাদলার দিনে বাসু হালদার বাড়ি চলে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না।
কেউ এলেও তাকে বাড়ি থেকে ডেকে আনত নিজের গরজে। কিন্তু
মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান পঞ্চানন দাস সরকারের মাঝের এখন-তখন
অবস্থা। যে-কোন সময় টেসে যেতে পারে। ওরা বাড়ির মড়াকে বাসি করে না, যদি—
এই মাঝ রাতিরেও এসে হাজির হয়, আর তখন যদি বাসু হালদারকে না পায়—

বাসু হালদার একটা বিড়ি ধরাল। চেয়ার-টেবিলে বাসু শুমোলে দোষ নেই।
কিন্তু ঘূম যে আসছে না। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। ইস,
যদি মুখিয়াটাও থাকত এ সময়ে।

হঠাৎ অশ্পিটভাবে মানুষ জনের আওয়াজ শোনা গেল। বল হরি, হরি বোল-ই
হাক দিছে। তা হলে চেয়ারম্যান সাহেবের মা গত হয়েছেন। আহা, কি মাত্তভক্তি
চেয়ারম্যান সাহেবের, এই বৃষ্টির মধ্যেও পোড়াতে আনতে ভোলেনি। চিতা জুলবে
কি করে, সে খেয়াল নেই। যাই হোক, ওরা বড়লোক, বেশ খরচ-খরচা করবে মনে
হয়। বাসু হালদারের কি আর ঝিঁক ঝুঁটবে!

বাসু হালদার ঘর থেকে বেরবার আগেই কয়েকজন লোক একটা মড়ার খাটিয়া
শাড়ে করে তার ঘর ছাড়িয়ে গেল চুম্বীর দিকে।

বাসু হালদার বুদ্ধাল, এ তো চেয়ারম্যান সাহেবের মা নয়। তাহলে সঙ্গে অনেক
লোক থাকত। অনেক চ্যাচামেচি, অনেক ধূমধাম। তাহলে আর বাস্তু দেখিয়ে কি
হবে। www.banglabookpdf.blogspot.com

সে নিজের টেবিলে গাঁট হয়ে বসে থাকবে। আসুক না, ওরাই আসুক!
ঘাটবাবুর অফিসে আর কোন কর্মচারী না থাকলেও, সেই তো বড়বাবু।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, ওরা কেটে এল না। আর কোন সাড়া-শব্দও পাওয়া
গেল না। কৌতুহলে বাসু হালদার দেরিয়ে এল।

বৃষ্টি অক্ষমান্তর ধরে এসেছে। আকাশে গুঁড়ি গুঁড়ি করে পড়ছে, তবে আর
বেশিক্ষণ চলবে না বোবা যায়। কয়েকজন লোক মড়ার খাটটা এক পাশে নামিয়ে
রেখে নিজেরাই কাঠ সাজাতে শুরু করেছে।

বাসু হালদার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, কি ব্যাপার?

লোকগুলো একটু চমকে উঠল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল,
ডোম-টোম কাউকে দেখছি না, তাই আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিছি।

বাসু হালদার ভুক্ত কুঁচকে বলল, ব্যবস্থা করে নিজেছুন মানে? মড়া রেজিস্ট্রি
করতে হবে না?

—মড়া রেজিস্ট্রি? সে আবার কি?

—বাঃ, যে-কোন মড়া এনেই আপনারা পুড়িয়ে ফেলবেন। একি বেওয়ারিস
কারবার নাকি?

লোকটি এক মূহূর্ত চিন্তা করে বলল, ঠিক আছে, রেজিস্ট্রি করে নিন। কঢ়াকা
লাগবে। লোকটি জামার পকেট থেকে ফস করে দু'খানা দশ টাকার নেট বার
করে দিল। অন্য লোকগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

বাসু হালদার সবার দিকে একবার চোখ বুলোল। কেউই তার চেনা নয়।
এরকম ছোট শহরে এতগুলো অচেনা লোক!

বাসু হালদার মুখ শুরিয়ে মড়ার খাটের দিকে তাকাল। একটি মুবক্তি যেয়ের
মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে। শরীরটা একটা মোটা কম্বল দিয়ে ঢাকা।

শুশানের ঘাটবাবুর দয়া মাঝা থাকতে নেই। মড়া দেখতে দেখতে চোখ পচে
গেছে। বাসু হালদার জিজেস করল, কি হয়েছিল?

—কলেরা। হঠাৎ, মাত্ত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। —আহা!

লোকটি শুন দুখখের ভাব দেখিয়ে ফুলিয়ে উঠল। তারপর দশ টাকার নেট

দু'খানা এগিয়ে দিয়ে বললে, নিন। বৃষ্টি ধরে এসেছে, চটপট কাজ শুরু করে ফেলি।
বাসু হালদার বলল, ডোম না এলে আপনারা কি করবেন ? চিতা সাজানো বি-
সহজ কথা ?

—ও আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলব।

বাসু হালদার এবার গম্ভীরভাবে বলল, কই, দেখি ডাঙুরের সার্টিফিকেট!

যে লোকটি এগিয়ে এসে কথা বলছিল, সে একটু ফেন চমকে গেল। তারপর
অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, কিরে ডাঙুরের সার্টিফিকেটখানা কার কাছে রাখলি
?

একজন বলল, সেটা বোধ হয় ফেলে এসেছি!

বাসু হালদার কড়া হয়ে বলল, ফেলে এসেছেন ? জানেন না শুশানে মড়া নিয়ে
এলে সার্টিফিকেট আনতে হয় ? যান, এফুনি নিয়ে আসুন।

—এই বৃষ্টির মধ্যে আবার যেতে হবে ?

—নিশ্চয়ই।

—আপনি এই কুণ্ডিটা টাকা রাখুন না!

—টাকার কথা পরে। আগে সার্টিফিকেট দেখি!

আর একজন পকেটে হাত দিয়ে বলল, ও, এই তো, সার্টিফিকেট আমার
কাছেই রয়ে গেছে।

লোকটি পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে দিল, তাতে কিছু একটা লেখা
ছিল, এখন জলে ভিজে একেবারে বাপসা হয়ে গেছে।

—এটা কি ? এটা তো কিছুই পড়া যাচ্ছে না!

—জলে ভিজে গছে, কি করব।

—তা বললে তো চলবে না। কৃগী কিসে মরল, সেটা তো খাতায় লিখতে
হবে।

—বললাম তো কলেরায়।

—আপনার মুখের কথায় তো হলে না। ডাঙুরের সেখা চাই।

লোকটি এবার এগিয়ে এসে বাসু হালদারের হাতে নেট দু'খানা ওঁজে দিয়ে
বলল, কেন আর বামেলা করবেন ? খাতায় যা হোক একটা কিছু নিয়ে নিন না।

বাসু হালদার হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, ও সব চলবে না।

বাসু হালদারের মানে লেগেছে। সে এই ঘাটের বড়বাবু। তার একটা মাত্র
পেট, সে টাকা পয়সাব পরোয়া করে না। তাকে ঘৃষ দিতে আসা!

বাসু হালদার নিচু হয়ে মড়ার গা থেকে কম্বলখানা একটানে তুলে ফেলল।
তারপরই একটা আর্ত চিরকার করে ফেলল সে।

মৃত যুবতীর বুক ও সারা শরীরে জমাট বাধা রক্ত। বুক ও পেট ফালা ফালা
করে চের। কেউ যেন একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিরে কুপিরে কেটেছে।

দৃশ্যটা দেখেই বাসু হালদার অস্তুত ধরনের ভয় পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে
পড়ল। তার মানে হল, এবার ওরা তাকেও কুপিরে কুপিরে কাটবে।

একটু অপেক্ষা করে বাসু হালদার দেখল, কেউ তাকে মারছে না। তখন সে মুখ
থেকে আস্তে আস্তে হাত সরাল। তাকিয়ে দেখল, আর কেউ নেই কোথাও।
লোকগুলো দৌড়ে পালিয়েছে।

খুনের মড়া নিয়ে এসেছিল লোকগুলো। বৃষ্টির রাতে গোপনে পুড়িয়ে
ফেলার চেষ্টায় ছিল। যদি চেয়ারম্যান সাহেবের মায়ের অসুখ না করত, তাহলে
বাসু হালদার কিছু জানতেই পারত না।

দশ টাকার নেট দু'খানা পাশেই পড়ে আছে। সে দুটো যেন কাঁকড়া বিছে,
চুঁতেও ভয় করল বাসু হালদারের। তাড়াতাড়ি সে মৃতদেহটির ওপরে কম্বলটা টেনে
দিল আবার।

এর পরেই বাসু হালদারের ইচ্ছে হল দৌড়ে পালাতে।

এক ছুটে যদি সমস্ত চেনা লোকের জগৎ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া যেত।

কিন্তু এই বৃষ্টি কান্দার মধ্যে খৌড়া পারে সে কত দূরেই বা দৌড়ে যাবে।
পালাবেই বা কোথায় ?

তাছাড়া, পালাবে কেন, সে তো কোন দোষ করেনি; আর, মুগ্ধিয়াটাও যদি এই
সময় থাকত!

এখন বাসু হালদারের কর্তব্য হচ্ছে পুলিশে থবর দেওয়া। খুনের মড়া কারা
এসে ফেলে রেখে গেছে শাশানে, পুলিশই এখন এর দায়িত্ব নিক।

কিন্তু খানা এখান থেকে প্রায় তিনি মাইল দূরে। এই দুর্ঘোগের রাতে তিনি মাইল
রাস্তা সে যাবে কি করে ?

এখান থেকে আধ মাইল হেঁটে গেলে কেষপুরের মোড় থেকে রিঞ্জা পাওয়া
যায়। তবে, এত রাতে সেখানে কোন রিঞ্জাওয়ালা বসে থাকবে!

আঃ, কি যে করা যায় এখন ! ডয়-ভাবনায় বাসু হালদার ঠকঠক করে কাঁপতে
লাগল।

বাসু হালদারের ঘোর ভাঙল একটা কুকুরের কুই কুই শব্দে। কুকুরটি
মৃতদেহটির কাছে এসে পড়ে শুক্রে।

বাসু হালদার আবার ধাতঙ্গ হয়ে কুকুরটাকে তাড়া দিল, হস হস!

কুকুরটা যদি আবার মড়াটাকে টেনে নিয়ে যায়, তা হলোই কেলেক্ষারি।

কুকুরটাকে একটা চ্যালা কাঠ তুলে ছুড়ে মারতে, তবে সেটা একটু দূরে গেল।

শাশানে বাসু হালদার বহু রাত্রে একা কাটিয়েছে। কিন্তু কোনদিন তার এমন ভয়
হয়নি।

মৃতদেহটির দিকে আর একবার তাকাল। শুধু মুখখানা দেখে কিছুই বোকা যায়
না। ফুটফুটে একটি যুবতীর মুখ। যেন একবার ডাকলেই জেগে উঠবে।

এখন তো এই মড়া কেলে পুলিশ ডাকতে যাওয়ার আর প্রয়োগ ওঠে না। কুকুরে
যদি মড়া তোলে নিয়ে যায় তাহলে আবার সে কোন ফ্যাসাদে পড়বে কে জানে। যে-
লোকগুলো মৃতদেহটি এনেছিল, তারা সবাই অচেনা। বাসু হালদার পুলিশকে
তাদের হিদিশ কিছুই দিতে পারবে না। অন্য কোন জায়গা থেকে তারা এই খুনের

মাড়া নিয়ে এসেছে।

বাসু হালদার আর দাঢ়াতে পারছে না। আস্তে আস্তে বলে পড়ল মড়াটার খাটিয়ার পাশে। আবার ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ইস, ভিজে যানেই মেয়েটা। ঠিক যেন একটা জ্যান্ত মেয়ে, খুমিয়ে পড়েছে, আর বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তার মুখ।

নিজের অঙ্গাতেই বাসু হালদার হাতটা ছাড়িয়ে মেয়েটির মুখ থেকে জল মুছে দিতে গেল।

ফর্সা, সরল মুখযানা। এরকম কোন সুন্দরী যুবতীর এত কাছাকাছি কথনো বসেনি বাসু হালদার। যদি জীবিত থাকত মেয়েটি, তাহলে তার গালে এরকম হাত দিলে সে রেগে চেঁচিয়ে উঠত না?

আহা, সত্ত্বাই যদি তাই হয়। বাসু হালদারের ওপর রাগ করার জন্যই মেয়েটি যদি বেঁচে ওঠে! সে যত ইচ্ছে রাগ করুক, তবু বেঁচে উঠুক। এরকম একটা সুন্দর মেয়েকে কোন পাষণ্ড খুন করল?

বাসু হালদার মেয়েটির গালে আবার হাত রাখল। কি নরদা স্পর্শ! কতক্ষণ আগে মারা গেছে কে জানে, এত বৃষ্টিতে ভিজেছে, তবু তার গা-টা তো সে রকম ঠাণ্ডা নয়! যেন বেঁচে আছে!

বাসু হালদার মেয়েটির গালে একটা টোকা মেরে বলল, জেগে ওঠো, অনেকক্ষণ তো ঘুমোলে!

নিজেই হাসল বাসু হালদার। এ কথনো হয়! মেয়েটির শরীরে অন্ত পনের-কুড়িটা হেরার আঘাত। শুধু একে খুন করেনি, কেউ যেন প্রতিহিংসা নেবার জন্যই এর সুন্দর শরীরটা ফালা ফালা করে কেটেছে।

কিছুক্ষণ খাটিয়ার পাশে বসে থেকে বাসু হালদার মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলল। তার নিঃসন্দেহ জীবনে এই যেন একমাত্র নারী, যার গালে হাত দিলেও কোন অতিবাদ করে না।

চুমু খেলো? একে একটা চুমু খেলে কি রাগ করবে?

এই চিন্তায় বাসু হালদার এমনই উত্সা হয়ে উঠল যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। সে মুখটা এগিয়ে এলে মেয়েটির ঠাণ্ডা রক্তহীন ঠোঁটে নিজের ঠোঁট রাখল।

তখন মৃত মেয়েটি ফিসফিস করে বলে উঠল, আমার নাম অঞ্জলি সরকার। সোনাবাড়ি গ্রামের রতন নাগ আমাকে খুন করেছে। তুমি একটু দেখো—

ছিটকে খালিকটা দূরে পড়ে দিয়ে বাসু হালদার গৌ গৌ শব্দ করতে লাগল। অজ্ঞান হয়ে গেল অবিলম্বেই।

পরের দিন বাসু হালদারের জ্বান ফিরেছিল দুপুরবেলা। সে অনবরত চিৎকার করছিল, রতন নাগ, সোনাবাড়ির রতন নাগ!

পুলিশ রতন নাগকে হ্রেস্তুর করে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করবার পর বাসু হালদার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

পানিমুড়ার কবলে

সুন্দীল পঞ্জোপাধ্যায়

আমাদের বাড়ির পেছনে একটা মন্ত বড় পুকুরের ওপাশে একটু একটু জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় মুসলমানদের একটা কবরস্থান। তার পর থেকে বেশ ঘন জঙ্গল।

সে-বছর আমার বাবা কলকাতা থেকে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন আলিপুর দুয়ার। আমাদের বাড়ি পাওয়া গেল শহর ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে। বছরের মাঝখানে আমাকে চলে আসতে হলো বলে এখনকার কুলে ভর্তি হতে পারলাম না। নতুন বছরে ভর্তি হতে হবে।

তাই দুপুরবেলা আমার কিছুই করার থাকে না। বাবা অফিসে চলে যান, মা খাওয়া ওয়া করে খুমিয়ে পড়েন। আমার একদম ঘুমোতে ইচ্ছে করে না দুপুরে। একটাও নতুন গঞ্জের বই নেই, আর পড়ার বই তো বেশিক্ষণ ভালো লাগে না পড়তে। তাই আমি চুপিচুপি বাড়ির পেছনে পুকুরটার পাড়ে চলে যাই।

একা একা জঙ্গলে যেতে আমার ঠিক সাহস হয় না। এখনকার জঙ্গল বাধ আছে, কিন্তু আমার তো বন্দুক নেই। আমার তীর-ধনুক আছে অবশ্য, তা দিয়ে বাধ মারা যায় না। তবু আমি জঙ্গলের মধ্যে একটু একটু গেছি দু-একবার। কিন্তু এ কবরস্থানটার পাশ দিয়ে যেতেই বেশি গা হুমকি করে। বাবার অফিসের পিঞ্জর মুনাকার খা বলেছিল, এ কবরস্থানায় নাকি ভূত আছে।

আমি এদিক-ওদিক ভাকাই, কথনো ভূত দেখতে পাই না। কিন্তু কী রকম যেন একটা বেটুকা গুৰু পাই। আর থাকতে ইচ্ছে করে না, একস্থানে ফিরে আসি। আমার যদি আর একটা বন্দু থাকতো, তা হলে নিচয়ই আমরা দুজনে মিলে ভূত দেখার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখনে এসে এখনো যে আমার কোনো নতুন বন্দু হয়নি! একা একা ভূত দেখতে যেতে বড় খুরাপ লাগে।

আমি তাই পুকুরটার ধারে গিয়ে বসে থাকি। ছেট ছোট ইটের টুকরো বা পাথর ছুড়ে মারি জঙ্গের ঘণ্টে।

পুকুরটা বিরাট বড়, আর এখন বর্ষাকাল বলে কালায়-কালায় ভরা। দুপুরবেলা পুকুরটা দেখলে খুব গভীর মনে হয়। কোথাও কোনো লোকজন নেই, আমি শুধু এক।

এক এক সময় আমার মনে হয়, আমাকে যেন কেউ দেখছে। যদিও কোথাও আর কেউ নেই, তবু যেন মনে হয়, আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ আমাকে লাক করছে। আমি মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি, আর কাউকে দেখতে পাই না।

এই পুকুরটায় বেশ মাছ আছে। মাঝে মাঝে তারা ঘাই মারে, অমনি জলের উপর গোল গোল চেউ ওঠে। কিন্তু একদিন হঠাতে দেখলাম, পুকুরের ঠিক মাঝখানটায় জল ফুলে ফুলে উঠছে। যেন ঠিক প্রাথমিক কোনো বিরাট কিছি প্রাণী দাপাদাপি করছে। এত বড় তো মাছ হতে পারে না ! কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না।

তার পর থেকে আমি সবসময় পুকুরের মাঝখানটায় তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কিছু আর দেখা যায় না। আবার পুকুরটা শান্ত আর গভীর।

পুকুরের ঘাটটা অনেক দিনের পুরোনো। পাথর দিয়ে তৈরি, কিন্তু কয়েক জায়গায় ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা জায়গাগুলোয় গর্ত হয়ে সেখানে জল জানে থাকে, সেই জলেও ছোট ছোট মাছ দেখা যায়।

আমি ঘাটের কাছে এসে সেই মাছগুলো ধরার চেষ্টা করি। আমার তো বড়শি নেই, আর বড়শি দিয়ে আমি মাছ ধরতেও জানি না। তাই হাত দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি। এক ধরনের মাছ, জলের তলায় মাটিতে চুপচাপ শুরো থাকে। ওগুলোর নাম বেলেমাছ। সেই মাছগুলো আমাকে কাছাকাছি দেখেও ভয় পায় না। মাছগুলো অবশ্য দাকুণ চালাক। আমি আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করি, ওদের একেবারে গায়ের কাছে হাত দেবার পর সুড়ৎ করে পালিয়ে যায়। পাথরের তলার মধ্যেও অনেকবারি গর্ত আছে, সেইখানে লুকিয়ে পড়ে।

মাছ ধরার বেঁকে আমি জলের মধ্যে নেমে দাঢ়িয়েছি, এমন সময় কে যেন ডাকলো, এই বাবু!

আমি চমকে উঠলাম, সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই তো! তা হলে আমায় কে ডাকলো ? স্পষ্ট শব্দাম, অনেকটা ঠিক আমার মায়ের মতন গলা। মা তো ঘুমোছেন, তা হলে কে ডাকলো ! খুব কাছ থেকে। মা-ই কি আমাকে ডেকে চট করে কোথাও দুরিয়ে পড়লেন ?

জল থেকে উঠে এসে আমি ঘাটের চারপাশে খুঁজলাম। কেউ নেই। কাছেই একটা মন্ত কদম ফুলের গাছ, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে। তাও নেই।

অমনি আমার খুব ভয় করতে লাগলো। কেউ কোথাও নেই, তা হলে আমায় ডাকলো কে ? আমি যে স্পষ্ট শব্দেই!

দৌড়ে চলে এলাম বাড়িতে। দেওতালায় এসে দেখলাম, মা অঘোরে ঘুমোছেন। আমি তবু মাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তুমি কি এই পুকুরঘাটে গিয়েছিলে ?

মা তো খুব অবাক। বিছানার উপর উঠে বসে বললেন, কেন, পুকুরঘাটে যাবো কেন ? তুই বুবি গিয়েছিলি ?

আমি বললাম, হ্যা। আমি সেখানে খেলা করছিলাম, মনে হলো পেছন থেকে কে আমাকে ডাকলো। ঠিক তোমার মতন গলা।

মা বললেন, তুই বানিয়ে বানিয়ে এসব কথা বলছিস!

—না মা ! আমি স্পষ্ট শব্দাম।

মা রেংগে গিয়ে বললেন, তুই কেন পুকুরঘাটে গিয়েছিলি একলা একলা ? দুপুরবেলা কেউ একলা যায় ?

—কেন, কী হয় তাতে ?

—না, কফলো দুপুরে একলা জলের ধারে যেতে নেই। আর কোনোদিন যাবি না। পড়াওনো নেই ?

—পড়াওনো তো হয়ে গেছে!

—তা হলেও যাবি না। খবরদার !

মা আমাকে টেনে নিয়ে তার পাশে উইয়ে দিলেন। পুকুরঘারে যে কেউ আমার নাম ধরে ডেকেছে, মা একথা বিশ্বাসই করলেন না।

বাবার অফিসের পিওন মুনাববর থী প্রায়ই সফোবেলা আমাদের বাড়িতে আসে। কীসব অফিসের কাজ নিয়ে। মুনাববর থী খুব দাকুণ দারখণ পঞ্জি বলতে পারে। সে-ই তো আমাকে কবরখানার ভূতের তিনটে গল্প বলেছিল।

সেদিন সফোবেলা আমি মুনাববর থাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই পুকুরটার মধ্যে কত বড় মাছ আছে বলো তো ? তুমি জানো ?

মুনাববর থী জিজ্ঞেস করলো, কেন বলো তো খোকাবাবু ?

আমি বললাম, একদিন দুপুরবেলা আমি দেখেছিলাম পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ জিনিস জলের মধ্যে দাপাদাপি করছিল। সেটা যদি মাছ হয়, তা হলে নিশ্চয়ই সেটা এই ঘরের সমান হবে।

মুনাববর থী হঠাতে গভীর হয়ে গেল। তারপর বললো, খোকাবাবু, দুপুরবেলা পুকুরঘারে কফলো একলা যেও না। যেতে নেই।

—কেন, গেলে কী হয় ?

—অনেক রকম বিপদ হয়। তুমি জানো না, এইসব পুরোনো পুকুরে পানিমুড়া থাকে ?

—পানিমুড়ো কী ?

—পানিমুড়া জানো না ? পানিমুড়া হচ্ছে জলের ভূত!

—ধাৰ ! জলের মধ্যে আবার ভূত থাকে নাকি ?

—ওমা, তুমি পানিমুড়ার কথা শোনোনি, এ তো সবাই জানে ! পানিমুড়া বড়দের কিছু বলে না, কিন্তু ছেটদের জলের তলায় টেনে নিয়ে যায়।

—মোনাববর থী, তুমি পানিমুড়া দেখেছ ?

—হ্যা, তিনবার দেখেছি। তাদের মাথাটা হয় কুমিরের মতন, আর গা-টা মানুষের মতন। এইসব পুকুর জানো তো, খুব পুরোনো, আগেকার দিনের রাজাদের আমলের। এইসব পুকুরের মাঝখানে গান্ধি থাকে।

—গান্ধি কী ?

—গান্ধি মানে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গ চলে গেছে অনেক দূরে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত। যারা পানিতে ভুবে মরে, পানিমুড়া ভূত হয়ে যায়, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে

থাকে। মাকে মাবো ওপরে উঠে আসে। পানিমুড়াদের সঙ্গে আবার কবরখানার ভূতদের খুব বাগড়া। পানিমুড়ার ওপরে উঠে এলেই কবরখানার ভূতবা তাড়া করে যায়। আমি একবার দেখেছিলাম একটা পানিমুড়া আর একটা কবরখানার ভূত খুব ঘটাগতি করে লড়াই করছে।

এই সময় মা এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিসের গন্ধ হচ্ছে?

আমি বললাম, মা, তুমি পানিমুড়া ভূত দেখেছো কখনো? মুনাববর বা দেখেছে!

মা বললেন, বসে বসে খুবি ভূতের গন্ধ হচ্ছে এই সঙ্গেবেলা! মুনাববর, তুমি বাবলুকে বানিয়ে বানিয়ে শুধু গন্ধ বোলো না। ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? ভূত হচ্ছে মানুষের কল্পনা।

মুনাববর বললো, না মেমসাব, আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।

মা হেসে বললেন, হাত দেখেছো!

আমার মায়ের খুব সাহস। মা একদিন রাত্রিবেলা একা একা কবরখানায় গিয়েছিলেন ভূত দেখার জন্য। কিছু দেখতে পাননি। মাকে দেখে ভূতের ভয় পেয়েছিল। বাবা বলেছিলেন, তোমার হাতে টর্চ ছিল তো, সেই আলো দেখে ভূতের পালিয়ে গেছে। তুমি অন্দরাবে একবার গিয়ে দেখো তো!

মা বলেছিলেন, ওখানে অনেক সাপখোপ আছে। অঙ্ককারে গেলে যদি সাপে কামড়ায়? আমি ভূতের ভয় পাই না, কিন্তু সাপকে ভয় করি।

দু'তিন দিন আমি আর পুকুরধারে যাইনি। কিন্তু আমার মন ছটফট করে, দুপুরবেলা কি শয়ে থাকতে ভালো লাগে কারণ? মা ঘুমিয়ে পড়েন, আমার যে ঘুম আসে না! পড়া গল্পের বইগুলিই আরও কয়েকবার করে পড়তে লাগলাম।

তারপর আবার একদিন, মা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আবার। আজ আমার সঙ্গে একটা ছোট লাঠি। যদি ভূত-টৃত আসে তা হলে লাঠি দিয়ে মারবো।

পুকুরের কাছে এসে দেখি; ঘাটের ওপর একটা লোক বসে আছে। লোকটার গায়ে একটা লাল ঝঞ্চের ডোরাকাটা গেঁজি আর মাথায় এমন টাক যে একটা ও চুল দেই। লোকটা জলের মধ্যে পা ডুরিয়ে বসে জলে ঢেউ তুলছে। সারা গা তেজো। লোকটা এলো কোথা থেকে? আমাদের এই পুকুরে তো বাইরের কোনো লোক স্নান করতে আসে না!

আমি খুব কাছে চলে আসার পর লোকটি পেছন ফিরে তাকিয়ে আমাকে দেখেই যেন দাক্ষণ ভয় পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফ দেরে জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারপর ডুবে গেল।

আমিও খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটা আমাকে দেখে ওরকম ভয় পেল কেন? আমার হাতের লাঠিটা দেখে?

চোর-টোর নয় তো? যদি চোর হয়, লোকটা তা হলে সাঁতার কেটে পুকুরের ওপাশে উঠে জন্মল দিয়ে পালাবে।

আমি জলের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু লোকটা সেই যে ডুব দিয়েছে, আর উঠছে না। এতক্ষণ কেউ ডুব দিয়ে থাকতে পারে! আমি মনে মনে এক দৃষ্টি তিন করে পাঁচশো পর্যন্ত শুনে ফেললাম, তবু লোকটাকে আর দেখা গেল না। এই বে, লোকটা মরে গেল না তো? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে, হয়তো লোকটা সাঁতারই জানে না।

তা হলে কি এক্ষনি ছুটে গিয়ে লোকজন ডাকা উচিত? কিন্তু আমার কথা যদি কেউ বিশ্বাস না করে? আরও একটুক্ষণ দেখবার জন্য আমি জলের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তখন আমার মনে হলো, ওটা ভূত নয় তো? ও-ই কি পানিমুড়া? কিন্তু একদম মানুষের মতন দেখতে। মুনাববর বা যে বলেছিল, পানিমুড়ার মুখটা কুমিরের মতন! এ যে একদম মানুষের মতন! শুধু টাক মাথা! শুধু তাই নয়, লোকটা যখন আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিল তখন দেখেছি, ওর চোখের ওপর ভুক্তও নেই। সারা গায়ে কোনো লোমও নেই। মুনাববর নিশ্চয়ই যিথে কথা বলেছিল। সে পানিমুড়া কোনোদিন দেখেনি।

তন্মুনি ফিরে গিয়ে মাকে খবর দেবো ভাবছি, এক সময় জলের মধ্যে একটা হাত উঠু হয়ে উঠলো। শুধু একটা হাত। আমি ভাবলাম, লোকটা এবার উঠে আসবে। তা হলে পানিমুড়া নয়। কোনো চোরই নিশ্চয়ই।

শুধু হাতটাই উঠু হয়ে রইলো, আর কিছু না। লোকটার মাথা ও দেখা গেল না। তারপর মনে হলো, সেই হাতটা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই হাতে সন্তোষ আঙুল, তাতে বিছিরি নোখ। হাতটা ক্রমশ ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে।

হাতটা ঘাটের অনেক কাছে এসে আঙুল নাড়তে লাগলো। ঠিক যেন আমায় ডাকছে।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

তখন দেখলাম, জলের মধ্যে দুটো চোখ, আমার দিকে তাকিয়ে আছে একদল। চোখ দুটো মাছের মতন, পলক পড়ে না। কিন্তু মাছের নয়, চোখ দুটো সেই লোকটার। আমার একবার ইচ্ছে হলো, পালিয়ে যাই।

আবার ভাবলাম, দেখি না শেষ পর্যন্ত কী হব। আমার তো হাতে লাঠি আছে।

এবারে সেই হাতটা খুব কাছে চলে এলো। মনে হলো যেন আমার পা চেপে ধরবে। এই সময় কে যেন পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু!

কিন্তু তখন আমার পেছনে তাকাবার সময় নেই। আমি লাঠি দিয়ে খুব জোরে মারলাম সেই হাতটার ওপর। ঠিক লাগলো কি না বুবাতে পারলাম না, হাতটা জলের মধ্যে ডুবে গেল।

আবার কেউ আমার নাম ধরে ডাকলো, বাবলু!

পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম কেউ নেই। সামনে জলের ওপর সেই হাতটা

আবার উঁচু হয়ে উঠেছে।

আমি লাঠি দিয়ে যেই আবার মারতে গেলাম, অমনি সেই হাতটা লাঠিখানা চেপে ধরে একটা হ্যাচকা টান দিল, আমি বাপাং করে জলের মধ্যে পড়ে গেলাম।

জলে পড়েই মনে হলো, আমি আর বাঁচবো না। আমি যে সাতার জানি না! পানিমুড়া আমার পা ধরে সুড়ঙ্গে টেনে নিয়ে যাবে। আমি একবার চেঁচিয়ে উঠলাম, ওমা—! মা!

জলের মধ্যে আমি হাবুড়ুব খেতে লাগলাম। দম আটকে আসছে। পানিমুড়া এখনো আমার পা ধরেনি। আমি ছটফট করছি বলে খুঁজে না বোধ হয়।

এরই মধ্যে একবার কোনো রকমে জল থেকে একটু মাথা উঁচু করে দেখলাম, মাঠ দিয়ে ছুটে আসছেন আমার মা। আমি চিংকার করতে চাইলাম, মা—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরলো না। আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম। মা পাড় থেকেই এক লাফ দিয়ে জলে পড়লেন।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি আমাদের বাড়ির বাইরের ঘরে শয়ে আছি। মা আর আমাদের রোধুনি আমার গায়ে গরম জলের সেই দিছে। আমি চোখ মেলতেই মা বললেন, আমি বলেছিলাম না, ওর পেটে বেশি জল ঢেকেনি। এই তো সব ঠিক হয়ে গেছে।

মা ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে কী যে হতো, ভাবতেও আমার আজও গা কাঁপে। মা ওখানে গেছেন কী করে সেটাও একটা আচর্য ব্যাপার। পরে তখনেছি দেখখা। মা শুমিয়ে ছিলেন, এমন সময় তাঁর কানের কাছে কে যেন ডাকলো মা, মা! ঠিক আমার গলা। মা চোখ মেলে দেখলেন, কেউ নেই। তিনি বিছ্নায় উঠে বসলেন। তখন বাইরে থেকে আমার সেই মা ডাক শোনা গেল। তারপর পুরুরঘাট থেকে। www.banglabookpdf.blogspot.com

আমি জলে পড়ার সময় মা মা বলে ডেকেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এত দূর থেকে মায়ের তো সেটা তখনে পাওয়ার কথা নয়! তবু মা শুনতে পেয়েছিলেন।

মা আমার মুখের ওপর খুকে পড়ে বললেন, বাবলু, তোকে আমি একা একা পুরুর ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম, তবু গেলি কেন? কেন জলে নেমেছিলি?

আমি বললাম, মা, আমাকে পানিমুড়া টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো।

মা বললেন, বাজে কথা।

আমি বললাম, না সত্য।

মা বললেন, মোটেই না! তুই পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলি।

মা কিছুতেই পানিমুড়ার কথা বিশ্বাস করলেন না। আমাদের রোধুনি বললো, হ্যাঁ গো দিনি, এসব পুরোনো পুরুরে অনেক ভয়ের জিনিস থাকে।

মা বললেন, সাতার না জানলে লোকে জল দেখে ওরকম অনেক ভয়ের জিনিস বানায়। আমি কাল থেকেই বাবলুকে সাতার শেখাবো।

এরপর সাতদিনের মধ্যে আমি সাতার শিখে গেলাম। পানিমুড়াকে আর কথলো দেখিনি। তবে আমি সাতার কাটতে যেতাম নদীতে, এই পুরুরে আর নয়।

ভয়

হুমায়ুন আহমেদ

অদ্বোকের সঙ্গে আমার কীভাবে পরিচয় হল আগে বলে নিই। কেমিটি প্রাকটিকাল পরীক্ষার এগজামিনার হয়ে পাড়াগী ধরনের এক শহরে গিয়েছি শহর এবং কলেজের নাম বলার প্রয়োজন দেখছি না। মূল গাঁজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। নামগুলি প্রকাশ করতেও কিছু অসুবিধা আছে। এই অঞ্চলে আমি কখনো আসিনি। পরিত্যক্ত এক রাজবাড়িকে কলেজ বানানো হয়েছে। গাছগাছড়ায় চারদিক আছেন্ট। বিশাল কম্পাউন্ড। কিন্তু লোকজন নেই, পরীক্ষার জন্যে কলেজ ছুটি হয়ে গেছে। যাখী করছে চারদিক। আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। www.banglabookpdf.blogspot.com

একটা শমর ছিল যখন এগজামিনারদের আলাদা খাতিরযত্ন ছিল। কলেজের প্রিসিপাল নিজের বাসায় রাখতেন। সকাল-বিকাল নানান ধরনের খাবার। জাল ফেলে পাকা রাখ ধরা হত। যত্নের চূড়ান্ত যাকে বলে। এখন সেই দিন নেই। কেউ পাতাই দেয় না। বিরক্ত চোখে তাকায়।

আমার জায়গা হল কেমিটি স্লাবোরেটারির পাশের একটা খালি কামরায়। প্রিসিপাল সাহেবের বললেন, আপনাকে হোটেলেই রাখতে পারতাম। কিন্তু বুরাতেই পারছেন চারদিকে থাকবে ছাত্র। আপনি অস্বাস্থি বোধ করতেন। ছাত্ররা তো আর আগের মতো নেই। মদটাদ খায়। একবার বাজে যেয়ে নিয়ে এসে নানান কীভি করেছে। বিশ্বী ব্যাপার। তবে আপনার খাওয়াদাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার বাসা থেকে খাবার যাবে।

খাকার ঘর দেখে চমকে উঠলাম। আগে বোধহয় স্টোররঞ্জ ছিল। একটা মাত্র জানালা। রেলের টিকিট দেয়ার জানালার মতো ছোট। ঘরভরতি মাকড়সার ঝুল। দুটি বিশাল এবং কুর্সিত মাকড়সা পেটে ডিম নিয়ে বসে আছে। এই নিরীহ প্রাণীটিকে আমি অস্বাস্থি ভয় পাই। এদের ছায়া দেখলেও আমার গা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বাড়ুদারকে পাঁচটা টাঙ্কা দিলাম মাকড়সা। এবং মাকড়সার ঝুল পরিকার করার জন্যে। সে কী করল কে জানে ঘর যেমন ছিল তেমনি রইল। দুটির জায়গায় এখন দেখছি তিনটি মাকড়সা। তৃতীয়টির গায়ের রঙ কালো। চোখ জুলজুল করছে।

সক্রাবেলা হারিস নামের একজন লোক একটা হারিকেন জালিয়ে দিয়ে গেল। অথচ দিনের বেলায় ইলেক্ট্রিসিটি আছে দেখেছি। হারিস বলল, রাত

দশটার পর কারেন্ট আসে। আমার বিশ্বয়ের সীমা রইল না। রাত দশটার পর আমি কারেন্ট দিয়ে করব কী?

সন্ধ্যার পর এলেন কেমিস্ট্রির ডেমনেস্ট্রেটর সিরাজউদ্দিন। এর সঙ্গে আমার সকালে একবার দেখা হয়েছে। তখন বোধহয় তেলেন মনোযোগ দিয়ে দেখিনি। মুখভূতি আর্নেন্ট হেমিংওয়ের মতো চাপদাঢ়ি। মাথায় টুপি। চোখে সুরমা। গা থেকে আতরের গুঁক বেরহচ্ছে। বেঁটেখাটো একজন মানুষ। বয়স পঞ্চাশের মতো হলেও চমৎকার স্বাস্থ্য। এই গরমেও গায়ে ঘিরা রঙের একটা চাদর। তিনি কথা বলেন খুব সুন্দর করে।

'স্যার কেমন আছেন?'

'ভালই আছি।'

'আপনার খুব তকলিফ হল স্যার।'

'না, তকলিফ আর কী?'

'আগে এগজামিনার সাহেবরা এলে প্রিসিপাল সারের বাসায় থাকতেন। কিন্তু ওর এক ছেলের মাথার দেৱ আছে। প্রিসিপাল স্যার অখন আর কাউকে বাসায় রাখেন না। ছেলেটা বড় ঝামেলা করে।'

আমি বললাম, আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

সিরাজউদ্দিন সাহেব ক্ষীণকষ্টে বললেন—স্যার, ভেতরে এসে একটু বসব?

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন গুল করি।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব বসতে বসতে বললেন, এখানে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একটা ডাকনাখলো আছে। আপনাকে সেখানে রাখতে চেরেছিলাম। কিন্তু সেখানে রেভিনিউর সি.ও. তাঁর ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। কোয়ার্টারের খুব অভাব।

'বুঝতে পারছি। এই নিয়ে আপনি ভাববেন না। দিনের বেলাটা তো কলেজেই কাটবে। রাতে এসে শুধু ঘুমানো। বইপত্র নিয়ে এসেছি, সময় কাটানো কোনো সমস্যা না।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন—রাতে ঘর থেকে বেরহতে হলে একটু শব্দটুকু করে ভাবপ্র বেরবেন। খুব সাপের উপন্থু।

'তাই নাকি?'

'জি স্যার। এখন সাপের সময়। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গর্ত থেকে বের হয়। হাওয়া থার।'

আমার গা হিম হয়ে গেল। এ তো মহাযন্ত্রণা! প্রায় দুশ গজ দূরে ঝৌপ-ঝাড়ের মধ্যে বাথরুম। আমার আবার রাতে কয়েকবার বাথরুমে যেতে হয়।

'তবে স্যার ঘরের মধ্যে কোনো ভয় নেই। চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিন্ড দিয়েছি। সাপ আসবে না।'

'না এলেই ভাল।'

'যদি স্যার আপনি অনুমতি দেন পা উঠিয়ে বসি।'

'বসুন বসুন। যেভাবে আপনার আরাম হয় সেভাবেই বসুন।'

তদন্তে পা উঠিয়ে বললেন এবং একের পর এক সাপের গুঁক শুরু করলেন। সেইসব গুঁকও অতি বিচ্ছিন্ন। রাতে ঘুম ভেঙেছে, হঠাৎ তাঁর মনে হল নাভির উপর চাপ পড়ছে। চোখ মেললেন। ঘরে চাঁদের আলো। সেই আলোয় লক্ষ্য করলেন একটা সাপ কুঙলী পাকিয়ে তাঁর নাভির উপর শুয়ে ঘুমছে, আসল সাপ। শুঁরুচূড়।

একসময় আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, সাপের গুঁক আর শুলতে ইঞ্জ্য করছে না। দয়া করে অন্য গুঁক বলুন।

তদন্তে সম্ভবত সাপের গুঁক ছাড়া অন্য কোনো গুঁক জানেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুরু করলেন সাপের সঙ্গমদৃশ্যের বর্ণনা। চৈত্রমাসের এক জ্যোৎস্নায় তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। বর্ণনা শুনে আমার গা ঘিনঘিন করতে লাগল। সিরাজউদ্দিন সাহেব বললেন, সাপ যে-জাগায় এইসব করে তাঁর মাটি কবচে ভরে কোমরে রাখলে পুরুষত্ব বাড়ে।

বিজ্ঞানের একজন শিক্ষকের মুখে কী অন্তর কথা! আমি ঠাট্টা করে বললাম, আপনি সেখানকার মাটি কিছু সংগ্রহ করলেন?

তিনি আমার ঠাট্টা বুঝতে পারলেন না। সরল ভঙ্গিতে বললেন, জি না স্যার। লোকটি নির্বোধ। মানুষের সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে না। কিন্তু এই লোক উঠছে না। সাপসম্পর্কিত ধার্যায় তথ্য সে আমাকে দেবে বলে বোধহয় তৈরি হয়েই এসেছে। মৃত্তি পাবার জন্যে একসময় বলেই ফেললাম, সারা দিনের জার্নিতে টায়ার্ড হয়ে এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন বাতিটাতি লিভিংয়ে শুয়ে পড়ব।

তদন্তে অবাক হয়ে বললেন, কী বলছেন স্যার? ভাত না খেয়ে ঘুমাবেন? ভাত তো এখনও আসেনি। দেরি হবে। আমি প্রিসিপাল সাহেবের বাসা থেকে খোঁজ নিয়ে তাঁরপর আপনার কাছে এসেছি। আমি যাওয়ার পর রান্না চড়িয়েছে। গোশ্চত রান্না হচ্ছে।

'তাই নাকি?'

'জি। আপনি গুঁক খান তো?'

'জি খাই।'

'এখানে কসাইবানা নাই। মাঝে মাঝে গুঁক কাটা হয়। আজ হাটবার। তাই গুঁক কাটা হয়েছে। প্রিসিপাল সাহেব দুই ভাগ নিয়েছেন।'

'ও আছু।'

'পেচিশ টাকা করে ভাগ।'

'তাই বুঝি?'

'প্রিসিপাল স্যারের ক্ষীর রান্না খুব ভাল।'

'তাই নাকি?'

‘জি। তবে আজ রান্না করছে তাঁর ছেলের বৌ। যে-ছেলেটা পাগল—তার বৌ।’

‘ও আচ্ছা।’

‘বিবাট অশান্তি চলছে প্রিসিপাল স্যারের বাড়িতে। ছেলে বটি খিয়ে তাদের মাকে কোপ দিতে গেছে। বৌ গিয়ে মাঝখানে পড়ল। এখন ছেলেকে বেঁধে রেখেছে। এইজনেই রান্নার দেরি হচ্ছে।’

‘কোনো হোটেলে শিয়ে থেয়ে এলেই হত। এদের দুঃসময়ে....’

‘কী যে বলেন স্যার। আপনি আমাদের মেহমান না? তা ছাড়া ভদ্রলোকের খাওয়ার মতো হোটেল এই জায়গায় নাই। নিতান্তই গওহাম, হঠাত সারভিসিশন হয়ে গেল। ভাল একটা চারের দোকান পর্যন্ত নাই।’

রাত সাড়ে দশটায় খাবার এল। দুটো প্রেট, সিরাজউদ্দিন সাহেবেও আমার সঙ্গে থেতে বসেন। হাত ধূতে ধূতে বলবেন, প্রিসিপাল স্যার আমাকে আপনার সঙ্গে থেতে বলেছেন। আপনি হচ্ছেন আমাদের মেহমান। আপনি একম একা থাবেন, তা কী হয়!

প্রিসিপাল সাহেবের ছেলের বৌ অনেককিছু রান্না করেছে। অসাধারণ রান্না। সামান্য সব জিনিসও রান্নার ওপরে অপূর্ব হয়েছে। মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হতে লাগল। বেচারি হয়তো চোরের জল ফেলতে ফেলতে রেখেছে। আজ রাতে সে হয়ত কিছু খাবেও না।

‘সিরাজউদ্দিন সাহেব।’

‘জি স্যার।’

‘প্রিসিপাল সাহেবের ছেলের বৌকে বলবেন, আমি এত ভাল রান্না খুব কম থেঁয়েছি। স্ট্রোগান এবং ভাল বাঁধতে বলে আমার মনে হয় না।’

‘জি স্যার, বলব। তবে প্রিসিপাল স্যারের জ্ঞান রান্নার কাছে এ কিছুই না। আছেন তো কিছুদিন, নিজেই বুবাবেন।’

প্রিসিপাল সাহেবকে বেশ বিচক্ষণ বলে মনে হল। তিনি একটা টর্চ-লাইট পাঠিয়েছেন। ক্লাঙ্কভরতি চা পাঠিয়েছেন। পান সুপারি জর্দাও আছে কোটায়।

খাওয়াদাওয়ার পরও সিরাজউদ্দিন সাহেব অনেকক্ষণ বসে রইলেন। চা খেলেন, পান খেলেন, দীর্ঘ একটা সাগের গল্প বললেন। বিদায় নিলেন রাত এগারোটার পর। যে লোকটি ক্রমাগতই সাপের কথা বলেছে তার দেখলাম তেমন ভয়টার নেই। টর্চ বা লাঠি ছাড়াই দিব্য হনহন করে চলেছে।

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। নতুন জায়গায় চট করে ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে হালকা ধরনের কিছু বই পড়া যাব। হারিকেনের এই আলোয় সেটা সহ্য হবে না। আমি সিগারেট ধরিয়ে সুটকেস খুললাম বই বের করব। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল। প্রচণ্ড ভয় লাগল। অর্থাৎ তারের কোনোই কারণ ঘটেনি। তবু আমার হ্যাত-পা কাঁগতে লাগল। যেন বন্ধ দরজার ওপাশেই

অশৰীরী কিছু দাঢ়িয়ে আছে। যেন এম্বুনি সেই অশৰীরী অতিথি ভয়ংকর কিছু করবে। নিজের অজান্তেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে, কে? আর তখন শুল্লাম থপথপ শব্দে একজন কেউ যেন দূরে চলে যাচ্ছে। ছোট একটা কাশির শব্দও শুনলাম।

ভয়টা যেমন হঠাত এসেছিল তেমনি হঠাত চলে গেল। আমি খুবই স্বাভাবিক ভঙিতে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঢ়ালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক খৈখৈ করছে। কোথাও কেউ নেই। হঠাত এই অস্বাভাবিক ভয় আমাকে অভিভূত করল কেন? এখনও গা ঘায়ে ভেজা। ক্ষণিক লাফাচ্ছে। আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বারান্দায় দাঢ়িয়ে রইলাম। হালকা ব্যাতাস দিলে, বেশ লাগছে দাঢ়িয়ে থাকতে। লুকি পরা খালি-গায়ের একটি লোক বিড়ি টানতে টানতে আসছে। আমাকে দেখেই বিড়ি লুকিয়ে ফেলে বলল, আদাৰ স্যার।

‘আদাৰ। তুমি কে?’

‘আমার নাম কালিপদ। আমি কলেজের দারোয়ান।’

‘তুমি কিছুক্ষণ আগে কি এইখানেই ছিলে?’

‘জি স্যার। লাইব্রেরি ঘরের সামনে বসে-ছিলাম।’

‘কাউকে থেতে দেখেছে?’

‘আজে না। কেন স্যার? কি হইছে?’

‘না, এমনি।’

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইলেক্ট্রিসিটি চলে এল। আমি নিশ্চিন্ত মনে বই নিয়ে শুতে গেলাম। টিফানি কিংয়ের লেখা ভৌতিক উপন্যাস। দারুণ রূপরেখে ব্যাপার। একবার পড়তে শুরু করলে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। ভয়ভর লাগে আবার পড়তেও ইচ্ছা করে। পুরোপুরি শুনুতে গেলাম একটার দিকে। বারবার মনে হতে লাগল কিছুক্ষণ আগে এই অস্বাভাবিক ভয়টা কেন পেলাম? বাহস্যটা কী?

আমি খুব একটা সাহসী মানুষ এরকম দালি করি না। কিন্তু অকারণে এত ভয় পাবার মতো মানুষও আমি নই। একা একা বহু রাত কাটিয়েছি।

সে-রাতে আমার ভাল ঘুম হল না।

দিনের বেলাটা খুব বাস্তুতার মধ্যে কাটল। একুশভাল হেলে পরীক্ষা দেবে। জোগাড়যন্ত্র কিছুই নেই। ল্যাবরেটরির অবস্থা শোচনীয়। একটামাত্র ‘ব্যালেন্স’ তাও ঠিকমতো কাজ করছে না। থ্রয়োজনীয় কেমিক্যালসও নেই। সে নিয়ে কারও মাথাবাধাও নেই। কেমিস্ট্রির দৃজন চিচার। ওরা নির্বিকার ভঙিতে বসে আছেন। একজন আমাকে বলে গেলেন, কলেজের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ক্লাসট্রিসও তেমন হয়নি। একটু দেখেওলে নিবেন স্যার। পাশমাকটা দিয়ে দিবেন।

আমি হেসে বললাম, কী করে দেব বলুন। দেবার তো একটা পথ লাগবে। এরা তো মনে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কিছুই করেনি।

কী করে করবে বলেন। স্ট্রাইক-ফাইক লেগেই আছে। জিনিসপত্রও কিছু নেই।'

একমাত্র সিরাজউদ্দিন সাহেবকে দেখলাম বাবস্থা করার জন্য ছুটাছুটি করছেন। চেষ্টা করছেন কীভাবে ছাত্রদের খানিকটা সাহায্য করা যায়। একশজ্ঞ ছাত্রছাত্রীর কেউ তাকে এক মুহূর্তের জন্যে চোখের আড়াল করতে রাজি নয়। একটি মেয়ে সল্ট অ্যানালিসিসে কিছুই না পেয়ে তাদের স্বত্ত্বা- মতো কাঁদতে শুরু করেছে। সিরাজউদ্দিন সাহেব তাকে একটা ধরক দিলেন, খবরদার কাঁদবি না। কাঁদলে চড় যাবি। গোড়া থেকে কর। ঝাঁই টেষ্টগুলি আগে কর। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে করবি।

এগজামিনারদের একটা দায়িত্ব হচ্ছে লক্ষ রাখা যেন ছাত্ররা তাদের নিজেদের কাজগুলি নিজেরাই করে। কিন্তু সবসময় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। দেখেও না-দেখার ভান করতে হয়। এখন যেমন করছি। ছাত্রদের অনেক আমার খানিকটা মহত্ব লাগছে। যত্রপাতি নেই, কেমিক্যালস নেই, স্যারদের কোনো আঘাত নেই, ছেলেরা করবে কী?

দুপুরবেলা প্রিসিপাল স্যার দেখতে এলেন পরীক্ষা কেমন হচ্ছে। অন্দরোককে মনে হল বিপর্যস্ত। কিন্তু মুখ কুঁচকে রেখে বললেন, দেন, সবকটিকে ফেল করিয়ে দেন। বামেলা চুকে যাক।

কোনো প্রিসিপালকে এরকম কথা বলতে শুনিনি। আমি হেসে ফেললাম। প্রিসিপাল সাহেব বললেন, রাতে অসুবিধা হয়নি তো?

'জি না, হয়নি।'

'সিরাজউদ্দিনকে আপনার খোজব্বব রাখতে বলেছি। কোনোকিছুর দরকার হলেই তাকে বলবেন। সংকোচ করবেন না।'

'না, করব না।'

'সাপের গল্ল বলে মাথা খারাপ করিয়ে দেবে। পাতা দেবেন না।' এখানে সাপের উপদ্রব একেবারেই নেই।

'তাই নাকি?'

'আপনাকে ভয় খাইয়ে দিয়েছে বোধহয়? আমাকেও দিয়েছিল। প্রথম যখন আসি, এমন অবস্থা, ঘর থেকে বেরুবার আগে হারিকেন, লাঠি এইসব নিয়ে বের হতাম। হা হা হা।'

প্রিসিপাল সাহেব বেশিক্ষণ দাঢ়ালেন না। আগামীকাল সকায় চা খাবার দাওয়াত দিয়ে বাস্ত ভঙিতে চলে গেলেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হবার কথা। শেষ হল রাত নটায়। সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিধিস্ত অবস্থা। আমি হাসতে হাসতে বললাম, পরীক্ষা তো আপনার ছাত্ররা দেয়নি, দিয়েছেন আপনি। মনে হচ্ছে ভালই দিয়েছেন।

আমার সঙ্গেই তিনি ঘরে ফিরলেন। খাওয়াদাওয়া করে নিজের জায়গায়

ফিরে যাবেন। অতিরিক্ত ক্লান্ত থাকার জন্যেই বোধহয় আর সাপের গল্ল শুরু হল না। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তিনি উঠে পড়লেন।

'স্যার যাই। দরজা বন্ধ করে শয়ে পড়েন। রাতবিরাতে বেরুবার সময় একটু খেয়াল রাখবেন। শব্দ করে পা ফেলবেন। সাপেরই এখন সিজন।'

'শুব খেয়াল রাখব।'

আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসামাত্র ঠিক আগের মতো হল। তীব্র একটা ভয় আমাকে আচ্ছা করে ফেলল। খরখর করে হাত-পা কাঁপছে। নিশ্চাস নিতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্সুনি বোধহয় অজ্ঞান হয়ে যাব। দরজার কভায় টন করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ কড়া নাড়তে গিয়েও কড়া নাড়ল না। ঠিক তখন ভয়টা চলে গেল। আমি পুরোপুরি স্বাভাবিক। জগ থেকে ঢেলে এক প্লাস পানি খেলাম। গলা উঠিয়ে ডাকলাম—কালিপদ, কালিপদ! কেউ সাড়া দিল না। আজ বোধহয় ডিউটি দিচ্ছে না।

বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে এলে বসলাম। সিগারেট ধরালাম। আকাশে অন্ধ মেঘ। মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে চাঁদ চাকা পড়ে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। অপূর্ব আলোঊঁঊঁধারি। চাকা শহরে বসে এই দৃশ্য ভাবাই যায় না। তবে বড় বেশি নির্জন। বি বি ভাকছে। কিন্তু সেই বিনিবির ডাকও ম্যাজিকের মতো হঠাতে করে থেমে যাচ্ছে। সেই সময়টা বেশ অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। সবাই যেন বিরাট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করছে। বইপত্র পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল শিয়াল বোধহয় প্রহরে প্রহরে ডাকে। এই ধারণাও দেখলাম সত্য না। সামাজিকদল শিয়াল ডাকছে। সেই ডাকের মধ্যে একটা করুণ ব্যাপার আছে। ওন্তে ভাল লাগে।

ফ্লাক থেকে চা ঢেলে নিয়ে আবার এসে বসলাম বারান্দায়। আর তখন দেখলাম কালিপদ আসছে। তার হাতে একগাদা এঁটো বাসনকোসন। সম্ভবত পুরুরে ধোবে।

'এই কালিপদ!'

'আদাব স্যার।'

'একটু শুনে যাও তো!'

কালিপদ এগিয়ে এসে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হিন্দুদের প্রণামের এই ভঙিটি বেশ সুন্দর।

'রাতদুপুরে শুতে যাচ্ছ নাকি?'

'ই স্যার।'

'আচ্ছা, তুমি কি সিরাজউদ্দিন সাহেবের বাসা চেন?'

'আজে চিনি।'

'কতদুর!'

'দুই মাইলের উপরে হইব।'

'কালিপদ, তুমি একটা কাজ করতে পারবে ?'

'নিশ্চয়ই পারব স্যার, বলেন।'

'তুমি কি আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যেতে পারবে ?'

কালিপদ অবাক হয়ে বলল, এখন ?

'হ্যা, এখন। তুমি তোমার কাজ সেবে আসো, তারপর যাব।'

'আমি উনারে ডাইকা নিয়া আসি ?'

'না, ভেকে আনতে হবে না। আমিই যাব। তোমার কোনো অসুবিধা আছে ?'

'আজ্ঞে না, অসুবিধা নাই। আমি আসতাছি।'

সিরাজউদ্দিনের বাসায় যাবার ব্যাপারটা যে আমি বৌকের মাথায় করলাম তা না। আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে আমার হাঠাং তয় পাবার একটা সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কটা বের করতে না পারলে আজ রাতেও আমার ঘূম হবে না। আদিভৌতিক কোনো ব্যাপারেই আমার বিশ্বাস নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক হাড়া এ পৃথিবীতে কিছুই ঘটে না। বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তুকেই সিউটনের পতিসূত্র মানতে হয়।

ডালভাঙ্গা ক্রোশ বলে একটা কথা বইপত্রে পড়েছি। আজ রাতে সেটা বাস্তবে জানা গেল। হাঁচিছি তো হাঁচিছি। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছি, কালিপদ আর কতদুর ? সে তার উপরে ফোঁ-জাতীয় একটা শব্দ করছে। লোকটি কথা কর বলে। কথাবার্তা হ্যান্ডে-মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিংবা কে জানে এমটামের দিকে হয়তো চলতি অবস্থায় কথা কর বলার নিয়ম। তার উপর লুক্য করলাম লোকটি একটু ভীতু টাইপের, কেননা শব্দ হতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এদিকও উদ্দিক তাকাচ্ছে। আমি যখন বলছি—কী হল কালিপদ ? তখন আবার হাঁচা শুন করছে। আমি আগেও দেখেছি দারোয়ানেরা সবসময় ভীতু ধরলের হয়।

একসময় আমরা ছোটখাটো একটা নদীর ধারে চলে এলাম। বর্ষাকালে এর ঢেহারা রমরমা থাকলেও থাকতে পারে, এখন দেখাচ্ছে সরু ফিতায় মত। পায়ের পাতাও হয়তো ভিজবে না।

'কালিপদ—নদীর নাম কী ?'

'বিরুচি নদী।'

'বিরুচি ঢালের কথা শনেছি, এই নামে নদীও আছে কে জানত। নদী পার হতে হবে ?'

'আজ্ঞে না।'

'এসে পড়েছি নাকি ?'

'হ।'

সে হ বলেও থামছে না। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না কোথাও থামবে। মনে হচ্ছে এটা আমাদের অনন্ত যাত্রা। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে কথাবার্তা কি বলব কিছুই ঠিক করিনি। আগে থেকে ঠিকঠাক করে গেলে কোনো লাভ হয় না।

আসল কথা বলবার সময় ঠিক করে রাখা কথা একটাও মনে আসে না। কতবার এরকম হয়েছে। মৌবনে জরি নামের একজন কিশোরীর সঙ্গে বেশি ভাল পরিচয় ছিল। খুব সাহসী মেয়ে। সে নিজ থেকেই একবার আমাকে খবর পাঠাল আমি মেয়ে সঙ্গ্যাবেলায় তাদের ছাদে অপেক্ষা করি। সারাদিন ভাবলাম ছাদের নির্জনতায় কীসব কথা বলব। কতটুকু আবেগ থাকবে। কোন পর্যায়ে হাতে হাত রাখব। বাস্তবে তার কিছুই হল না। প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল। জরি কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, ছোটলোক। আমি কড়া গলায় বললাম, আমি ছোটলোক না, ছোটলোক হচ্ছ তুমি। শুধু তুমি একা না, তোমাদের বাড়ির সবাই ছোটলোক। এবং তোমার বড় মামা একটা ইতর। আবেগ ভালবাসার একটি কথাও দুজনের কেউ বললাম না।

'স্যার, এই বাড়ি !'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। ছোট একটা টিলের ঘর। কলাগাছ দিয়ে ঘেরা। খড়-পোড়ানো গুৰু আসছে। পরিষ্কার বকরাকে উঠান। উঠানে দাঁড়াতেই কুকুর ডাকতে লাগল। চোর ভেবেছে বোধহয়। তেতর থেকে সিরাজউদ্দিন চেঁচালেন, কে, কে ? কালিপদ বলল, দরজাটা খুলেন। আমি কালিপদ। দরজা সঙ্গে সঙ্গে খুলল না। হারিকেন ঝালানো হল। তাতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। সিরাজউদ্দিন একটি মুদি পরে খালিগায়ে বের হয়ে এলো। চোখ কপালে তুলে বললেন, স্যার আপনি ?

'দেখতে এলাম আপনাকে।'

'কেন ?'

'কোনো কারণ নেই। যুব আসছিল না, ভাবলাম দেখি রাতের বেলা গ্রাম কেমন দেখা যায়। আপনি বোধহয় তবে পড়েছিলেন ? যুবিয়ে পড়েছিলেন ?'

'জি।'

'খুব সজিত, কিছু মনে করবেন না।'

'আসেন, ভিতরে এসে বসেন।'

সিরাজউদ্দিন সাহেবের বিশ্বাস এখনও কাটেনি। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, কোনো খামেলা হয়েছে স্যার ?

'না না, খামেলা কী হবে ? নেড়াতে এসেছি। একটু অসময়ে চলে এলাম এই আর কি !'

'স্যার একটু চা করি ?'

'অসুবিধা না হলে করেন।'

'না না, কোনো অসুবিধা নাই। কোনো অসুবিধা নাই।'

সিরাজউদ্দিন সাহেব ছুটাছুটি শুরু করলেন। উঠোনে চুলা ঝালানো হল। কালিপদ দেখলাম টাকা নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। হয় চা বা চিনি নেই, আনতে গেছে। এই রাতদুপুরে কোথায় এসব পাবে কে জানে !

'সিরাজউদ্দিন সাহেব !'

'জি স্যার ?'

'লোকজন দেখছি না যে ! আপনি একাই থাকেন নাকি ?'

'বিশ্বেশাদি তো করি নাই !'

'করেননি কেন ?'

'ভাগ্যে ছিল না । কঠের সংসার ছিল । নিজেই খেতে পেতাম না ।'

'এখন তো বোধহয় অবস্থা সেরকম না ।'

'জি, এখন মাঝাআলাহ সামলে উঠেছি । কিন্তু জমিজমাও করেছি ।'

'তাই নাকি ?'

'অতি অরু । ধানী জমি ।'

'একা একা থাকেন, ভয় লাগে না ?'

'ভয় লাগবে কেন ?'

সিরাজউদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন । আমি খানিকটা অস্থি বোধ করতে লাগলাম । তায়ের ব্যাপারটা নিয়েই আমি আলাপ করতে চাই । কিন্তু কীভাবে সেটা করা যায় ? আমি ইতস্তত করে বললাম, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

জি না । এইসব হচ্ছে কুসংস্কার । এই গ্রামেই একটা রেন্ড্রি গাছ আছে । লোকে নানান কথা বলে । কী কী নাকি দেখে । আমি কোনোদিন দেখি নাই । রাতবিরাতে কত যাওয়া-আসা করেছি ।

চা তৈরি হয়েছে । চিনি ছিল না । খেজুর রসের চা । চমৎকার পারেস- পারেস গদ্দ । কাপে চুমুক দিতে দিতে সিরাজউদ্দিন বললেন, তবে জিন বলে একটা জিনিস আছে ।

আমি কৌতুহলী হয়ে বললাম, আপনি বিশ্বাস করেন ?

'করব না কেন ? কোরান শরীকে পরিষ্কার লেখা জিন এবং ইনসান । হাশেরের দিন মানুষের যেমন বিচার হবে, জিনেরও হবে ।

'আপনি জিন দেখেছেন কখনো ?'

'জি না । সাধারণ লোকে দেখে না ।'

আমি দীর্ঘনিশ্চাস ফেললাম । সিরাজউদ্দিন লোকটি আসলেই সাধারণ । কোনোরকম বিশেষত্ব নেই । আমার হঠাতে ভয়ের সঙ্গে এই লোকটিকে কিছুতেই জড়ানো যাচ্ছে না । সরাসরি এই থসঙ্গটা আনা ও মুশকিল । তবু একবার বললাম, আপনি চলে আসার পর এই বাতে কেমন যেন হঠাতে করে ভয় পাই ।

সিরাজউদ্দিন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে উঁচিপু স্বরে বললেন, সাপ জিনিসটা তো ভয়েরই । তয় পাওয়াটা ভাল । তা হলে সাবধানে ঢলাফেরা করবেন । অবসাধান হলেই সর্বনাশ । বাতে বের হলে টর্চলাইটটা সঙ্গে রাখবেন । শব্দ করে পা ফেলবেন ।

বিদায় নিতে রাত একটা বেজে গেল । সিরাজউদ্দিন আমার সমস্ত আপত্তি অগ্রহ্য করে এগিয়ে দিতে এলেন । তিনি এলেন বিরই নদী পর্যন্ত । চাঁদের আলো আছে । চারদিক স্পষ্ট দেখা যায় । তবু তিনি জোর করে কালিপদের হাতে একটা হারিকেন ধরিয়ে দিয়ে উপটা দিকে রওনা হলেন । আমি দাঢ়িয়ে পড়লাম । যতক্ষণ তাকে দেখা যায় ততক্ষণ দাঢ়িয়ে রইলাম । যেই মুহূর্তে তিনি বাশবনের আড়ালে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সেইরকম হল । অন্ধ যুক্তিহীন ভয় । যেন ভয়ংকর অস্ত একটা কিছু আমার উপর ঝাপিয়ে পড়তে চুটে আসছে । সেই অস্ত জিনিসটাকে ঢোকে দেখা যায় না । কিন্তু আমি রক্তের প্রতি কণিকায় তাকে অনুভব করছি । এর ক্ষমতা অসাধারণ । এ অন্য জগতের কেউ । এ জগতে তাকে কেউ জানে না । আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কাপিয়ে দিয়ে ভয়টা চলে গেল । কিছুটা ধাতব্দ হয়ে লক্ষ করলাম আমি মাটিতে বসে আছি । কালিপদ আমার মুখের উপর খুঁকে পড়ে বলছে, 'কী হইল স্যার ? কী হইল ?

'কিছু হয়নি । মাথাটা কেমন যেন করল ।'

'মাথা ধুইবেন স্যার ? নদীর পানি দিয়া... ।'

'মাথা ধূতে হবে না । চলো রওনা দিই ।'

বলেও রওনা দিতে পারলাম না । তয় একেবারেই নেই, কিন্তু শরীর অবসন্ন । অসম্ভব ঘূম পাচ্ছে ।

'কালিপদ !'

'জে আজ্ঞে ।'

'একটু আগে তোমার কি কোনো ভয়টয় লেগেছে ?'

'জে না ।'

'ও আজ্ঞা ! চলো আস্তে আস্তে হাঁটি ।'

কালিপদ বারবার মাথা ধুরিয়ে আমাকে দেখছে । পাগল ভাবছে কি না কে জানে ! ভাবলেও তাকে দোষ দেয়া যায় না । যে-লোক মাঝেরাজিতে বেড়াতে বের হয়, অকারণে ভয় পেয়ে আধমরা হয়ে যায়, সে আর যা-ই হোক খুব সুস্থ নয় ।

পরের দিনটা আমার খুব খারাপ কাটল । কিছুতেই মন বসাতে পারি না । ভাইভা ডক্টর হয়েছে । ছাত্রদের পাশের জ্বাবন্তিলিও ঠিকমতো শুনছি না । বি. এসসি, পরীক্ষা দিতে এসে একজন দেখি সোডিয়াম ক্লোরাইডের ফরমুলাতে দুটি ক্লোরিন অ্যাটম দেখাচ্ছে । প্রচণ্ড রাগ হবার কথা । রাগও হচ্ছে না । পাশ নাথার দিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি । কেমিট্রির হেতু বললেন, আপনার কি শরীর খারাপ ?

আমি ক্রান্ত গলায় বললাম, হ্যা, কিছুতেই মন বসছে না । খুব টায়াড লাগছে ।

'রাতে ঘূম কেমন হয়েছে ?'

'ঘূম ভালই হয়েছে ।'

'যদি হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন তা হলে এক ডোজ অশুধ দিতে পারি ।'

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, আপনি কি হোমিওপ্যাথিও করেন ?

জি। ছেটখাটো একটা ডিসপেনসারি আছে। কংগিটুগি ভালই হয়।
মফস্বল কলেজের টিচারদের এই এক জিনিস। একটিমাত্র পেশায় তাঁরা খুশি
নন। প্রত্যেকের দ্বিতীয় কোনো পেশা আছে। কোন পেশাটি প্রধান বোৰা
মুশকিল।

'কী স্বার, হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাস আছে?'

'জি না, ভূতপ্রেত এবং হোমিওপ্যাথি এই তিন জিনিস আমি বিশ্বাস করি না।
আপনি কিছু মনে করবেন না।'

ভদ্রলোক মুখ কালো করে বললেন, হোমিওপ্যাথিকে বিশ্বাস করেন না কেন?
এটা তো হাইলি সাইন্টিফিক ব্যাপার। হ্যানিম্যান সাহেবের কথাই ধরেন। উনি
লিঙ্গে একজন পাশ-করা ডাক্তার ছিলেন।

হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আমি একগাদা কথা বলতে পারতাম। টু হানড্রেড
পাওয়ারের একটি অধূধে যে আসলে কোনো অধূধই থাকে না সেটা মোলার
কলসাইন্ট্রেশন এবং অ্যাভাগেন্ড্রা নামার দিয়ে সহজেই প্রমাণ করা ষেত। তক্রে
ক্ষেত্রে সবসময় তা-ই করি। আজ ইচ্ছে করছে না। পাঁচটা বাজতেই উঠে
পড়লাম। পরীক্ষা তখনও চলছে—চলতে থাকুক। আমি বললাম, আপনারা
ভাইভা শেষ করে দিন, আমি যাবে চলে যাব।

'প্রিসিপাল সাহেবের বাসায় আপনার না চা খাওয়ার কথা?'

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়ায় মেজাজ আবও খারাপ হল। কোথাও যেতে
ইচ্ছা করছে না। তবু যেতে হবে।

প্রিসিপাল সাহেবও দাওয়াতের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আমাকে দেখে
অনেকক্ষণ অঙ্গুত চোখে তাকিয়ে থেকে বললেন, ও আজ্ঞা আজ্ঞা। আসুন আসুন।
চা থেতে বলেছিলাম, তাই না? কিছু মনে নেই। আসুন বারান্দায় বসি। নামান
বামেলায় আছি ভাই।

তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ তাঁর কোনো
সাড়া পাওয়া গেল না। দৱজা ধরে পাঁচ-হ'বছর বয়সের মিষ্টি চেহারার মেয়ে
কৌতুলী চোখে আমাকে দেখছে। এর সঙ্গে দুএকটা কথা বলা উচিত- কিন্তু
ইচ্ছা করছে না। বাড়ির ভেতর থেকে হিস্ত প্রতি গর্জনের মতো গর্জন কানে
আসছে। একটি মেয়েও কাঁদছে। কখনো কখনো কান্দা থেনে যাচ্ছে, আবার শুরু
হচ্ছে। এইরকম অবস্থায় চায়ের জন্যে অপেক্ষা করাটাও অপরাধ।

'অনেকক্ষণ বসিয়ে বাখলাম। ছেলেটা বড় বামেলা করছে। ওমেছেন
বোধহয়?'

'জি শুনেছি।'

'ভাল খবর কেউ কখনো শোনে না, কিন্তু এইসব খবর সবাই শনে ফেলে।
নিতান্ত অপরিচিত লোকও এসে গায়ে পড়ে বিচি সব চিকিৎসার কথা বলে।'

আমি চুপ করে রইলাম। প্রিসিপাল সাহেব তিঙ্গ গলায় বললেন, সেই

আতীয় চিকিৎসা এখন হচ্ছে। সাত নদীর পানিতে গোসল। ঠাণ্ডায় গোসল দিয়ে
মিউমোনিয়া বাধাবে।

'ডাক্তারি চিকিৎসা করাচ্ছেন না?'

'তাও আছে। বৈজ্ঞানিক-আবেজ্ঞানিক সবরকম চিকিৎসাই চলছে।
কোনোটাই লাগছে না।'

'অসুখটা শুরু হল কীভাবে?'

প্রিসিপাল সাহেব দীর্ঘনিশ্চাস ফেললেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে হয়তো
তাঁর ইচ্ছা করছে না। চা চলে এল। ওখু চা নয়—মিষ্টি, সিঙ্গারা, কচুরি।

'নিম, চা নিন। খিদে না থাকলে এই খাবারগুলি খাবেন না। সবই দোকানের
কেনা। এদিকে আবার খুব ডাইরিয়া হচ্ছে।'

চা-টা চমৎকার। এক চুমুক দিয়েই মাথাধরাটা অনেকখানি সেরে গেল।
প্রিসিপাল সাহেব অন্যমনক ভঙ্গিতে বললেন, কী করে অসুখটা শুরু হল সত্য
আনতে চান?

'বলতে ইচ্ছে না করলে থাক।'

'না না, তনুন। গত বৎসর গরমের সময় আমার এই ছেলে তার বউকে নিয়ে
এখানে আসে। আমি অনেক দিন থেকেই আসতে বলছিলাম, ছুটি পায় না,
আসতে পারে না। ব্যাংকের চাকরি, ছুটিছাটা কম। সাতদিনের ছুটি নিয়ে
এসেছে। আমি এখানে এসেছি দুবছর আগে। ছেলে প্রথম এল। আমরাও খুব
খুশ।'

'রাত্রিবেলা বেশ গল্পগুজাব করছি। সিরাজউদ্দিন এসেছে। সাপের গল্পটা
করছে। রাত দশটার দিকে সিরাজউদ্দিন চলে যেতেই ছেলে যেন কেমন হয়ে
গেল। খরখর করে কাঁপছে। মুখ দিয়ে কেনা ভাঙছে। কোনোমতে বলল— তার
নাকি অসুস্থির ভয় লাগছে। কিন্তু মগের মধ্যেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। হাসি-
তামাশা করতে লাগল। তখন কিন্তু বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি এ রাতেই তার
পাগলামির প্রথম শুরু।'

প্রিসিপাল সাহেব চুপ করলেন। আমি নিশ্চাস বক করে শুনছি। আমার শরীর
দিয়ে শীতল শ্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঁচ। প্রিসিপাল সাহেব
বললেন, কয়েকদিন পর আবার এরকম হল। সেও রাতের বেলা। কলেজের কিন্তু
প্রফেসরকে থেতে বলেছিলাম। তাঁরা খাওয়ানাওয়া করে চলে যাবার পর আবার
ছেলে এরকম করতে লাগল।

আমি স্কীগুরুরে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেবেরও দাওয়াত ছিল।

'হ্যাঁ ছিল। কলেজ স্টাফের স্বাইকে বলেছিলাম।'

'তারপর কী হল বলুন?'

'আব বলার কিন্তু নেই। রোজই শুরুকম হতে লাগল।'

'কখন হত?'

‘রাত দশটা সাড়ে দশটা।’

আমি কোনো কথা না বলে পরপর দুটা সিগারেট শেষ করলাম। তা খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমার চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু যেতে পারছি না। আমি নিতান্ত অগ্রাসনিকভাবে বললাম, সিরাজউদ্দিন সাহেব কি প্রায়ই আসে নাকি এখানে?

‘আসে। আমার ছেট ছেলেটাকে প্রাইভেট পড়ায়। সিনিয়ার লোক। রোজ সাতটার সময় আসে, রাত দশটা-সাড়ে দশটার আগে যায় না।’

‘আমি কি আপনার ছেলেটাকে একটু দেখতে পারি?’

তিনি বেশ অবাক হলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম। না গেলেই ভাল করবাম। সাতাশ-আটাশ বছরের একটা ছেলে। দড়ি দিয়ে বাঁধা। কী যে অসহায় লাগছে! ছেলেটি আমার দিকে কেমন অস্তুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, একে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করান।

‘চাকাতেই তো ছিল। কোনোরকম উন্নতি হয় না। ঢাকার শাস্তি। এখানে বরঞ্চ ভাল আছে। সিরাজউদ্দিনের সঙ্গে বেশ খাতির। সে এলে শাস্তি থাকে। প্রায় স্বাভাবিক আচরণ করে।’

‘তাই নাকি?’

‘জি। কয়েকদিন ধরে সিরাজ আসছে না। আপনাকে নিয়ে ব্যস্ত। তাই ছেলেটার উগ্র স্বভাব হয়ে গেছে। গত পরও বটি নিয়ে তার মাকে কাটতে গিয়েছিল।’

‘সিরাজউদ্দিন সাহেবের কথাটাখা বলে?’

‘না, কথাটাখা কিছু না। চুপচাপ থাকে, ও এলে খুশি হয় এইটা বুঝি। মুচকি মুচকি হাসে। সিরাজউদ্দিন খায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে একেবারে শাস্তি হয়ে যাব।’

আমি তাকিয়ে আছি ছেলেটির দিকে। সে গোঁফনির মতো একটা চাপা শব্দ করছে। মুখ থেকে অনবরত লালা বেরহচ্ছে। মুখ উষ্ণ হ্যাঁ হয়ে আছে। একট আগেই তাকে অসহায় লাগছিল, এখন সেরকম লাগছে না। বরং কেমন যেন ভয়ংকর লাগছে।

আমি ঘর থেকে বেরহচ্ছে বেরহচ্ছে বললাম, প্রিসিপ্যাল সাহেব, আমাকে আজ রাতেই ঢাকা চলে যেতে হচ্ছে।

‘কী বললেন?’

‘আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না। কেন পারছি না সেই কারণও আপনার কাছে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। কোনোদিন পারব বলেও মনে হয় না।’

‘আমি আপনার কথা কিছুতে বুঝতে পারছি না।’

‘আপনি পরীক্ষা কয়েকদিন পিছিয়ে দিন। নতুন এগজামিনাল এসে বাকিট।

শেষ করবে।’

‘অসম্ভব কথা আপনি বলছেন।’

‘তা বলছি। কিন্তু আমাকে যেতেই হবে।’

সেই রাতেই আমি ঢাকা চলে আসি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাটি শৃতি থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলি। নিজেকে বোঝাই যে সমন্তটাই ছিল উন্নত মন্তিকের কল্পনা। আমে নিজস্বভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

এই ঘটনার প্রায় চার বছর পর সিরাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনি বায়তুল মোকাবরমের ফুটপাত থেকে উপেন সোয়েটার কিনছিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পেয়ে হাসিয়ে এগিয়ে এলেন।

‘স্যার, আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি সিরাজ।’

‘চিনতে পেরেছি।’

‘এ বার স্যার কাউকে কিছু না বলে হট করে চলে এলেন। পরীক্ষা এক মাস পিছিয়ে গেল। কী দুর্দশা ছাত্রদের! গরিবের ছেলেপুলে।’

আমি কঠিন স্বরে বললাম, আপনারা সবাই ভাল তো।

‘জি ভাল।’

‘প্রিসিপাল সাহেব, উনি ভাল আছেন?’

‘উনার খবরটা জ্ঞানি না। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর চাকরি হেতে দিয়ে জামালপুর চলে গেলেন।’

‘ছেলেটা মারা গেছে বুঝি?’

জি, বড়ই দুঃখের কথা। পাগল মানুষ বাড়ি থেকে বের হয়ে কোথায় চলে গেল! নানান জায়গায় খোজাখুজি। তিনদিন পর নদীতে লাশ ভেসে উঠেছে। আমিই খুঁজে পাই। আমার বাড়ির পাশের ঘাটে গিয়ে লেগেছিল।’

‘তাই বুঝি?’

‘জি স্যার। খুবই আফসোসের কথা।’

‘এখন কি নতুন প্রিসিপাল এসেছেন?’

‘জি, খুবই ভাল লোক। প্রায়ই যাই উনার বাসায়। আমাকে খুব আদর করেন। উনার সঙ্গে গল্পওজন করি।’

‘খুবই ভাল কথা।’

‘তবে স্যার অস্তুত ব্যাপার কী জানেন? প্রিসিপাল সাহেবের জ্ঞানো মাঝে বিনা কারণে ভর পেয়ে চিংকার চ্যাচামেচি করেন। অবিকল আগের প্রিসিপাল সাহেবের ছেলের মতো অবস্থা। মনে হয় বাড়িটার একটা দোষ আছে।’

আমি কঠিন চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সিরাজউদ্দিন বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বড় ভাল লাগছে স্যার। আপনার কথা আমার প্রায়ই মনে হয়।

সিরাজউদ্দিন হাসল। তার হাসিতে শিখর সারল্য। চোখ দুটি মগ্নতায় অর্দ্ধ।

আয়না

বুমারুন আহমেদ

সকাল সাড়ে সাতটা। শওকত সাহেব বারান্দায় উপু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা মোড়া, মোড়ায় পানিভর্তি একটা ষষ্ঠ। পানির মধ্যে হেলান দেয়া হোট একটা আয়না। আয়নাটার স্ট্যান্ড ভেঙে গেছে বলে কিছু একটাতে ঢেকা না দিয়ে তাকে দাঁড় করানো যায় না। শওকত সাহেব মুখভর্তি ফেনা নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে আছেন। দাঢ়ি শেভ করবেন। প্যাতান্ত্রিশ বছরের পর মুখের দাঢ়ি শক্ত হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই রেজারের একটানে দাঢ়ি কাটা যায় না। মুখে সাধান মেঝে অপেক্ষণ করতে হয়। একসময় দাঢ়ি নরম হবে, তখন কাটতে সুবিধা।

দাঢ়ি নরম হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার পর শওকত সাহেব রেজার দিয়ে একটা টান দিতেই তাঁর গাল কেটে গেল। রগ-টগ মনে হয় কেটেছে, গলগল করে রঞ্জ বের হচ্ছে। শওকত সাহেব এক হাতে গাল চেপে বসে আছেন। কিছুক্ষণ চেপে ধরে থাকলে রঞ্জ পড়া বন্ধ হুবে। ঘরে স্যান্ডল-ট্যাভলন কিছু আছে কি না কে জানে। কাউকে ডেকে জিজেস করতে ইচ্ছা করছে না। সকাল বেলার সময়টা হল ব্যস্ততার সময়। সবাই কাজ নিয়ে থাকে। কী দরকার বিরক্ত করে?

এই এক মাসে চারবার গাল কাটল। আয়নাটাই সমস্যা করছে। পুরাণো আয়না, পারা নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। একটা ছেটি আয়না কেনার কথা তিনি তাঁর স্ত্রী মনোয়ারাকে কথেকবার বলেছেন। মনোয়ারা এখনও কিনে উঠতে পারেনি। তাঁর বোধহয় মনে থাকে না, মনে থাকার কথাও না। আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করেন। বাসার সবাই ড্রেসিং টেবিলের বড় আয়নাটা শওকত সাহেব একাই ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা আয়না ব্যবহার করে। কাজেই হাত-আয়নাটার যে পারা উঠে গেছে মনোয়ারার তা আয়না কথা না। আর জানলেও কি সবসময় সব কথা মনে থাকে?

শওকত সাহেব নিজেই কতবার ভেবেছেন অফিস থেকে ফেরার পথে একটা আয়না কিনে নেবেন। অফিস থেকে তো রোজই ফিরছেন, কই, আয়না তো কেনা হচ্ছে না! আয়না কেনার কথা মনেই পড়ছে না। মনে পাড় ওধু দাঢ়ি শেভ করার সময়।

www.banglabookpdf.blogspot.com

শোবার ঘর থেকে শওকত সাহেবের বড় মেঝে ইরা বের হল। সে এ-বছর ইউনিভার্সিটিতে চুক্তেছে। সেজন্যেই সবসময় একধরনের ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। শওকত সাহেব বললেন, মা, ঘরে স্যান্ডল আছে।

ইরা বলল, জানি না বাবা।

সে যেকোন ব্যস্তভাবে বারান্দায় এসেছিল সেরকম ব্যস্ত ভঙ্গিতেই আবার ধরে চুক্তে গেল। বাবার দিকে ভালমত তাকালও না। তাঁর এত সময় নেই।

রঞ্জ পড়া বন্ধ হয়েছে কি না এটা দেখার জন্যে শওকত সাহেব গাল থেকে

হাত সরিয়ে আয়নার দিকে তাকালেন। আশ্চর্য কাঙ। আয়নাতে দেখা যাচ্ছে ছেটি একটা মেঝে বসে আছে। আগ্রহ নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। মেঝেটার গায়ে লাল ফুল ওকা সুতির একটা ফুক। খালি পা। মাথার চুল বেগি-করা। দুদিকে দুটা বেগি ঝুলছে। দুটা বেগিতে দু'বঙ্গের ফিতা। একটা লাল একটা শাদা। মেঝেটার মুখ গোল, চোখ দুটা বিষণ্ণ। মেঝেটা কে?

শওকত সাহেব ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। তাঁর ধারণা হল, হয়ত ট্রিকটাক কাজের জন্যে বাচ্চা একটা কাজের মেঝে রাখা হয়েছে। সে বারান্দায় তাঁর পেছনে বসে আছে তিনি একদম লক্ষ্য করেননি।

বারান্দায় তাঁর পেছনে কেউ নেই। পুরো বারান্দা ফাঁকা, তা হলে আয়নায় মেঝেটা এল কোথোকে? শওকত সাহেব আবার আয়নার দিকে তাকালেন, এই তো মেঝেটা বসে আছে, তাঁর রোগা-রোগা ফরসা পা দেখা যাচ্ছে। পিটাপিট করে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ব্যাপারটা কী?

মেঝেটা একটু ঘেন ঝুকে এল। শওকত সাহেবকে অবাক করে দিয়ে মিটি গলায় বলল, আপনার গাল কেটে পেছে। রক্ত পড়ছে।

শওকত সাহেব আবারও ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালেন। না, কেউ নেই। তাঁর কি মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একমাত্র পাগলরাই উন্ট এবং বিচিত্র ব্যাপার-ট্যাপার দেখতে পার। এই ব্যাসে পাগল হয়ে গেলে তো সমস্যা। চাকরি চলে যাবে। সংসার চলবে কীভাবে? শওকত সাহেব আয়নার দিকে তাকালেন না। আয়না-হাতে ঘরে চুক্তে পেছেন। নিজের শোবার ঘরের টেবিলে আয়নাটা উলটো করে রেখে দিলেন। একবার ভাবলেন, ঘটনাটা তাঁর স্ত্রীকে বলবেন, তাঁর পরই মনে হল—কী দরকার! সবকিছুই সবাইকে বলে বেড়াতে হবে, তা তো না। তা ছাড়া তিনি খুবই ব্যলভায়ী, কারো সঙ্গেই তাঁর কথা বলতে ভাল লাগে না। অফিসে যতক্ষণ থাকেন নিজের মনে থাকতে হেঁটে করেন। সেটা সত্ত্ব হয় না। অকারণে নালান কথা বলতে হয়। যত না কাজের কথা—তাঁরচে বেশি অকাজের কথা। অফিসের লোকজন অকাজের কথা বলতেই বেশি পছন্দ করে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

শওকত সাহেব ইষ্টার্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকের ব্যাশ্যার। ক্যাশের হিসাব ঠিক রাখা, দিলের শেষে জমা-ব্যাচ হিসাব মেলানোর কাজটা আস্তান্ত জটিল। এই জটিল কাজটা করতে গেলে মাথা খুল ঠাণ্ডা থাকা দরকার। অকারণে রাজের কথা বললে মাথা ঠাণ্ডা থাকে না। কেউ সেটা বোবে না। সবাই প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর সঙ্গে কিছু খাজুরে আলাপ করবেই।

‘কী শওকত সাহেব, মুখ্যটা এমন করলা কেন? ভাবিব সঙ্গে ফাইট চলছে নাকি?’

‘আজকের শাটটা তো ভাল পরেছেন। ব্যাস মনে হচ্ছে দশ বছর করে গেছে। রাতে আছেন সেখি।’

‘শওকত ভাই, দেখি চা খাওয়ান। আপনার স্বত্ত্ব কাউটা ধরলের হয়ে গেছে। চা-টা কিছুই খাওয়ান না। আজ ছাড়াছাড়ি নাই।’

এইসব অকারণ অথবান কথা শুনতে শওকত সাহেব ব্যাংকের হিসাব

মেলান। মাঝে মাঝে হিসাবে গুরুগোল হয়ে যায়। তাঁর প্রচও রাগ লাগে। পুরো হিসাবে আবার গোড়া থেকে করতে হয়। মনের রাগ তিনি প্রকাশ করেন না। রাগ চাপা রেখে মুখ হাসিহাসি করে রাখার ক্ষমতা তাঁর আছে। মনের রাগ চেপে রেখে অপেক্ষা করেন কখন সামনে বসে থাকা মানুষটা বিদেয় হবে, তিনি তাঁর হিসাব আবার গোড়া থেকে করতে শুরু করবেন। শুরুই সমসার ব্যাপার। তবে মাস্থানিক হল শওকত সাহেবের আরও বড় ধরনের সমস্যায় পড়েছেন। ব্যাংকে কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন থেকে হিসাবপত্র সব হবে কম্পিউটারে। চ্যাঙ্ডা একটা ছেলে, নাম সাজেদুল করিম, সবাইকে কম্পিউটার ব্যবহার করা শেখাচ্ছে। সবাই শিখে গেছে, শওকত সাহেব কিছু শিখতে পারেননি।

যন্ত্রপাতির ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময়ই অতি জটিল মনে হয়। সামান্য ক্যালকুলেটারও তিনি কখনো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারেন না। একটা বেড়াহেড়া হয়ে যায়। তা ছাড়া যন্ত্রের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই। তিনি যত দায়িত্বের সঙে একটা যোগ করবেন যন্ত্র কি তা করবে? কেনই—বা করবে? ভুল-ভাস্তি করলে বড় সাহেবদের গালি থাবেন, তাঁর চাকরি চলে যাবে। যন্ত্রের তো সেই সমস্যা নেই। যন্ত্রকে কেউ গালিও দেবে না বা তাঁর চাকরিও চলে যাবে না। তাঁর পরেও কেন মানুষ এত যন্ত্র-বন্ধ করে? কম্পিউটারের তাঁর কাছে অসহ্য লাগছে। অনেকটা টেলিভিশনের মতো একটা জিনিশ। হিসাবনিকাশ সব পর্দায় উঠে আসছে। এমনিতেই টেলিভিশন তাঁর ভাল লাগে না। বাসায় তিনি কখনো টিভি দেখেন না। যে যেটা অপছন্দ করে তাঁর কপালে সেটাই জোটে, এটা বোধহয় সত্য। তিনি টিভি পছন্দ করেন না। এখন টিভির মতো একটা জিনিশ সবসময় তাঁর টেবিলে থাকবে, অফিসে যতক্ষণ থাকবেন তাঁকে তাকিয়ে থাকতে হবে টিভির পর্দার দিকে, যে—পর্দায় গান্ধাজনা হবে না, শুধু হিসাবনিকাশ হবে। কোন মানে হয়?

অফিস শুরু হয় নটার সময়। শওকত সাহেব নটা বাজার ঠিক দশ মিনিট আগেই অফিসে ঢোকেন। তাঁর টেবিলে পিরিচে ঢাকা এক গ্লাস পানি থাকে। তিনি পানিটা খান। তাঁরপর তিনবার কুল ত আল্টা পড়ে কাজকর্ম শুরু করেন। এটা তাঁর নিয়ন্ত্রিতকার রুটিন। আজ অফিসে এসে দেখেন কম্পিউটারের চেংড়া ছেলেটা, সাজেদুল করিম, তাঁর টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে শুরু কুঁচকে সিগারেট টানছে। পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাসটা খালি। সাজেদুল করিম থেঁরে ফেলেছে নিচয়ে। সাজেদুল করিম শওকত সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, স্যার, কেমন আছেন?

‘ভাল আছি।’

‘আজ আপনার জন্যে সকাল সকাল চলে এসেছি।’

‘ও, আচ্ছা।’

‘জিএম সাহেব খুব রাগারাগি করছিলেন। —আপনাকে কম্পিউটার শেখাতে পারছি না। আজ ঠিক করেছি সারাদিন আপনার সঙ্গেই থাকব।’

শওকত সাহেব শুকনো মুখে বললেন, আচ্ছা।

‘আমরা চা খাই, চা খেয়ে শুরু করি। কী বলেন স্যার?’

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। বেল টিপে বেয়ারাকে চা দিতে বললেন। সাজেদুল করিম হাসিহাসি মুখে বলল, গতকাল যা যা বলেছিলাম সেসব কি স্যার আপনার মনে আছে?

শওকত সাহেবের কিছুই মনে নেই, তবু তিনি হ্যাস্তক মাথা নাড়লেন।

‘একটা ছেটখাটে ভাইবা হয়ে যাক। স্যার বলুন দেখি, মেগাবাইট ব্যাপারটা কি?’

‘মনে নাই।’

‘র্যাম কী সেটা মনে আছে?’

‘না।’

‘মনে না থাকলে নাই। এটা এমনকিছু জরুরি ব্যাপার না। ম্যাগাবাইট, র্যাম সবই হচ্ছে কম্পিউটারের মেমরির একটা হিসাব। একেক জন মানুষের যেমন একেক রকম শৃতিশক্তি থাকে, কম্পিউটারেও তাই। কিছু—কিছু কম্পিউটারের শৃতিশক্তি থাকে অসাধারণ, আবার কিছু—কিছু কম্পিউটারের শৃতিশক্তি সাধারণ মানের। মেগাবাইট হচ্ছে শৃতিশক্তির একটা হিসাব। মেটা হল টেন টু দ্যা পাওয়ার সিঙ্ক আর বাইট হল টেন টু স্যা পাওয়ার সিঙ্ক ভাগের এক ভাগ। র্যাম হচ্ছে গ্রান্ডম একসেল মেমরি। স্যার, বুবাতে পারছেন?’

শওকত সাহেব কিছুই বোবোননি। তাঁর পরেও বললেন, বুবাতে পারছি। ‘একটা জিনিশ খেয়াল থাবেন— কম্পিউটার হল আয়নার মতো।’

‘আয়নার মতো?’

‘হ্যাঁ স্যার, আয়নার মতো। আয়নাতে যেমন হয়—আয়নার সামনে যা থাকে তাই আয়নাতে দেখা যায়, কম্পিউটারেও তাই। কম্পিউটারকে আপনি যা দেবেন সে তা—ই আপনাকে দেখাবে। নিজে থেকে বানিয়ে সে আপনাকে কিছু দেবে না। তাঁর সেই ক্ষমতা নেই। বুবাতে পারছেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘স্যার, এখন আসুন যেমরি এবং হার্ড ডিস্ক এই দুয়োর ভেতরের পার্থক্যটা আপনাকে বুবিয়ে বলি। আমার কথা মন দিয়ে শুনছেন তো?’

‘হ্যাঁ।’

শওকত সাহেব আসলে মন দিয়ে কিছুই শুনছেন না। আয়নার কথায় তাঁর নিজের আয়নাটার কথা মনে পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কী? আয়নার ভেতরে ছেট মেয়েটা এল কীভাবে? মেয়েটা কে? তাঁর নাম কী? চোখ পিটিপিট করে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিল।

বেয়ারা চা নিয়ে এসেছে। শওকত সাহেব চায়ের কাপে অন্যমনক ভঙ্গিতে চুমুক দিজ্জেন। সাজেদুল করিম বলল, স্যার।

‘হ্যাঁ।’

‘আপনি কি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত?’

‘না তো।’

‘তা হলে আসুন কম্পিউটারের ফাইল কীভাবে খুলতে হয় আপনাকে বলি। শুধু মুখে বললে হবে না, হাতে-কলমে দেখাতে হবে। হার্ড ডিস্ক হল আমাদের

ফাইলিং ক্যাবিনেট। সব ফাইল আছে হার্ড ডিস্কে। সেখান থেকে একটা বিশেষ ফাইল কীভাবে বের করব ?....

বিকেল চারটা পর্যন্ত শওকত সাহেব কম্পিউটার নিয়ে ঘটঘট করলেন। লাতের মধ্যে লাভ হল— তাঁর মাথা ধরে গেল। প্রচণ্ড মাথাধরা। সাজেদুল করিমকে মাথাধরার ব্যাপারটা জানতে দিলেন না। বেচারা এত আগ্রহ করে বোৰাছে। তাঁর ভাবভঙ্গ থেকে মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মতো সহজ কিছু পৃথিবীতে তৈরি হয়নি।

‘স্যার, আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আবার নতুন করে তরু করব।’

‘আচ্ছা।’

অফিস থেকে বেরুবার আগে জিএম সাহেব শওকত সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শওকত সাহেবের বুক কেঁপে উঠল। জিএম সাহেবকে তিনি কম্পিউটারের মতোই ভয় পান। যদিও ভদ্রলোক অত্যন্ত মিষ্টভাষী। হাসিমুখ ছাড়া কথাই বলতে পারেন না। জিএম সাহেবের ঘরে ঢুকতেই তিনি হাসিমুখে বললেন, কেমন আছেন শওকত সাহেব ?

‘জি স্যার, ভাল।’

‘বসুন, দাঢ়িয়ে আছেন কেন ?’

শওকত সাহেব বসলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, পানির পিপাসা পেয়ে গেছে।

‘আপনার কি শরীর খারাপ ?’

‘জি না স্যার।’

‘দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। যাই হোক, কম্পিউটার শেখার ক্ষত্র হল ?’

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মাথা নিচু করে বসে রইলেন। জিএম সাহেব বললেন, আমি সাজেদুল করিমকে গতকাল কঠিন বকা দিয়েছি। তাকে বলেছি— তুমি কেমন ছেলে, সামান্য একটা জিনিশ শওকত সাহেবকে শেখাতে পারছ না !

‘তাঁর দোষ নেই স্যার। সে চেষ্টার জটি করছে না। আসলে আমি শিখতে পারছি না।’

‘পারছেন না কেন ?’

‘বুঝতে পারছি না স্যার।’

‘কম্পিউটার তো আজ ছেলেখেল। সাত-আট বছরের বাচ্চারা কম্পিউটার দিয়ে খেলছে, আপনি পারবেন না কেন ? আপনাকে তো পারতেই হবে। পুরাণো দিনের মত কাগজে-কলমে বসে বসে হিসাব করবেন আর মুখে বিড়বিড় করবেন—হাতে আছে পাঁচ, তা তো হবে না। আমাদের যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। যা হবে সব কম্পিউটারে হবে।’

‘জি স্যার।’

‘নতুন টেকনোলজি যারা নিতে পারবে না তাদের তো আমাদের প্রয়োজন নেই। ডারউইনের সেই খিয়োরি—সারভাইব্ল ফর দি ফিটেস্ট। বুঝতে পারছেন ?’

‘জি স্যার।’

‘আচ্ছা আজ যান। চেষ্টা করল ব্যাপারটা শিখে নিতে। এটা এমন কিছু না।

আপনার নিজের ভেতরও শেখার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি যদি ধরেই মেল কোনোদিন শিখতে পারবেন না, তা হলে তো কোনোদিনই শিখতে পারবেন না। ঠিক না ?’

‘জি স্যার, ঠিক।’

‘আচ্ছা, আজ তা হলে যান।’

বেরুবার সময় তিনি দরজায় ধাক্কা খেলেন। ডান চোখের উপর কপাল সুপুরির মতো ফুলে উঠল। মাথাধরাটা আরো বাঢ়ল।

শওকত সাহেব মাথাধরা নিয়েই বাসায় ফিরলেন। বাসা বালি, শুধু কাজের বুয়া আছে। বাকি সবাই নাকি বিয়েবাড়িতে গেছে। ফিরতে রাত হবে। আবার নাকেরার সম্ভাবনাও আছে। কার বিয়ে শওকত সাহেব কিছুই জানেন না। তাকে কেউ কিছু বলেনি। বলার প্রয়োজন মনে করেনি। তিনি হাত-মুখ ধূরে বারান্দার ইঞ্জিচোরে চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। এতে যদি মাথাধরাটা কমে। ইদানীং তাঁর ঘনঘন মাথা ধূরছে। চোখ আরও খারাপ করেছে কি না কে জানে। চোখের ডাঙারের কাছে একবার গেলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ডাঙারের কাছে যাওয়া মনেই ঢাকার খেলা। ডাঙারের ডিজিট, নতুন চশমা, নতুন ফ্রেম।

কাজের বুয়া তাঁকে নাশতা দিয়ে গেল। একটা পিরিচে কয়েক টুকরা পেপে, আধবাটি মুড়ি এবং সরপড়া চা। পেপেটা খেতে তিতা-তিতা লাগল। মুড়ি মিহিরে গেছে। দাঁতের চাপে রবারের মতো চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রচণ্ড খিদে লেগেছিল। তিনি তিতা পেপে এবং মিয়ানো মুড়ি সবটা খেয়ে ফেললেন। চা খেলেন। গরম চা খেয়ে মাথাধরাটা কমবে ভেবেছিলেন। কমল না। কারণ চা গরম ছিল না। এই কাজের বুয়া গরম চা বানানোর কাশদা জানে না। তাঁর চা সবসময় হয় কুসুম-গরম।

শওকত সাহেব মাথাধরার ট্যাবলেটের খৌজে শেবার ঘরে ঢুকলেন। টেবিলের ছায়ারে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকার কথা। কিছুই পাওয়া গেল না। ছায়ারের ভেতর হাত-আয়নাটা ঢাকালো। মনোয়ারা নিচচল রেখে দিয়েছে। আচ্ছা, আয়নার ভেতর মেরেটা কি এখনও আছে ? শওকত সাহেব আয়না হাতে নিলেন। অস্বত্তি নিয়ে তাকালেন। আশ্চর্য! মেরেটা তো আছে! আগেরবার বসে ছিল, এখন দাঢ়িয়ে আছে। আগের ক্রকটাই গায়ে। মেরেটা খুব সুন্দর তো! গাল মুখ, মাঝা-মাঝা চেহারা। বয়স কত হবে ? এগারো-বারোর বেশি না। কমও হতে পারে। মেরেটার গলায় নীল পুতির মালা। মালাটা আগে সম্ভ করেলনি। শওকত সাহেব নিচুগলায় বললেন, তোমার নাম ?

মেরেটা মিষ্টি গলায় বলল, চিত্রলেখা।

‘বাহু সুন্দর নাম।’

মেরেটা লাঞ্জুক ভঙ্গিতে হাসল। শওকত সাহেব আর কী বলবেন ভেবে পেলেন না। মেরেটাকে আর কী বলা যায় ? আয়নার ভেতর সে এল কি করে এটা কি জিজেস করবেন ? প্রশ্নটা মেরেটার জন্যে অটিল হয়ে যাবে না তো ? জটিল প্রশ্ন জিজেস করে লাভ নেই। তিনি কিছু জিজেস করার আগে মেরেটা বলল, আপনার

কপালে কী হয়েছে ?

'ব্যথা পেয়েছি। জিএম সাহেবের ঘর থেকে বের হবার সময় দরজায় ধাক্কা খেলাম।'

'খুব বেশি ব্যথা পেয়েছেন ?'

'খুব বেশি না। তুমি কোন ঝামে পড় ?'

'আমি পড়ি না।'

'কুলে যাও না ?'

'ইহ !'

'আয়নাৰ ভেতৱ তুমি এলৈ কী কৰে ?'

'তাও জানি না।'

'তোমার বাবা-মা, তাঁৰা কোথায় ?'

'জানি না।'

'তোমার মা-বাবা আছেন তো ? আছেন না ?'

'জানি না।'

'তুমি কি একা থাক ?'

'ই !'

শওকত সাহেব সক্ষ কুলেন মেয়েটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। বুকের উপর দুটা হাত আড়াড়ি কৰে রাখা। মনে হয় তাজ শীত লাগছে। অথচ এটা চৈত্র মাস। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তিনি নিজে গরমে সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন। মাথার উপর ফ্যান দুরছে, তার বাতাসটা পর্যন্ত গরম।

'কাপছ কেন ? শীত লাগছে নাকি ?'

'ই, এখানে খুব শীত।'

'তোমার কি গরম কাপড় নেই ?'

'না।'

'তোমার এই একটাই জামা ?'

'ই !'

'আমাকে তুমি চেন ?'

'চিনি।'

'আমি কে বল তো ?'

'তা বলতে পারি না।'

'আমার নাম জান ?'

'আপনি তো আপনাৰ নাম বলেননি। জানব কীভাবে ?'

'আমার নাম শওকত। শওকত আলি।'

'ও আছা।'

'আমার তিন মেয়ে।'

'ছেলে নাই ?'

'না, ছেলে নাই।'

'আপনাৰ মেয়েৰা কোথায় গেছে ?'

'বিয়েবাড়িতে গেছে।'

'কার বিয়ে ?'

'কার বিয়ে আমি ঠিক জানি না। আমাকে বলেনি।'

'আপনাৰ মেয়েদেৱ নাম কী ?'

'বড় মেৰেৱ নাম ইৱা, মেজোটাৰ নাম সোমা, সবচে ছেট্টাৰ নাম কল্পনা।'

'ওদেৱ নামে কোনো মিল নেই কেন ? সবাই তো মিল দিয়ে মেয়েদেৱ নাম রাখে। বড়মেয়েৱ নাম ইৱা হলে মেজোটাৰ নাম হয়—মীরা, ছেট্টাৰ নাম হয় নীরা....'

'ওদেৱ মা নাম রেখেছে। মিল দিতে ভুলে গেছে।'

'আপনি নাম রাখেননি কেন ?'

'আমিও রেখেছিলাম। আমাৰ নাম কাৰও পছন্দ হয়নি।'

'আপনি কী নাম রেখেছিলেন ?'

'বড় মেৰেৱ নাম রেখেছিলাম বেগম রোকেয়া। মহীয়সী নামীৰ নামে নাম। তাৰ মা পছন্দ কৰেনি। তাৰ মা'ৰ দোষ নেই। পুৱানো দিনেৱ নাম তো, এইজনে পছন্দ হয়নি।'

'বেগম রোকেয়া কে ?'

'তোমাকে বললাম না মহীয়সী নামী। রংপুৱেৱ পায়ৰাবন্দ আমে জন্মেছিলেন। মেয়েদেৱ শিক্ষাবিষ্টারেৱ জন্মে প্ৰাণ্পাত কৰেছিলেন। তুমি তাৰ নাম শোননি ?'

'জি না।'

কলিংবেল বেজে উঠল। শওকত সাহেব আতকে উঠলেন। ওৱা বোধহৱ চলে এসেছে। তিনি আয়না ড্র়য়াৰে রেখে দৱজা খোলাৰ জন্মে গেলেন। ওদেৱ সামলে আয়না বেৱ কৰার কোনো দৱকাৰ নেই। তাৰা কী না কী মনে কৰবে—দৱকাৰ কী ? অবশ্যি আয়নায় তিনি নিজেও কিছু দেখছেন না, সম্ভবত এটা তাৰ কল্পনা। কিংবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছেট্টবেলায় তিনি যখন কুলে পড়তেন তখন তাদেৱ অবনী স্যার কুলেৱ সামলেৱ বড় আমগাছটাৰ সঙ্গে কথা বলতেন। কেউ দেখে ফেললো খুব লজ্জা পেতেন। এক বৰ্ষাকালে তিনি কুলেৱ পাশ দিয়ে যাচ্ছেন; হঠাৎ দেখেন অবনী স্যার আমগাছেৱ সঙ্গে কথা বলছেন। অবনী স্যার তাৰ কৈ দেখে খুব লজ্জা পেয়ে বললেন, সঙ্গ্যাবেলা এমন কোপকাড়েৱ মধ্যে দিয়ে হাঁটবি না। খুব সাপেৱ উপদ্রব। তাৰ পৱেৱ বছৱই স্যার পুৱোপুৱি পাগল হয়ে গেলেন। তাৰ আত্মীয়হজ্ঞ তাৰ কৈ নিৱে ইত্তিয়া চলে গেল।

কে জানে তিনি নিজেও হয়ত পাগল হয়ে যাচ্ছেন। পুৱোপুৱি পাগল হবার পৱ তাৰ স্ত্ৰী ও মেয়েৱা হয়তো তাৰ কৈ পাবনাৰ মেন্টাল হ্যাসপাতালে ভৱতি কৰিয়ে আসবে। পাবনায় ভৱতি হতে কত টাকা লাগে কে জানে! টাকা বেশি লাগলে ভৱতি নাও কৰাতে পাৰে। হয়তো নিজেদেৱ বাড়িতেই দৱজাৰ তালাবন্দ কৰে রাখবে কিংবা অন্য কোনো দূৰেৱ শহৰে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসবে। পাগল পুঁথতে না পাৱলৈ দূৰে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়। এতে দোষ হয় না। পাগল তো আৱ মানুষ না। তাৰা বোধশক্তিহীন জন্মুৱ মতোই।

মনোয়ারা বিয়েবাড়ি থেকে যেরেদের নিয়ে ফেরেননি। মেজো মেহের মাট্টোর এসেছে। শওকত সাহেব বললেন, 'ওরা কেউ বাসায় নেই। বিয়েবাড়িতে গেছে। আপনি বসেন, চা খান।'

মাট্টোর সাহেব বললেন, আজ্ঞা, চা এক কাপ খেয়েই যাই। শওকত সাহেব বুঝাকে চারের কথা বলে এসে তখনো মুখে মাট্টোরের সামনে বসে রইলেন। তাঁর মেজাজ একটু খারাপ হল। মাট্টোরের চা খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামনে বসে থাকতে হবে। টুকটাক কথা বলতে হবে। কী কথা বলবেন?

মাট্টোর সাহেব বললেন, আপনার গালে কী হয়েছে?

'দাঢ়ি শেত করতে গিয়ে গাল কেটে গেছে। আয়নাটা খারাপ, ভাল দেখা যায় না।' 'নতুন একটা কিনে নেন না কেন?'

'ইরার মাকে বলেছি— ও সময় করতে পারে না। আপনার ছাত্রী পড়াশোনা কেমন করছে?'

'ভাল। ম্যাথ-এ একটু উইক।'

'আপনি কি শুধু ম্যাথ পড়ান?'

'আমি সায়েস সাবজেক্ট সবই দেখাই—ফিজিক্স, কেমিট্রি।'

বুঝা চা নিয়ে এসেছে। শুধু চা না, পিরিচে পেপে এবং মুড়ি। মাট্টোর সাহেব আগ্রহ করে তিভা পেপে এবং মিয়ানো মুড়ি খাচ্ছেন। প্রাইভেট মাট্টোররা যে-কোনো খাবার আগ্রহ করে থায়। শওকত সাহেব কথা বলার আর কিছু পাছেন না। একবার ভাবলেন আয়নার ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবেন। নিজেকে সামলালেন, কী দরকার?

'মাট্টোর সাহেব!'

'জি।'

আপনি তো সাধেসের টিচার, আয়নাতে যে ছবি দেখা যায়, কীভাবে দেখা যায়?

'আলো অবজেক্ট থেকে আয়নাতে পড়ে, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।'

শওকত সাহেব ইত্তত করে বললেন, কোনো বস্তু যদি আয়নার সামনে না থাকে তা হলে তো তার ছবি দেখার কোনো কারণ নেই, তাই না!

মাট্টোর সাহেব খুবই অবাক হয়ে বললেন, তা তো বটেই। এটা জিজেস করছেন কেন?

'এমি জিজেস করছি। কোনো কারণ নাই। কথার কথা। কিছু মনে করবেন না।'

শওকত সাহেব খুবই লজ্জা পেয়ে গেলেন।

প্রদিন অফিসে যাবার সময় শওকত সাহেব আয়নাটা খবরের কাগজে মুড়ে সদে নিয়ে নিলেন। কেন নিলেন নিজেও ঠিক জালেন না। অফিসের দ্রুয়ারে আয়না রেখে সাজেদুল করিমের সঙ্গে কম্পিউটার নিয়ে ঘটিষ্ঠ করতে লাগলেন। কীভাবে উইভো খুলে সেখান থেকে সিটেম ফোন্ডার বের করতে হয়, ডাটা এন্ট্রি, ডাটা প্রসেসিং—চোল রকম যন্ত্রণা। তিনি মুঠ হলেন ছেলেটার দৈর্ঘ দেখে। তিনি যে সব

ওবলেট করে দিচ্ছেন তার জন্যে সাজেদুল করিম একটুও রাগ করছে না। একই জিনিশ বাবুরার করে বলছে। এমনভাবে কথা বলছে যেন তিনি ব্যাক্ত একজন মানুষ না, বাঢ়া একটা ছেলে। সাজেদুল করিম বলল, স্যার, আসুন আমরা একটু রেষ্ট নিই। চা থাই। তারপর আবার শুরু করব।

শওকত সাহেব বললেন, আমাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না। বাদ দাও।

'বাদ দিলে চলবে কী করে স্যার? কম্পিউটার চলে এসেছে। এখন তো আর আপনি লম্বা লম্বা যোগ-বিয়োগ করতে পারবেন না। ব্যালেন্স শীট তৈরি হবে কম্পিউটারে।'

শওকত সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, আমি পারব না। যারা পারবে তারা করবে। চাকরি ছেড়ে দেব।

'কী যে স্যার বলেন! চাকরি ছেড়ে দেবেন মানে? চাকরি ছাড়লে থাবেন কী? আপনি মোটেই ঘাবড়াবেন না। আমি আপনাকে কম্পিউটার শিখিয়ে ছাড়ব। আমার সাংঘাতিক জেদ।'

চা খেতে খেতে শওকত সাহেব ছেলেটার সঙ্গে কিছু গল্পও করলেন। গল্প করতে খারাপ লাগল না। তবে এই ছেলে কম্পিউটার ছাড়া কোনো গল্প জানে না। কোনো এক ভদ্রলোক তাঁর কিছু জরুরি ডাটা ভুল করে ইরেজ করে ফেলেছিলেন। প্রায় মাথা খারাপ হবার মতো জোগাড়। সেই ডাটা কীভাবে উদ্ধার হল তার গর্জ সে এমনভাবে করল যেন এটা এক বোমহর্ষক গর্জ।

'বুবালেন স্যার, দুটা প্রোগ্রাম আছে যা দিয়ে ট্রেস ক্যাম-এ ফেলে দেয়া ডাটা ও উদ্ধার করা যায়। একটা প্রোগ্রামের নাম নট্চন ইডিটিলিটজ, আরেকটির নাম কম্পিউট আনডিলিট। খুবই চমৎকার প্রোগ্রাম।'

শওকত সাহেব কিছুই বুবালেন না, তবু মাথা নাড়লেন যেন বুঝতে পেরেছেন। চা শেষ হবার পর সাজেদুল করিম বলল, স্যার আসুন বিসমিত্রাহ বলে লেগে পড়ি।

শওকত সাহেব লজ্জিত গলায় বললেন, আজ থাক। আজ আর ভাল লাগছে না।

'জিএম সাহেব শুলে আবার রাগ করবেন।'

'রাগ করলে করবে। কী আর করা। আমাকে দিয়ে কম্পিউটার হবে না। শুধু শুমি কষ্ট করছ।'

'আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না। ঠিক আছে, আজ আপনি রেষ্ট নিন, কাল আবার আমরা শুরু করব। আমি তাহলে স্যার আজ যাই।'

'একটা জিনিশ দেখো তো!'

শওকত সাহেব দ্রুয়ার থেকে খবরের কাগজে ঘোড়া আয়না বের করলেন। দ্রুয়ার সাবধানে কাগজ সরিয়ে আয়না বের করলেন। সাজেদুল করিমের হাতে আয়নাটা দিয়ে বললেন, জিনিশটা একটু ভাল করে দেখো তো।

'জিনিশটা কী?'

'একটা আয়না।'

সাজেদুল করিম ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আয়না দেখল। শওকত সাহেব কৌতুহলী গলায় বললেন, দেখলে?

সাজেদুল করিম বিশ্বিত হয়ে বলল, দেখলাম।

‘কী দেখলে বলো তো ?’

‘পুরানো একটা আয়না দেখলাম। পারা নষ্ট হয়ে গেছে। আর তো কিছু দেখলাম না। আর কিছু কি দেখাব আছে ?’

‘না, আমার শব্দের একটা আয়না।’

শওকত সাহেব আয়নাটা কাগজে মৃত্যে করলেন। সাজেদুল করিম এখনও তাঁর দিকে বিশ্বিত চোখে তাকিয়ে আছে। শওকত সাহেবের মনে হল তিনি ছেটবেলায় অবনী স্যারকে গাছের সঙ্গে কথা বলতে দেখে এইভাবেই বোধহয় তাকিয়েছিলেন।

সাজেদুল করিম চলে যাবার পর তিনি তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আয়নাটা বের করলেন—ঐ তো, মেয়েটাকে দেখা যাচ্ছে। মেয়েটাকে কেমন দুঃখ দুঃখ লাগছে। শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, কেমন আছ চিত্রলেখা ?

‘ভাল।’

‘তোমার মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন ? মন খারাপ ?’

‘হ্যাঁ।’

‘মন খারাপ কেন ?’

‘একা একা থাকি তো এইজন্যে মন খারাপ। মাঝে মাঝে আবার ভয়-ভয় লাগে।’

‘কিসের ভয় ?’

‘জানি না কিসের ভয়। এটা কি আপনার অফিস ?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনার টেবিলের উপর এটা কী ? বাস্তুর মতো ?’

‘এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার। আইবিএম কম্পিউটার।’

‘কম্পিউটার কী ?’

‘একটা যন্ত্র। হিসাবনিকাশ করে। আচ্ছা শোনো চিত্রলেখা, তোমার বাবা-মা আছেন ?’

‘জানি না তো।’

‘তুমি আজ কিছু খেয়েছ ?’

‘না।’

‘তোমার খিদে লেগেছে ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি যেখানে থাক দেখালে কোনো যাবার নেই ?’

‘না।’

‘জায়গাটা কেমন ?’

‘জায়গাটা কেমন আমি জানি না। খুব শীত।’

শওকত সাহেব দেখালেন মেয়েটা শীতে কাঁপছে। পাতলা সুতির জামায় শীত মানছে না। তিনি কী করবেন বুঝতে পারলেন না। এই শীতাত্ত ও শূধুত মেয়েটার জন্যে তিনি কিই-বা করতে পারেন! তিনি দীর্ঘনিষ্ঠাস ফেলে আয়নাটা কাগজে মুড়ে

ছুয়ারে রেখে দিলেন। তাঁর নিজেরও খিদে লেগেছে। বাসা থেকে টিফিন-কেরিয়ারে করে খাবার এনেছেন। কোন উপায় কি আছে মেয়েটাকে খাবার দেয়ার ? আরে, কী আশ্চর্য! তিনি এসব কী ভাবছেন ? আয়নায় যা দেখছেন সেটা মনের ভুল ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে গুরুত্ব দেয়ার কোনো মানে হয় না। আসলে আয়নাটা তাঁর দেখাই উচিত না। তিনি টিফিন-কেরিয়ার নিয়ে অফিস ক্যানটিনে থেতে গেছেন। কিন্তু থেতে পারলেন না। বারবার মেয়েটার শুকনো মুখ মনে পড়তে লাগল। তিনি হাত ধূয়ে উঠে পড়লেন।

বাসায় ফিরতে তাঁর সদ্যা হয়ে গেল। সাধারণত অফিস থেকে তিনি সরাসরি বাসায় ফেরেন। আজ একটু ধূরলেন। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের বেঞ্জিতে বসে রইলেন। তাঁর ভালই লাগল। ঝুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, চারদিকে গাছপালা। কেমন শান্তি-শান্তি ভাব। দুপুরে কিছু খাননি বলে খিদেটা এখন জানান দিচ্ছে। বাদামওয়ালা বুট-বাদাম বিক্রি করছে। এক ছাঁক বাদাম কিনে ফেলবেন নাকি ? কত দাম এক ছাঁক বাদামের ? তিনি হাত উঠিয়ে বাদামওয়ালাকে ডাকলেন। তাঁর পরই মনে হল বাচ্চা একটা মেয়ে না থেয়ে আছে। তাঁর মন্টা খারাপ হয়ে গেল। বাদাম না কিনেই তিনি বাসার দিকে ঝুঁকনা হলেন।

বাসার ফেরামাত্র তাঁকে নাশতা দেয়া হল—তিতা পৌপের টুকরা, মিয়ালো মুড়ি। মনে হয় অনেকগুলি তিতা পৌপে কেনা আছে এবং তিনতরতি মিয়ালো মুড়ি আছে। এগুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে খেতেই হবে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে। অপরিচিত একজন পুরুষ নাকি গলায় সা-রে-গা-মা করছে। ইরার গলাও পাওয়া যাচ্ছে। ইরা গান শিখছে নাকি ?

সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা পাধানি ধানিসা....

মনোয়ারা চায়ের কাপ নিয়ে শওকত সাহেবের সামনে রাখতে রাখতে বললেন, ইরার জন্যে গানের মাটোর রেখে দিলাম। সন্তানে দুদিন আসবে। পনেরো শো টাকা দে নেয়া, বলে-কয়ে এক হাজার করেছি। তবলচিকে দিতে হবে তিন শো। মেয়ের এত শথ ! তোমাকে বলে তো কিছু হবে না। কার কী শথ, কী ইজ্জা, তুমি কিছুই জান না। যা করার আমাকেই করতে হবে।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। এক হাজার যোগ তিনশো—তের শো। বাড়তি তেরো শো টাকা কোথেকে আসবে ? সামনের মাস থেকে বেতন করে যাবে। প্রতিদিন ফাল্গ থেকে দশ হাজার টাকা লোন নিয়েছিলেন, সামনের মাস থেকে পাঁচশো টাকা কয়ে কাটা শুরু হবে। উপায় হলে কী ? তিনি কম্পিউটারও শিখতে পারছেন না। সত্যি সত্যি যদি এই বয়সে চাকরি চলে যায়, তবে ?

মনোয়ারা বললেন, সোমাদের কলেজ থেকে স্টাডি ট্যারে যাচ্ছে। তার এক হাজার টাকা দরকার। তোমাকে আগেভাগে বলে রাখলাম। কী, কথা বলছ না কেন ?

শওকত সাহেব ত্রৈর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন। কিছু বললেন না।

‘তোমার সঙ্গে বলে যে দুটো কথা বলব সে উপায় তো নেই। মুখ সেলাই করে বসে থাকবে। আশ্চর্য এক মানুষের সঙ্গে জীবন কাটালাম।’

মনোয়ারা উঠে চলে পেলেন। ঘরের ভেতর থেকে এখন গানের কথা ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে ওঙ্কাদ চিচার প্রথম দিনেই গান শেখাচ্ছেন-

তুমি বাস কি না তা আমি জানি না
ভালবাস কি না তা আমি জানি না
আমার কাজ আমি বন্ধু করিয়া যে যাব
চিন্তা হইতে আমি চিতানলে যাব...

শওকত সাহেব একা বসে আছেন। রাতে ভাত খাবার ডাক না আসা গর্ভু একাই বসে থাকতে হবে। আরনাটা বের করে মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বললে বেমন হয়? কেউ এসে দেখে না ফেললে হল। দেখে ফেললে সমস্যা।

'কেনন আছ চিত্রলেখা?'

'জি, ভাল আছি। কে গান গাচ্ছে?'

'আমার বড় মেয়ে।'

'ইরা?'

'হ্যা, ইরা। তোমার দেখি নাম মনে আছে।'

'মনে খাকরে না কেন? আমার সবার নামই মনে আছে—ইরা, সোমা, কল্পনা। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনার খুব মন-খারাপ। আপনার কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি রে মা।'

শওকত সাহেবের গলা ধরে এল। দিনের পর দিন তাঁর মন খারাপ থাকে। কেউ জানতে চায় না তাঁর মন-খারাপ কেন—আরনার ভেতরের এই মেয়ে জানতে চায়ে। তাঁর চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি প্রসঙ্গ পালটাবার জন্যে বললেন, তুমি কি গান জান?

'জি না।'

'আছ শোনো, তুমি যে বলেছিলে খিদে লেগেছে। কিছু কি খেয়েছে খিদে করেছে?'

মেয়েটা মিষ্টি করে হাসল। মজার কোনো কথা বলছে এমন ভঙ্গিতে বলল, আপনি কী যে বলেন। খাব কী করে? আমাদের এখানে কি কোনো খাবার আছে?

'খাবার নেই!'

'না। কিছু নেই। এটা একটা অসুস্থ জায়গা। শুধু আমি একা থাকি। কথা বলারও কেউ নেই। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলি।'

শওকত সাহেব লাফ করলেন, মেয়েটা আগের মতো দুহাত বুকের উপর দেখে থরথর করে কাঁপছে। তিনি কোমল গলায় বললেন, শীত লাগছে মা?

'লাগছে। এখানে খুব শীত। যখন বাতাস দেয় তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে। আমার তো শীতের কাপড় নেই। এই একটাই ক্রক।'

দৃঢ়ে শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি এসে গেল। তখন মনোয়ারা খারাপ্য এসে দাঢ়ালেন। শীতল পুলায় বললেন, আরনা হাতে বারান্দায় বসে আছ কেন? কল্পনার পাশে বসে তাঁর পড়াটা দেখিয়ে দিলেও তো হয়। সব বাবারাই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়, একশাত্র তোমাকে দেখলাম অফিস থেকে

এসে বটগাছের মতো বসে থাক। বাবার কিছু দায়িত্ব তো পালন করবে।

শওকত সাহেব আপনাটা দেখে কল্পনার পড়া দেখানোর জন্যে উঠে দাঢ়ালেন।

২

সাজেন্দুল করিম অসাধ্য সাধন করেছে। শওকত সাহেবকে কম্পিউটার শিখিয়ে ফেলেছে।

'কী স্যার, বলিনি আপনাকে শিখিয়ে আড়াব?'

শওকত সাহেব হাসলেন। তাঁর নিজের এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন। সাজেন্দুল করিম বলল, আর কোনো সমস্যা হবে না। তা ছাড়া আমি আপনার জন্যে আরেকটা কাজ করেছি—প্রতিটি টেপ কাগজে লিখে এনেছি। কোনো সমস্যা হলে কাগজটা দেখবেন। দেখবেন, সব পানির মতো পরিকার।

'গ্যাংক হ্যাঁ।'

'আর স্যার, আমার ঠিকানাটা কাগজে লিখে গেলাম। কোনো ঝামেলা মনে করলেই আমার বাসায় চলে আসবেন।'

'আচ্ছা। বাবা, তুমি অনেক কষ্ট করেছ।'

'আপনার অবস্থা দেখে আমার স্যার মনটা খারাপ হয়েছিল। রাতে দেখি মুম্ব আসে না। তখন একের পর এক টেপগুলি কাগজে লিখলাম। সারারাত চিন্তা করলাম কীভাবে বোঝালে আপনি বুঝবেন।'

শওকত সাহেবের চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হল। তিনি ভেবে পেলেন না এরকম অসাধারণ ছেলে পৃথিবীতে এত কম জন্মায় কেন?

'স্যার, আমি যাই, জিএম সাহেবকে বলে যাইছি আপনি সব শিখে ফেলেছেন, আর কোনো সমস্যা নেই। আরেকটা কথা স্যার, কম্পিউটারকে ভয় পাবেন মা। তাকে ভয় পাবার কিছু নেই। কম্পিউটার হচ্ছে সামান্য একটা যন্ত্র। এর বেশি কিছু না।'

শওকত সাহেবের চোখে এইবার সত্তি সত্তি পানি চলে এল। ছেলেটা যেন চোখের পানি দেখতে না পায় সেজন্মে অনাদিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে তিক করলেন, তাঁজ অফিস থেকে ফেরার পথে ছেলেটার জন্যে একটা উপহাস কিনবেন। দামি কিছু না, সেই সামর্থ্য তাঁর নেই, তবু কিছু কিনে তাঁর বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে আসবেন। একটা কলম বা এই জাতীয় কিছু। শ'দুই টাকার মধ্যে কলম না পাওয়া গেলে সুন্দর কিছু গোলাপ। তাঁর সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। টেবিলের ড্রয়ারে খামের ভেতর রাখা।

শওকত সাহেব একশো পাঁচাশের টাকা দিয়ে একটা ওয়াটারফ্লাই কলম কিনলেন। তারপর কোনোকিছু না ভেবেই চিত্রলেখার জন্যে একটা সুয়েটার কিনে ফেললেন। গরমের সময় বলেই ভাল ভাল সুয়েটার সজ্জায় বিক্রি হচ্ছিল। সুয়েটার কিনতে তিনশো চালুশ টাকা খরচ হয়ে গেল। শাদা জমিনের উপর নীল ফুল আঁকা। সিলখেটিক ডল। দোকানদার বলল, সিলখেটিক হলেও আসল উলের বাবা। শুধু সুয়েটার গায়ে দিয়েই তুল্লা অঞ্চলে বরফের চাইয়ের উপর শয়ে থাকা যায়। শওকত সাহেব জানেন সুয়েটার কেনাটা তাঁর জন্যে খুবই বোকামি হয়েছে।

চিত্রলেখাকে এই মুঠেটার তিনি কখনো দিতে পারবেন না। কারণ চিত্রলেখা বলে কেউ নেই। পুরো ব্যাপারটা তাঁর মাথার অসুস্থ কোনো কল্পনা। সংসারের দুঃখ-ধান্ধায় তাঁর মাথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে বলে এইসব হাবিজাবি দেখছেন। তাঁর পরেও মনে হল—মেয়েটা দেখবে জিনিশটা তাঁর জন্মে কেনা হয়েছে। বেচারি খুশি হবে।

www.banglabookpdf.blogspot.com

সাজেদুল করিমকে তিনি বাসায় পেলেন না। দরজা তালাবদ্ধ। দরজার ফাঁক দিয়ে তিনি কলমটা ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর মনে হল, ভালই হয়েছে। সাজেদুল করিম জানল না উপহার কে দিয়েছে। মানুষের সবচে ভাল সাগে অজ্ঞান কোনো জায়গা থেকে উপহার পেতে।

শওকত সাহেব গভীর আশঙ্কা নিয়ে বাসায় ফিরলেন। আজকের পেঁপে খেতে আগের মতো তিতা জাগল না। চা-টাও খেতে ভাল হয়েছে। তিনি মনোয়ারাকে আরেক কাপ চা দিতে বলে ড্রয়ার থেকে আয়না বের করতে গেলেন। আয়না পাওয়া গেল না। ঝুঁয়ারে নেই, টেবিলের উপরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই। তিনি পাগলের মতো আয়না খুঁজছেন। মেয়েরা কেউ কি নিয়েছে? তিনি মেয়েদের ঘরে চুক্ত টেবিলের বইপত্র এলোমেলো করতে শুরু করলেন।

ইয়া বলল, বাবা, তুমি কী খুঁজছ?

‘আয়নাটা খুঁজছি। আমার একটা হাত-আয়না ছিল না? এই আয়নাটা।’

‘ঞ্জ আয়না তুমি কোথাও খুঁজে পাবে না। মা তোমার জন্মে সতুল আয়না কিনেছে। ওটা ফেলে দিয়েছে।’

শওকত সাহেব হতঙ্গ গলায় বললেন, এইসব কী বলছিস! কোথায় ফেলেছে?

‘পুরানো একটা আয়না ফেলে দিয়েছে। তুমি এরকম করছ কেন বাবা?’

শওকত সাহেব বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, কিছু বোৰা গেল না। ইয়া ভয় পেয়ে তাঁর মাকে ডাকল। মনোয়ারা এসে দেখেন শওকত সাহেব খুব ঘামছেন। তাঁর কণাল বেয়ে কেঁটা কেঁটা ঘাম পড়ছে। তিনি ধরা গলায় বললেন, মনোয়ারা, আয়না কোথায় ফেলেছে?

রাত এগারোটা বাজে। শওকত সাহেব বাসার পাশের ডাস্টবিন হাতড়াছেন। তাঁর সারা গায়ে নোংরা লেগে আছে। তাঁর সেদিকে কোন জরুরি নেই। তিনি দুঃহাতে ময়লা খেঁটে যাচ্ছেন। একটু দূরে তাঁর স্ত্রী ও তিনি কল্প্যা দাঢ়িয়ে। তাদের চোখে রাজ্যের বিশ্বর। বড় মেঝে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, তোমার কী হয়েছে বাবা?

শওকত সাহেব ফিসফিস করে বললেন, চিত্রলেখাকে খুঁজছি রে মা—চিত্রলেখা।

‘চিত্রলেখা কে?’

‘আমি জানি না কে?’

শওকত সাহেবের চোখ দিয়ে উপটপ করে পানি পড়ছে। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকছেন—চিত্রা মা রে, ও মা, তুই কোথায়?

www.banglabookpdf.blogspot.com

Your Online Library



সবার মাঝে ছাড়িয়ে পাঠুক জ্ঞানের আলো

Join Us On Facebook

www.facebook.com/banglabookpdf